বিধ্বস্ত
মানবতা
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
www.almodina.com

বিধ্বস্ত মানবতা

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

সংকলনে

মুজাহিম

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিধ্বস্ত মানবতা

মূলঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)
অনুবাদঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশনায় ঃ মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী '২০১০ইং

প্রচ্ছদ ঃ সালসাবিল

অক্ষর সংযোজনঃ মারজিয়া কম্পিউটার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 984-622-019-7

মূল্য ঃ ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র।

Biddhasta Manobata: Demolished Humanity: Lectures delivered by the Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, compiled by Muzahim. Published by Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Printed by M/s Tawakkul Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.

উৎসর্গ

যাঁরা শত কষ্ট করেও আমাকে বড়
করে তুলেছেন সেই স্নেহময়ী
মা ও স্নেহময় আব্বাকে
এবং
সেজ মামা ও বড় ভাইকে
যাঁদের স্নেহ ও ভালবাসা আমার
বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়।

আমাদের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো শোকর আর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অশেষ দরূদ ও সালাম। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-কে বিদগ্ধ পাঠক সমাজে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। স্ব-পরিচয়ে তিনি বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মুসলিমের নিকট সুপরিচিত। ক্ষণজন্মা এই মহান পুরুষ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ইসলামের পয়গাম নিয়ে সফর করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশেই তাঁর ছিল দাওয়াতী পদচারণা। এদিক থেকে তাঁকে দ্বিতীয় বতুতা (বাতৃতুতা) বললেও অত্যুক্তি হবে না। আল্লামা নদভী দেশ ভ্রমণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের আলোকে যে সারগর্ভ বক্তৃতা ও আলোচনা রেখেছেন, সে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধে মানবতার প্রতি আল্লামা নদভী (র.)-র গভীর ভালবাসা, বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ও তাঁর এদেশীয় ছাত্রদের মুখে শুনেছি, পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম হতে শুনলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, সারা রাত ঘুমাতে পারতেন না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার কিছুটা প্রমাণ বহন করে।

আল্লামা নদভী (র.)-র প্রবন্ধমালা এমন এক নাযুক মুহূর্তে **'বিধ্বস্ত মানবতা'** নামে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে যখন সত্যিকার অর্থেই বিশ্বে মানবতা চরমভাবে ভুলুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত। মানবতার এ চরম লাঞ্ছনার সময়ে একটি বই প্রকাশ করার তাগিদ অনুভবে রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আর এগুলো সংকলন করে দেয়ার জন্য জনাব মুজাহিম সাহেবকে আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। সেই সাথে শত ব্যস্ততার মাঝেও সম্পাদনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য জনাব ফজলুল কাদির সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন! আমাদের এ প্রয়াস সফল হলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করব।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের চেষ্টা-সাধনাকে কবূল করুন! আমীন!

এপ্রিল/২০০৩ ইং, ঢাকা।

-প্রকাশক

দু'টি কথা

এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই, খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী ছিল মানব ইতিহাসের সর্বাধিক অন্ধকারময় ও অধঃপতনের যুগ। বছরের পর বছর ধরে মানবতা অধঃপতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এ সময় সে তার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। গোটা দুনিয়ার এমন কোন শক্তি ছিল না যা এই পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এমন সময়ই নবুয়তে মুহাম্মদীর আগমন যে সময় মানবতা নিভৃতে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল, অবস্থা যেন এমন দাঁড়িয়েছিল মানুষরূপী জংলী জানোয়ারেরা অসহায় দুর্বল মানব জাতির খোদা বনে বসেছিল। তারা যেভাবে চাইত ঠিক সেভাবে তাদের জীবন চলত। প্রতিবাদ করার কোন অবস্থাই ছিল না।

সে সময় এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল, যিনি মানবতার জন্য সামান্যতম কাঁদবেন। এমন এক অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর হাল ধরেন। সে সময় মুহাম্মদ (সা.) মানবতার হাল না ধরতেন তবে আমাদের এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। পৃথিবীতে যত উন্নতি, অগ্রগতি তার সবই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান অবদান।

পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম অবশিষ্ট ছিল না যা মানবতাকে সুষ্ঠ সমাধান দিতে পারত। ইসলামই একমাত্র বিশ্বজনীন শাশ্বত ধর্ম ও জীবন দর্শন যা অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সকল সমস্যার নিখুঁত ও সুন্দর সমাধান দিতে পারে।

আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা তাতারী হামলা থেকে কোন অংশে কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা তাতারী হামলাকেও হার মানায়। তারা এমন কোন অস্ত্র ব্যবহার করেনি যার অভিশাপের ধারা আজো বহমান। আর আজ অধুনা বিশ্বে মানবতার নামে যে হারে মানব নিধন চলছে তার কোন নজীর জাহিলী সমাজেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পৃথিবী আজও ভুলে যায়নি জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমার কথা।

বিজ্ঞানের অপব্যবহারে মানবতা আজ ধ্বংস হতে চলেছে। বিজ্ঞান মানবতাকে অনেক কিছুই দিয়েছে। কিন্তু সে তার উদ্ভাবিত জিনিসের কল্যাণকর কিছুই শিক্ষা দিতে পারেনি, পারেনি সে মানুষকে মানবতার সবক দিতে। যদি বিজ্ঞানপ্রেমীদের প্রশ্ন করা হয় ঃ অসহায় আফগান নারী ও শিশুদের ওপর জুলুম কী কারণে হলো, হিরোশিমাতে আজও কোন সুস্থ শিশুর জন্ম হয় না কেন? হারজেগোভেনিয়াদের কী দোষ ছিল, অন্যদিকে একই গর্তে কিভাবে হাজারো লাশের দাফন করা হচ্ছে? ফিলিস্তিনী বা কাশ্মিরীরা–তাদেরই বা কী দোষ? সদ্য ঘটে যাওয়া গুজরাট ও ইরাকীদের অবস্থাটাই চিন্তা করুন! কী উত্তর আছে এদিকের বিজ্ঞানীদের কাছে?

আমরা সমাজের মূল স্রোতধারার শক্তির কথা বেমালুম ভুলে যাই যেসব মানবহিতৈষীগণ তাঁদের মেধা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের এ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে দান করেছেন এক সুষ্ঠ অবকাঠামো। মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে একে অপরকে সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ করেছেন। আজ তাঁরা এ সভ্যতার ইতিহাসে স্থান করে নিতে পারেন নি। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পাতাগুলো ভরে আছে শয়তানের চিত্র ও মানবতা ধ্বংসকারীদের নিষ্ঠুর বানোয়াট কাহিনীতে।

আপনি পাশ্চাত্যের চরিত্রগত দুরবস্থা দেখলে বলতে বাধ্য হবেন, ওরা আজ অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। একদিকে ওরা যেমন চাঁদের দেশে ঘুরে ফিরছে, তেমনিভাবে নৈতিক অবক্ষয়ে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে অসভ্য জানোয়ারে পরিণত হচ্ছে। আমেরিকা জাগতিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে কিন্তু যুবক শ্রেণীকে দিতে পারেনি চরিত্র গঠনের কোন মহৌষধ। সে আজ জংলী হাতীর ন্যায় মানবতাকে অসহায় এক কংকালে পরিণত করেছে। তার নিকট নেই কোন মানবতার শিক্ষা বা মূল্য।

মানুষ আজ অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছে। দেশের রাজাধিরাজরা আজ দিশেহারা, গুণীজনদের সংস্পর্শে এসে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। মানবতার এই বিপর্যয় দেখে যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী, কলমি জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, বুযুর্গ ও দার্শনিক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর।

আল্লামা নদভী মানবতার দাওয়াত নিয়ে বিশ্বের প্রায় সকল দেশই সফর করেছেন। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য যেখানেই গেছেন সেখানেই মানবতার দাওয়াত দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আল্লামা নদভী (র.) বিভিন্ন দেশে প্রদত্ত বক্তৃতামালার বাংলার সংকলন। বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে আজ যখন চরমভাবে মানবতা লুণ্ঠিত তেমনি এক মুহূর্তে 'বিধ্বস্ত মানবতা' নামক বইটির অনুবাদ সংকলন করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করছি। এ কাজে যাঁরা আমার সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব ফজলুল কাদির সাহেবের নিকট তিনি সম্পাদনার দায়িত্বটা না নিলে এর প্রকাশ সময়মত কখনই সম্ভব হতো না। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবের নিকট যিনি আল্লামা নদভী (র.)-র বইগুলো প্রকাশনার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ নেক উদ্দেশ্য সফল করুন এবং বইটিকে আমাদের সকলের নাযাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

মুজাহিদ

তাং-২২/০৩/০৩ ইং মনোহরপুর।

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

ইসলামের ছোঁয়া পেলে আমেরিকার ইতিহাস অন্য রকম হতো

[হার্ভার্ড ভার্সিটি-১৯৭৭ সালের ৬ই জুন। এখানে আল্লামা নদভী নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনৈক বেলালী মুসলমান।]

আমেরিকার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

—"নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দর গঠন অবয়বে সৃষ্টি করেছি।"

সুধী শ্রোতামণ্ডলি!

আজকের বক্তব্যের ভূমিকা টানছি এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে, যার দিক নির্দেশনা উক্ত আয়াতের মাঝে পাওয়া যায়। আজ এমন কথা বলতে যাচ্ছি, যা অনেকের কাছে বেমানান মনে হবে। পাশ্চাত্য বলতে আজ আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহকে বোঝায়। ইউরোপ-আমেরিকা একদিকে সৌভাগ্যশীল যেমন, অপরদিকে দুর্ভাগ্যশীলও। একটি বাক্যের মধ্যে এ ধরনের বৈপরীত্য দেখে ও শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন আপনারা। এর মধ্যেই উক্ত বৈপরীত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।। এ আয়াতের মর্ম এ রাষ্ট্রের সাথেই বোধ করি সবচেয়ে বেশী খাপ খাবে। এ সেই আমেরিকা, গোটা বিশ্বের মোড়লীপনার চাবি যার হাতের মুঠোয়। এ নিয়ে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন জাগে, গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা এরা কি করে অর্জন করল? তামাম দুনিয়ার মানুষের জীবন কাল এদের ওপর কিভাবে নির্ভরশীল? নিশ্চয় এদের এমন কোন স্বভাবজাত গুণ আছে, যদ্দরুন সকলে আমেরিকার ভারবাহক সেজেছে। সারা জাহান যখন তাদের ভজন গীত গাইছে, তখন এদেশকে দুর্ভাগ্যশীল বলে বোকামী করলাম না তো? সত্যি বলতে কি, দুর্ভাগ্য হওয়ার প্রতিক্রিয়া কেবল ওদের মাঝে সীমিত থাকলে আমার বলার কিছু ছিল না। হতো না এ বক্তব্য তেমন একটা যুৎসই। কিন্তু সামনের আলো যেদিকে যায়, সেদিকে যায় পেছনের আলোও। তাই আমেরিকার দুর্ভাগ্য মানে সারা জাহানের দুর্ভাগ্য। আবহমান কালের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাবেন, মাথা খাটিয়ে যারা একদিন নতুন নতুন আবিষ্কার করে সকলকে হতবাক করে দিয়েছিল, তারাই একদিন পতনের চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছিল।

মনে রাখবেন, আমি শুধু এক বাক্যের মধ্যে ঐ বৈপরীত্যের নামোচ্চারণ করছি না এবং এক শ্বাসে-ই উচ্চারণ করছি, আমেরিকা! তুমি দুর্ভাগ্যশীল রাষ্ট্র। তুমি নিঃস্ব, আবার তুমি সৌভাগ্যশীলও।

আমেরিকার সৌভাগ্যশীল দিকগুলো হচ্ছেঃ এদেশকে আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর অনুদান দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন। তিনি এখানকার লোকদের শক্তি, কর্মস্পৃহা, মেধা ও বিবেকের প্রাচুর্য দান করেছেন। এরা আমেরিকাকে স্বর্গরাজ্য বানিয়েছে! অধুনা বিশ্বের দাম্ভিক শাসকবর্গও ওদের সামনে মাথা নত করে থাকে। ইকবালের ভাষায় সৌর রশ্মিকে এরা কব্জা করেছে। তারকাদের কক্ষপথের ওপর গভীর নজর রাখছে। এ দেশের মাটিকে সোনার চেয়েও দামী করেছে। এ জমিনে আজ সোনা ফলছে। ইথারে-পাথারে সৌভাগ্যের ঈগল পাখা মেলেছে। এদেশে (বাইবেলের ভাষায়) দুধ ও মধুর নদী বয়ে চলে। এগুলো আমেরিকানদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর, প্রতিযোগিতার ফসল, কর্মকুশলতার প্রাপ্তি। হার-না-মানা শক্তির পরম পাওয়া। গোটা আমেরিকা-ইউরোপে খোদায়ী অনুদান জালের মত বিছানো। প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ, এমন কি জনতার সংখ্যাধিক্যের বেলায়ও আমেরিকা পিছিয়ে নেই। অঢেল সম্পদ ভোগ করার মত জনতা এদেশে আছে। সৌভাগ্যের সোনার ঈগল কেবল আমেরিকানদের স্বপ্নের নীড়ে ধরা দেয়নি, বরং এর উসিলায় ধরা দিয়েছে গোটা বিশ্বের সুখের রাজ্য। আজকের বিশ্ব কোন না কোনভাবে আমেরিকার দরজায় ধরনা দিয়ে থাকে। দরিদ্র বিশ্ব আজ ওদের দরজায় ভিক্ষার ঝুলি পেতে থাকে। অপূর্ব সুশৃঙ্খল বলে ওরা আপনার দেশকে গুছিয়ে ফেলেছে। এসব দৃষ্টিকোণে ওরা সৌভাগ্যশীল জাতি। মধ্যপ্রাচ্য কিংবা অন্য কোন দেশে বসে এ কথা বললে হয়ত উক্ত সংকেতগুলো খুলে বলতে হতো, কিন্তু আমি, আপনি, সকলেই সৌভাগ্যের সেই আহা মরি দেশে আছি! সুতরাং ভেঙে খুলে বলার দরকার নেই

সৌভাগ্যের দোহাই পেড়ে আপনি যত সংকেতই তুলে ধরবেন তার সবটাই অভিপ্রেত ও যথার্থ। বিন্দুবিসর্গও মিথ্যা নয়। এক্ষণে বলে রাখা ভাল, আমি উগ্রতা, কট্টরতা, ধর্মান্ধতা, এশীয় জাতীয়তা কিংবা আঞ্চলিক বিদ্বেষ এগুলো বলছি না, বরং যা সত্য ও বাস্তবিক কেবল তা-ই বলছি।

এতদ্সত্ত্বেও আমেরিকা দুর্ভাগ্যশীল রাজ্য। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চারণ করছি। কেউ এটাকে আজগুবি, গাঁজাখুরি বললেও বলতে পারেন। কিন্তু সত্যের হৃদয়গ্রাহী পর্দায় মিথ্যার প্রলাপ অংকন অনর্থক। ইতিহাস কালের সাক্ষী, যা বলছি, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এর আপাদমস্তক সত্য অনস্বীকার্য।

সৌর রশ্মি যাদের করায়ত্ত

এটা শুধু এ দেশটির ব্যর্থতা নয়, বরং এটা গোটা মানব জাতির ব্যর্থতা। ব্যর্থতা মানবতার। বস্তুগত উৎকর্ষে এদেশের জুড়ি নেই। টেকনোলজির অগ্রগতিতে এরা রেকর্ড করেছে। হায়! এদেশটি যদি সঠিক দিশা পেত! পেত

দীন ইসলামের ছোঁয়া! তাহলে ইতিহাস অন্য রকম হতো। বস্তুবাদের পেছনে এরা যেমন মেহনত করছে, তেমন করছে না চরিত্র গঠনের জন্য। যে হারে মহাশূন্যে ওরা কুদরতের অফুরন্ত নেয়ামত পর্যবেক্ষণ করছে এবং

سنريهم اياتنا فى الافاق -

"আমি আসমানে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব" এর ওপর আমল করছে, যে হারে ওরা আল্লাহ্ তা'আলা অপার দানকে অনুভূতিগ্রাহ্য করছে, সে হারে যদি আল্লাহ্ তা'আলা নিদর্শনাবলী জনসমাজে প্রচার করত। আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে আত্মকেন্দ্রিক না করে তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত মর্ম জনসম্মুখে তুলে ধরত, তাহলে যে কত ভাল হতো! ওদের দূরবীন লাগানো চোখ যে হারে নিত্য-নৈমিত্তিক মহাশূন্যের অজানা রহস্য উন্মোচনে ঘুরে ফেরে, চাঁদের বুকে পা রাখে দেয়ার জন্য যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে, সে হারে যদি ওরা আবিষ্কার করত মানুষের অন্য রহস্য, খবর নিত আধ্যাত্মিক জগতের, তাহলে মানবতার সন্ধান পেত। মানুষের আর্থিক উন্নতি, শক্তি-সামর্থ্য, ভালবাসা-সৌহার্দ্য ও কলুষমুক্ত মুহাব্বত জগতে ওরা যদি একটু দৃষ্টি দিত, তাহলে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি এ জগতে অন্য কেউ হতো কি-না সন্দেহ। জড়বাদের পেছনে ওদের গবেষণা। হায়! ওরা যদি আত্মার গভীরতা জানত! সারা দুনিয়াকে দলামোচা করে যদি আত্মার মাঝে ঢোকানো হতো, তাহলে মৃত সাগরে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর (Concrete) যেভাবে হারিয়ে যায়, সেভাবে ওরা আধ্যাত্মিক চিন্তায় ডুবে যেত। মর্যাদা নিয়ে ভাবার সময় পায় না ওরা, পায় উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণী নিয়ে ভাবার সময়। রসায়ন, গণিত আর জীববিদ্যা (Chemistry Mathematics and Biology) নিয়ে ওদের গবেষণার অন্ত নেই। জড়বাদী হবার দরুন আজ ওদের এই করুণ পরিণতি।

আল্লাহতা'আলা বলেন ঃ

ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى -

'মানুষ যা পেতে শ্রম ব্যয় করে তা–ই পায়। তার চেষ্টা-কোশেশ দেখে পুরোপুরি বদলা দেয়া হয়।'

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

'আমি তাদেরকে ও তাদের সকলকে আপনার প্রভুর নেয়ামত ভরপুর করে দিয়েছি। আর আপনার প্রভুর নেয়ামত কারো জন্য বাধাগ্রস্ত নয়।'

মানুষ তার নিজস্ব শ্রমবলে যে ময়দানেই অগ্রসর হবে–আল্লাহ্ তাকে সফলতা দান করবেন। এখানে কোন রেশনিং পদ্ধতি নেই। নেই কোন ভাতা ব্যবস্থা। এখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। আমেরিকানরা একথা খুব

ভালো করেই জানে। আফসোস! ওদের শ্রম ছিল রসায়নের ওপর, চিকিৎসাবিদ্যার ওপর, উদ্ভিদ উন্নয়ন-অগ্রগতির ওপর। কিন্তু এসবের প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গীর্জা। বিজ্ঞানীদের ওপর গীর্জা চরম জুলুম করেছিল। দিয়েছিল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, অথচ যুগের চাহিদা ও কালের দাবী হচ্ছে, যে যত পার, নিত্য নতুন আবিষ্কার কর। মানবতাকে গীর্জা চরম জুলুম করেছিল। গীর্জাওয়ালারা জানত না মানবতাকে কি করে মূল্যায়ন করতে হয়। আহ! ওরা যদি মানবতার আকাশ ছোঁয়া মর্যাদার কথা জেনে তাকে মূল্যায়ন করত, তাহলে দুনিয়ার ভাগ্য আরো পূর্বেই ব্যাপক পরিবর্তিত হতো। ঐতিহাসিকরা লিখতেন অন্য ধারায় ইতিহাস।

যুগোপযোগী ধর্ম

বিশ্বে এমন দু'টি ঘটনা সূচিত হয়েছে, যদ্দ্বারা ওরা অসংখ্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঘটনা দু'টি হজ্ব ও খ্রীস্টবাদ। এ দু'টি জিনিষ ওদেরকে এমন এক অপ্রত্যাশিত ক্ষতির সম্মুখীন করেছে, যাতে শুধু আমেরিকা-ইউরোপ নয়, বরং গোটা বিশ্বে তার অশুভ পরিণাম রেখাপাত করেছে। এ ভূ-খণ্ডে খ্রীস্টবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে মুসলমানরা কমবেশী দায়ী। এ ব্যাপারে যত মাতমই করা হোক না কেন, সবই তাদের কৃতকর্মের ফল। এখানকার বাস্তবোচিত ধর্ম ইসলাম. যা সচেতন মানবতার অলস নিদ্রা ভেঙ্গে দিতে পারত। শক্তি-সামর্থ্য যোগাতে পারত, ওদের স্বাভাবিক বিবেক চালনার পথে দিতে পারত ইজ্জত-আবরুর নিশ্চয়তা।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

'আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠন অবয়বে করেছি।'

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

و لقد كرمنا بنى ادم و حملنا هم فى البر والبحر -

'আমি মানব জাতিকে পদ-মর্যাদা দিয়েছি, আসমান-জমিনের শক্তির অধিকারী করেছি। দান করেছি অসংখ্য নেয়ামত। তামাম সৃষ্টি জীবের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছি।'

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

انى جاعل فى الارض خليفة -

'মানব জাতিকে জমিনের খেলাফত প্রদান করব।'

ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে তৌহীদ। কুরআন বলে, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি মানুষকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আসীন করেছেন। হাদীসে কুদসীর দিকে তাকালে মানবতার মর্যাদার মাত্রা সহজে অনুধাবন করা যায় ঃ

'আল্লাহতা'আলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ

আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি।

আল্লাহ্! আপনি রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন? আপনি না এর থেকে পূত-পবিত্র!

আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত ছিল, তুমি তাকে সেবা করলে সেখানে আমায় পেতে।

বান্দারে! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি আমার অন্ন জোগাওনি।

ক্ষুধার্ত ছিলেন আপনি? আপনার সাথে ক্ষুধার কি সম্পর্ক?

আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল। তাকে খাদ্য দিলে আমায় পেতে সেখানে।

বান্দারে! আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তুমি বস্ত্রের ব্যবস্থা করোনি।

আপনি এ কি বলছেন?

আমার অমুক বান্দা বিবস্ত্র ছিল, তাকে কাপড় দিলে প্রকারান্তরে তো আমাকেই দেয়া হতো।'

মানব জাতিকে এর চেয়ে সম্মান আর কি দেয়া যেতে পারে? আরেকটু অগ্রসর হলে দেখতে পাই, মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন। হাদীসে এসেছে ঃ

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه -

'শিশু সন্তান নিষ্পাপ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা ও মাজুসী বানায়।

মানুষ আল্লাহর রঙ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানবের মূল উপাদান হচ্ছে সৎ স্বভাব। তার চরিত্র অত্যন্ত নির্মল, এই চরিত্রে কোন বক্রতা নেই।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ -

'সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।'

অর্থাৎ নেক কাজ করার জন্য কোন প্রকার কৃত্রিমতার দরকার হয় না। 'লাহা মা কাছাবাত' হচ্ছে 'মুজাররদ' 'অক্ষর কম''। কিন্তু 'মাকতাছাবাত'-এর মধ্যে অক্ষর বেশী। শেষোক্ত শব্দটির মধ্যে 'কৃত্রিমতা'র কথাটি উহ্য আছে। সুতরাং মানুষ যে নেক কাজ করে তা আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য করে। আর এটাই তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তির চাহিদা। পক্ষান্তরে সে যে বদ কাজ করে ওটা প্রকৃতিবহির্ভূত কাজ। এজন্য তাকে স্বভাবের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। একজন যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় যা সুন্দর, যা চিরন্তন তা-ই চায় মানুষের প্রবৃত্তি। এর বিরোধিতা করা আত্মাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল। অতএব, এই রাষ্ট্রের সঠিক যুৎসই ধর্ম হিসেবে ইসলাম ছিল অবধারিত। পূর্বেই বলেছি, এ রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের মিলন হলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো। একদিকে এদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন, ধন-দৌলতের প্রাচুর্য যা বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় স্ফীত হয়ে উঠছে। তাদের কর্ম নৈপুণ্য, অপরাজেয় গবেষণা ও অধ্যবসায়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিচরণের চিন্তা-ভাবনা, সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণের অভিযান, সৌর রশ্মি কব্জা করার কৃতিত্ব, মাটি থেকে সোনা ফলানো, জড় পদার্থকে সঞ্চালন করে জীবন দানের উপযোগিতা দান সত্যিই বিস্ময়কর ও অবিস্মরণীয়! এতদ্‌সত্ত্বেও ওদের কালজয়ী বিলাসিতা, শস্য-শ্যামল কুদরতী নেয়ামত, আত্মনির্ভরশীলতা, পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। ওরা সত্য সুন্দর ইসলামকে গ্রহণ করলে মনের কালিমা দূর হতো। তওবা কোন বাধ্যগত জিনিষ নয়, বরং মনের চাহিদা কেবল এটিই। তওবার পরিচয় হচ্ছে বাহ্য ও অভ্যন্তরের সাথে মিল না থাকা। অতএব, আত্মাকে বাহ্যাবয়বের সাথে মিল না করা। তওবাকারীদের মাহাত্ম্য কুরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের কামোদ্দীপনা ও শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। এখানে ভাববাদের কোন অবকাশ নেই। ইসলাম বাস্তববাদে বিশ্বাসী। ইসলাম সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ধর্ম। জ্ঞানী মাত্রই একে সহজে মেনে নিতে পারেন। এ ধর্ম বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী নয়। মানুষকে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বন্দী করে না, বরং মানব জীবনকে সুপরিসর একটি সুপরিমণ্ডলে নিয়ন্ত্রণে রেখে জীবন যাপন করতে বলে। এখানে তথাকথিত স্বাধীনতা কিংবা বল্গাহীনতার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণে বাধা দেয়নি কোনদিনও, বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—জ্ঞান চর্চা একটি ইবাদত। এ ধর্ম মর্যাদা, গবেষণা, চিন্তা ও প্রজ্ঞা অর্জনে জোর তাগিদ দিয়ে আসছে।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করছেন ঃ

و فى انفسكم افلا تبصرون -

'তোমাদের নফসের মধ্যে বহু নিদর্শনাবলী রয়েছে, তোমরা কি তা দেখতে পাও না?'

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ويتفكرون فى خلق السموت والارض -

"যারা আসমান-যমীনে সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে (তারা বলে), প্রভু, তুমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি!"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

سنريهم اياتنا فى الافاق -

"আমি (পৃথিবীর) দিকে, এমন কি তাদের সত্তার মধ্যে নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব!"

এ ধর্ম মানুষের বিবেক এস্তেমালে জোর দেয়। চিন্তা জগতকে নিস্তেজ আর বিবেক-বুদ্ধিকে অসার ও অকেজো করাকে নিন্দা করে। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা কত সুমহান ঃ

والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها -

"আর তাদেরকে যখন প্রভুর কথাবার্তা বুঝিয়ে দেয়া হয় তখন তারা বোবা ও অন্ধ হয়ে থাকে না (এবং তারা চিন্তা-ভাবনা করে না)।"

অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, আজ শুধু আমেরিকার বিপর্যয় নয়, বরং গোটা মানব জাতির বিপর্যয়। যে ধর্ম মানুষকে পাপাচারীর আকীদা দেয়, মানুষের মাঝে নিরাশার জন্ম দেয়, সে ধর্মমতাদর্শীদের পরিণতি এর চেয়ে আর কিইবা আশা করা যায়! খ্রীস্টবাদ শিক্ষা দেয় ঃ গোনাহ্ একটা তাকদীরগত ব্যাপার, একটা কিসমত। আর কিসমত বদলাবার নয়। সুতরাং খ্রীস্টানদের জন্য হতাশার। জন্ম পাপাচারীর : অবশ্য মানুষের ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে বোঝাতে হবে, তোমার ভুল হয়েছে, তাই তা শুধরে নাও। এ ভুল তোমার জন্মগত, এতে তোমার হাত নেই। এ ধরনের গাজাখুরি শিক্ষা পেলে ওরা যে কত বড় ধকল পায়, তা বোধ করি খুলে বলতে হবে না।

সারকথা হচ্ছে, খ্রীস্টবাদ-ই এদেশকে দুর্ভাগা বানিয়েছে। এ ধর্ম মানুষকে গলা টিপে মারতে শিক্ষা দেয়। মানুষের পূত-পবিত্র জীবনের ওপর খামাকাই গোনাহর কালো দাগ এঁকে দেয়। পরিণত করে তাদের দোষী হিসেবে। করে দেয় তাদের পশ্চাৎমুখী। তাই অনেকে ক্রমান্বয়ে সংসার সমরাঙ্গন ছেড়ে বৈরাগ্যবাদী হয়। হয় দুনিয়াত্যাগী।

গির্জা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অন্তরায়

দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, এক সময় গীর্জা কর্তৃক রাষ্ট্র শাসন চলত। গীর্জা তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় হয়েছিল। এক সময় অন্ধকার ইউরোপের ঘোর কাটতে লাগল। এক সময় ওদের মধ্যে এল বিজ্ঞানের জাগরণ। একে একে ওরা ছাড়াতে লাগল শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত-পা। গীর্জা এতে প্রমাদ গুণল। আগ পাছ না ভেবে গীর্জা ওদের মাঝে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি কাজে গীর্জাওয়ালারা ধর্মের দোহাই পাড়তে লাগল। কথায় কথায় পেশ করতে লাগল বিকৃত বাইবেলের সূত্র (Refernce)। বিজ্ঞানীরা যখন ভূ-স্তর নিয়ে গবেষণা করতে লাগল, গীর্জা তখন বাধা দিতে এগিয়ে এল। বিজ্ঞানীরা তাদের দাবীকে সমর্থনপুষ্ট করতে গিয়ে বলল ঃ জগৎ একটি নয়–এ ধরনের আরো জগৎ আছে। গীর্জা তখন ওদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দিল। বলল ঃ ওরা মুরতাদ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা যখন বলল ঃ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। সঙ্গে সঙ্গে গীর্জার মুফতীরা ফতোয়া ছুঁড়ে মারল। ফতোয়া আর অপপ্রচার করে বিজ্ঞানীরা নিবারণ করতে না পেরে গীর্জা বিজ্ঞানীদের তালিকা প্রণয়ন করল। শুরু হলো ধর্ম আর বিজ্ঞানের চিরন্তন লড়াই। ইউরোপবাসী গীর্জার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মকে বিদায় জানাল। ধরল জড়বাদ ও বস্তুবাদকে। গীর্জার সংহার মূর্তি দেখে ওদের মনে এটা ঘৃণার উদ্রেক হলো। ওরা সংকল্পবদ্ধ হলো, ধর্মমুক্ত পৃথিবী গড়তে না পারলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে হবে। মুক্তি পেতে হবে ধর্মান্ধ গীর্জার মরণ ছোবল হতে। সেদিন থেকে ওরা গীর্জাবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগল। তারপর হলো জড়বাদের গোলাম। আজকের এই প্রযুক্তির বিকাশ কেবল সেজন্যেই সম্ভবপর হয়েছে।

সুধীমণ্ডলি! এ উপাখ্যান সুদীর্ঘ ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অন্তরের জগদ্দল পাথর চাপানোর কাহিনী শোনা যেমন কষ্টকর, তেমনি কষ্টকর শোনানোতেও। ইতিহাস আপনাদের সামনে। আপনারা ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবগত। আপনারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আপনারা ইতিহাসের গভীর জ্ঞান রাখেন। ছাত্র-শিক্ষক-স্কলার বহু সুধীজন এখানে আছেন। আমি দু' চারটি বাক্য এমন এক ভার্সিটিতে রাখছি যার খ্যাতি জগৎময়। তাই সব কথা খুলে বলতে চাচ্ছি না।

পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতিফলন

পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা আজ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উপনীত। সৃষ্টি রহস্যের গভীর জ্ঞান ও অজানা তথ্য সম্পর্কে কেবল সৃষ্টিকর্তাই সবজান্তা ছিলেন, আমরা কিছুই জানতাম না। জানার দাবীটুকু করার নসীবও আমাদের হয়নি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার আশীর্বাদে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়ায় আমরা সে সব অজানা দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে পারছি। পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতিফলনে আজ

আমরা এমন এক উপকণ্ঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই, সৃষ্টি জগতের অজানা দিগন্ত, দেখতে পাই পাশ্চাত্য কৃষ্টির সূতিকাগার। অভিজ্ঞতা আর তার কৃতিত্বের ঝুসি আজ ভরপুর। তারা আজ বলতে পারে (এমন কি বলেও), কুদরতের চেহারা থেকে আমরা পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি প্রতিটি অজানা দিক, পরিণতিতে যা হবার হয়েছে। মানুষের জীবনকালকে তারা সুখময় করেছে। জড়বাদের উৎকর্ষের সুফল এনে দিয়েছে ঘরে ঘরে। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষের মনে কেন যেন স্বস্তি আসছে না! জাগতিক জীবনে সকলেই যেন জানা আশংকায় দোদুল্যমান। জীবন-মন কেমন যেন অতৃপ্তকর মনে হচ্ছে! আস্বাদনের বস্তু আছে, কিন্তু স্বাদ নেই।

যুগের দাবী আজ, আমেরিকায় এখন এমন একটি মতবাদ দরকার, যা দিশেহারা জাতিকে সুপথ ও সুমতির সন্ধান দিতে পারে, দিতে পারে তাদের নয়া পয়গাম। কিন্তু জিন্দেগীর সেই লাগাম আজ হাতছাড়া হয়ে গেছে। জীবন চালনার দায়িত্ব পালন করছে এক্ষণে পাশবিক আত্মা। মনুষ্যত্ব আজ মাঠে মারা যাচ্ছে। পাশ্চাত্য দর্শন আজ তাদের এমন এক সমুদ্র তীরে উপনীত করেছে, যেখানে স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। লাগামহীন উদ্‌ভ্রান্ত ওদের জীবন। ওদের হাত-পা নেই সঠিক স্থানে। রক্তহীন জাতি আজ জানছে না, তাদের জীবনের গন্তব্য কোথায়? ওরা যেন কিসের মোহে মোহাচ্ছন্ন! এশীয় দার্শনিকদের দরকার আলোহীন এ জাতিকে আলোর সন্ধান দেয়া, জড়বাদের উৎকর্ষকে সঠিক কাজে ব্যয় করে তাকে একটি সুখী মহীরুহে পরিণত করা। কিন্তু পরিস্থিতি যেন কানে আঙ্গুল দিয়ে বলছে ঃ এশিয়াবাসি! তোমরা এর থেকে অনেক দূরে!

আশার ঝলক

প্রতিটি কাজের পেছনে তাকদীরে ইলাহী কাজ করছে ঃ

ذالك تقدير العزيز العليم -

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে এদেশে সফর করার সুযোগ দিয়েছেন। এখানে শুধু হাতে-কলমে কাজ করা হয় না, বরং দিল-দেমাগ খাটিয়ে কাজ করার মত যথেষ্ট মুসলমান রয়েছেন। তারা ভার্সিটিতে কাজ করছেন। গবেষণা করছেন। অনেকে আমেরিকার শিক্ষালয়ে ধর্মের আলো বিকশিত করছে। দীক্ষিত হয়েছেন অনেকে ইসলামে। অপেক্ষায় আছেন কেউ কেউ। আমাদের বেলালী মুসলমানরা আশার প্রদীপে তেল সঞ্চার করছেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে আমেরিকায় আজ নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। আশার ঝলক উদ্গীরিত হচ্ছে। এক্ষণে এ রাষ্ট্র আমাদের কব্জায় থাকত, কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের দরুন, সীমাহীন বিলাসিতা আর

শ্রমবিমুখ হবার দরুন তা অলীক ইতিহাস হয়ে থাকছে। যখন তুর্কী সাম্রাজ্যের দাপট ছিল তখন পাশ্চাত্যে আমাদের একটা ভাবমূর্তি ছিল। স্পেনকে ধরে রাখতে পারলে আজ ইউরোপ-আমেরিকার সিংহভাগ অধিবাসী মুসলমান থাকত। জড়বাদের পূজারী না হয়ে ওরা ধর্মীয় বেড়াজালে বন্দী হতো। অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, তখন আমরা চুপটি মেরে এসেছিলাম। ধর্ম প্রচারকগণ আজ যেমন দেশে মিশন নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন এমনটি করতে পারলে ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। কথিত আছে, আমেরিকা আবিষ্কারক ক্রিস্টৈফর কলম্বাসের পূর্বে মুসলমানরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। তখন থেকেই দাওয়াত কার্য পুরো দমে চালু হলে ইসলামী আলোয় জয় জয়কার হতো। কিন্তু সবই আজ তিক্ত ঐতিহ্যে পরিণত। পূর্বসূরীদের সেই প্রায়শ্চিত্ত আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে মুসলিম বিশ্ব।

অধুনা মুসলিম বিশ্ব আমেরিকার সেবাদাসে পরিণত। যেভাবে তারা পাশ্চাত্যের দরজায় ধরনা দিচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, শ্বেত সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নকে পরিণত। যে হারে পাশ্চাত্যবাসীদের পদাংক অনুসরণ করছে, তাতে বলা যায়, এগুলো সবই তাদের স্বোপার্জিত পাপের সাজা। কারণ তারা আল্লাহর অমীয় বাণী আর রাসূলের চিরন্তন নীতিকে বিশ্বদরবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পৌঁছায়নি।

মুসলিম বিশ্বের সেই পাপ মুক্তির সময় এসেছে। তারা এক্ষণে বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তা। ক্রমে ক্রমে তারা নতুন রাষ্ট্র দখল করছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা একটি প্রজন্ম গড়তে পারছেন না। হেরেমের বহু শিক্ষানবীশ আজ এদেশে ভিড়ছেন। তাদের কাছে আমার আবেদন, আপনার জিম্মাদারী বুঝে নিন। পাশ্চাত্যের উচ্চ শিক্ষা আপনার উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানকার সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার পয়গম্বরী চিন্তাও আপনাকে করতে হবে। এদেশে এসে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে পরিবার-পরিজনকে সচ্ছলতা দান করা আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যে জিনিষটির অভাব এখানে, সে জিনিসটির অভাব পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ পাকই ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ -

অর্থ ঃ অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।

আপনি বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ আর জড়বাদী উন্নয়ন দেখলে বুঝবেন যে, এটা কুরআনী আয়াতের নমুনা–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

অর্থ ঃ আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।

আপনি পাশ্চাত্যের চরিত্রগত দুরবস্থা অবলোকন করলে সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হবেন যে, ওরা আজ অধঃপতনের অতলতলে নিমজ্জিত। একদিকে তাকালে দেখবেন, ওদের জড়বাদী উৎকর্ষ, অন্যদিকে তাকালে দেখবেন মানসিক অস্থিরতা ও শিশুসুলভ প্রলাপ। একদিকে দেখবেন, ওরা চাঁদের দেশে আরোহণ করছে, অন্যদিকে নৈতিক অবক্ষয়ে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে অসভ্য জানোয়ারে পরিণত হচ্ছে। এ সেই আমেরিকা, জাগতিক জীবনের যে সব সমস্যার সমাধান দিয়েছে, কিন্তু যুবক শ্রেণীকে দিতে পারেনি চরিত্র গঠনের সবক। ইকবাল বলেন ঃ

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب و تاریك مسخر نه کرسکا -

"যারা সূর্যরশ্মিকে কব্জা করেছে, জীবন আঁধারের ঘোর অমানিশা থেকে তারা মুক্তি পায়নি।"

আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি, এ হেন মহাক্রান্তিকালে মুসলিম বিশ্বের কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ যদি সোচ্চার হয়ে আমেরিকাকে জানিয়ে দিত, হে পাশ্চাত্যবাসি! তোমরা ব্যর্থ। হে পাশ্চাত্য! তোমার রোগের ঔষধ আমাদের কাছে আছে; তোমার ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে কুরআন ও হাদীসে রাসূল (সা.)। লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে, মুসলিম বিশ্বে এমন কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ আজ নেই, যে আমেরিকার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে। ওরা সকলেই পাশ্চাত্যের ভজন গীত গাইছে। পাশ্চাত্য আশীর্বাদে মুসলিম বিশ্বের আপাদমস্তক ধন্য। আমাদের অজ্ঞাতে পরমুখাপেক্ষিতার সমালোচনা করছে। দরিদ্রতা আর দেউলিয়াত্ব আমাদের মাথায় চড়ে বসেছে। ভিক্ষুকের মত হাত পেতেছি ইউরোপের দরজায়। জাতির এহেন নাযুক মুহূর্তে বিশ্বমোড়লের দিকে চোখ তুলে বজ্র হুংকার দেয়া যেনতেন কথা নয়; বিশ্বে এমন কোন দেশ আছে কি, নীতিবুভুক্ষ আমেরিকার মুখে যে দেশ তুলে দেবে এক লোকমা নীতিখাদ্য, দেবে চরিত্র গঠনের সুপরামর্শ?

আপনারা দ্বীনের ধারক-বাহক

আমি উচ্চাশা পোষণ করে বলছি, ধর্মীয় সুন্দর জীবন যাপন, রুচিশীল চালচলন ও শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আপনি বুঝিয়ে দিন, পাশ্চাত্যবাসীদের দেয়ার মত অনেক কিছু আপনার কাছে আছে। শুধু নিতে নয়, দিতেও জানেন আপনি। আপনার হাত শুধু নিতে উদ্যত নয়, বরং দান করতেও প্রশস্ত এবং এ ভার্সিটির শিক্ষক, ছাত্র, রিসার্চ স্কলার যা-ই হোন না কেন, সহকর্মীদের কাছে পেশ করতে পারেন ইসলামের কার্যকারিতা। জড়বাদী উৎকর্ষ

তাদের যা না দিতে পেরেছে, ইসলাম পারে তা দিতে। নিজকে সর্বদা একজন ধর্মপ্রচারক ভাবলে ক্ষতি নেই তো! নিষ্প্রাণ একটি পুতুলের মত না থেকে আপনি দিতে পারেন ওদেরকে ইসলামী কালজয়ী চিন্তাধারা। কলি যেমন নিজেকে উজাড় করে পুষ্প কাননকে বিকশিত করে, দ্বীনের জন্য তেমনি বিকশিত হোন আপনিও।

বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও আপনারা ভেবে দেখবেন বলে আশা করি। কুরআন ও নববী উসওয়া আমাদের আদর্শের রূপরেখা। যে সময় রাসূলের ঘরে খাদ্য ছিল না, ছিল না মদীনায় কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, ছিল না দেশ পরিচালনার পরিপূর্ণ সংবিধান। সেমতাবস্থায়ও তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তির (Super Power) কায়সারে রোম শামুয়েল (হেরাক্লিয়াস)-এর কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন।

فانى ادعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين ....فان تولوا فقولوا شهدوا بانا مسلمون -

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!

মুহাম্মদ যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে এ পত্র রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে। হেদায়েতপ্রাপ্তদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক! আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে সওয়াব দেবেন। পক্ষান্তরে এ দাওয়াত থেকে বিমুখ হলে মনে রাখবেন প্রজাদের গোনাহ আপনার ওপর নিপতিত হবে। হে আহলে কিতাব! এসো, এমন একটি কথার ওপর আমরা ও তোমরা এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর ইবাদত করব না। আমাদের কেউ যেন নিজেদেরকে প্রভু না বানাই! যদি এতে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস স্থাপন করতে না পার, তবে সাক্ষী থেকো, আমরা বিশ্বাসী হয়েছি!"

আমরা তো সেই নবীর উম্মত, যিনি দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে কোন অবস্থান ছিল না, সেই অখ্যাত অবস্থায়ও আল্লাহর সাহস বুকে আগলে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, যাদের রাজকোষ ছিল শূন্য, খাদ্য ভাণ্ডারে ছিল না এক কাতরা খাদ্যও। সেমতাবস্থায় এভাবে নির্ভীক চিত্তে اسلم تسلم - এর মত বাক্য স্ফুরণ সত্যিই আশ্চর্যজনক! আমরা সেই রাসূলের (সা.) আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাই আমাদের কাজকর্মও তেমনটি হওয়া চাই। আমাদেরও এমন কিছু করার

দরকার আছে। আপনি ওদের জানিয়ে দিন, তোমরা ধর্মীয় আলো থেকে বঞ্চিত। ইসলামের আলো ছাড়া জাগতিক চোখ ধাঁধানো আলো তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ আত্মহত্যার মুখে। ওরা আজ এমন এক পরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে যেখানে পতিত হলে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র আল্লাহর বিধান ওদের বাঁচাতে পারে। জড়বাদ আর অধ্যাত্মবাদের সংযোগ সেতু বন্ধনে রচিত করার জুড়ি নেই। জড়বাদ যে সমাজে প্রবল, অথচ অধ্যাত্মবাদ শূন্য, সে সমাজের পতন অনিবার্য। এ পয়গাম মুসলিম জাতির শোনানো দরকার ছিল। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন, 'হে পাশ্চাত্য! তুমি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছ। আমরা তোমাকে বাঁচাতে চাই।'

কিন্তু মুসলিম বিশ্বের মাঝে আজ এ স্পন্দন নেই। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। ইসলামী তালীম দেয়া তো দূরে থাক, আজ পাশ্চাত্য তন্ত্রমন্ত্রে নিজেদের পরিত্রাণ খুঁজছে আত্মসম্ভ্রমবোধহীন জাতি। আপনারা শাসক না হলেও এ কাজটি সমাধান করতে পারেন। আল্লাহর বলের সাথে অদম্য স্পৃহাকে যোগ করে দাওয়াতের মহান কাজ কাঁধে তুলে নিতে পারেন। সাধ্যমত ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন, দোয়া ও তাসবীহ্-তাহলীল দ্বারা এ কাজে মদদ পেতে পারেন। ভালো-মন্দ বোঝার মত জ্ঞান আপনাদের পর্যাপ্ত। সচেতন আপনাদের ধর্মীয় আত্মা। এ জগতই সব কিছুর শেষ নয়। এ জগত শেষে আপনাকে আরেকটি জগতে যেতে হবে। দাঁড়াতে হবে রাব্বুল আলামীনের সামনে। দিতে হবে জীবনের হিসেবে। সেই চিরঞ্জীব সত্তার রাজী খুশীকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে নেয়া দরকার।

সুতরাং আপনারা আল্লাহবিমুখ পথহারা এ জাতিকে জীবনের অজানা দিকগুলোর সন্ধান দিন। বাস্তব ও অফুরন্ত জীবনের রহস্য উন্মোচন করুন। গীর্জা ও খ্রীস্টবাদের পাগলা ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েও যে জগতের সন্ধান পায়নি, সেই অনন্ত জীবনের সন্ধান দিন আপনারা। আমি বিশ্বাস করি, ওরা যা পারেনি, আপনারা তা পারবেন।

সমবেত শ্রোতামণ্ডলি! আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। আমার তড়পানো হৃদয়ের অনুভূতি ও ব্যথাভরা অভিব্যক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আল্লাহর দরবারে আরজ করতে পারব, বিশ্বের সবচে' বড় মন্দিরে আমি আযান দিয়েছি, দিয়েছি তোমার দ্বীন প্রচারের তরীকা বাতলে। জাতির আত্মাভিমানী অসহায় এক বৃদ্ধের এ কথা দ্বারা ন্যূনপক্ষে একজন লোকও প্রভাবান্বিত হলে এ বক্তব্য সার্থক হবে। দোয়া করি, আল্লাহ্ আপনাদের সহীহ্ আমল দান করুন! দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন!

হুঁশিয়ার! এ দেশেও যেন ইউরোপিয়ান ভাবধারায় ইসলাম সৃষ্টি না হয়

[১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুন উত্তর আমেরিকার নিউজার্সি শহরের ইসলামী সেন্টারে অনুষ্ঠিত মাহফিলে মাওলানার ভাষণ। ভাষণের পূর্বক্ষণে মিশরের বিদগ্ধ আলিম সুলাইমান দানী সাহেব মাওলানার পরিচিতি তুলে ধরেন। মাওলানার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন : আরবী/ইসলামী বিষয়ে আরব্য মনীষীদের পাশাপাশি ভারতীয় উলামাদের অবদান কোন অংশে কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশী। শ্রোতাদের মধ্যে আরব, ভারত ও পাকিস্তানের লোকজন ছিলেন। আরবী ভাষণ টেপ রেকর্ড থেকে অনুলিপি করা হয়। মাওলানা স্বয়ং তাতে সংস্কার কার্য চালান। মৌলভী শামস তিবরিজ উর্দু তরজমা করেন।]

মোহ্তারাম দোস্ত বুযুর্গ!

ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এই সম্মেলনে যোগদান করতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি। উত্তর আমেরিকা ও কানাডায় এ আমার প্রথম সফর। এর পূর্বে এখানকার জনগণের দ্বীনী মহাব্বত ও ধর্মীয় জীবন যাপনের ফিরিস্তি শুনে যার পর নাই খুশী হয়েছি। মনের স্ফীত ফুর্তি আগলে রাখতে পারছি না। বাস্তবিকই পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তের অবস্থিত দ্বীনী ভাইদের এই বিশাল জলসায় মিলিত হতে পারা সত্যিই অকল্পনীয়। আপনাদের দ্বীনী তাগিদের প্রশংসা করে খাটো করতে চাই না।

আমি পরে অবশ্য জানতে পারলাম ইসলাম এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। যে জাতি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প বিজ্ঞানে (Technology) গোটা দুনিয়ার ওপর মোড়লী করছে, এমন কি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেও তাদের দবদবা খাটো করে দেখার জো নেই। আল্লাহর শোকর! ইসলাম এদেশে আস্তে আস্তে অনুপ্রবেশ করছে। ইনশাআল্লাহ্ সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এদেশই সারা বিশ্বের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।

এ দেশে আমি ইসলামের লক্ষণ দেখছি, এটা মুসলমানদের গর্ব ও খুশীর বিষয়। তবে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে একটা সংশয় দানা বেঁধে উঠছে সেটা হলো, ইসলাম ও ইসলামী তাহজীব। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুর দূরে বহু দূরে অবস্থিত এই বেলাভূমিতে ইসলামীকরণের যে সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাঁর ওপর আলোকপাত করেছেন আমার পূর্বেকার বক্তা তার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায়। বিজ্ঞ আলিম সুলাইমান দানী সাহেব বলেছেন : ইসলাম কোনো দেশ-জাতি ও স্থান বিশেষে বিশেষিত নয়। আমিও এ কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত, ইসলাম কোন রাষ্ট্র বা দেশভিত্তিক ধর্ম নয়; তবে একথা অনস্বীকার্য,

ইসলামের জন্য একটি পবিত্রভূমি ও যোগ্য পরিবেশের দরকার। সেই দেশ ও পরিবেশ থেকে ছড়িয়ে পড়বে ইসলামের আলো, ইসলামী মহান জীবন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে অনৈসলামী বা নব দীক্ষিত জাতি। এজন্য ইসলামী বেলাভূমির দরকার। আরেকটু বেড়ে গিয়ে বলতে গেলে ইসলামের বিশেষ মৌসুমের দরকার, যার নির্দিষ্ট শুষ্কতা ও আর্দ্রতা বিশেষ কাজে আসে।

সত্যি বলতে কি, ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম। এটা কোন মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত ধর্মমত নয়, নয় কোন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ফসল যে তা মতবাদ কাগজ ও বাক্সবন্দী থেকে লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধি করে। ইসলাম স্রেফ আক্বীদাগত আমলগত টোটা-ফাটা ধর্মের নাম নয়, বরং ইসলাম একই সময় আক্বীদা, আমল মুআমাল ও চরিত্র গঠনমূলক অনুভূতিশীল সমন্বিত ধর্মমত মাত্র। এটা একটি নতুন প্রয়াস যা মানুষের স্পৃহাকে প্রবৃদ্ধি করে দেয় একটি নতুন জীবনের সন্ধানে। আল্লাহ্ তা'আলা কারো কাছে ইসলামের মর্ম বিকাশ করে দিলে সে ইসলামকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। তার জীবন সফলতার রঙে রঙীন হয়। মনে হবে যেন সে নতুন করে জন্ম নিয়েছে! তার মনের কুসংস্কার দূর হয়ে সেখানে নূর প্রতিভাত হয়েছে। ইসলামের বিজলি তার জীবনে এমনভাবে প্রভাব ফেলে, যেমন বিদ্যুৎ এক তার থেকে আরেক তারে চলাচল করে!

ইসলামের সঠিক দিক কারো কাছে স্পষ্ট করে ধরা দিলে সে দেখতে পাবে, এটা শব্দ, অর্থ ও পুঁথিগত ধর্ম নয়, বরং দেখবে এটা এক নব ও অনন্য ধর্মমত। তাইতো এ ধর্ম অনেক কিছু পছন্দ করে, আবার অনেক কিছু পছন্দ করে না। যেমন রাসূল (সা.) অনেক জিনিষ পছন্দ করতেন, আবার অনেক জিনিষ পছন্দ করতেন না। যেমন তিনি প্রতিটি ভাল কাজ ডান দিয়ে শুরু করতেন, এমন কি জুতা পরিধান ও মাথা আচড়াতে ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন। এমনিভাবে অনেক জিনিষ তিনি অপছন্দ করতেন। বস্তুত ইসলাম একটি মননশীল ধর্ম, ঐশী ধর্ম বিশেষ এক মৌলিক মতবাদ। এর বিবরণী সরাসরি আসমান থেকে অবতীর্ণ। নিষ্পাপ নবীগণ এর বাহক। এখন আমরা উত্তরাধিকার হিসেবে পাচ্ছি তার ধারা।

এজন্যই আল্লাহ্ পাক ইসলামকে صبغة الله বলেছেন। ইসলাম যদি স্রেফ আক্বীদা ও আমল হতো, তাহলে তাকে নিছক আল্লাহর রঙ ও নমুনা বলে চালিয়ে দেবার প্রায়াস পেতেন না। صبغة

এর অর্থ হচ্ছে ছাপ, দাগ, সনাক্তকরণ চিহ্ন, বিচারধর্মী নিদর্শন। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষে মানুষে, জীবনে জীবনে, কাজেকর্মে, বস্তুতে বস্তুতে, স্বাদে স্বাদে একে অপরের বিরোধী হবে। ইসলামবিরোধী যে কোন জিনিষের বেলায় শরীয়ত মানুষকে তা পরিহার করতে ঐ বৈরী জিনিষ চিহ্নিত করে দিয়েছে। বলেছে ঃ

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى -

'তোমরা জাহেলী নারীদের মত নিজেকে প্রদর্শন করো না।' এমনটি কেন বলা হলো? জাহেলী যুগ তো সে বহু আগেই অতিবাহিত হয়ে গেছে, তার পরেও জাহেলী যুগের পুনরাবৃত্তি করে কুরআন কেন লজ্জা দিচ্ছে? এটা এজন্য করা হচ্ছে জাহেলীয়াত একটি স্বতন্ত্র যুগের নাম। এতে ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব, আদেশ-নিষেধের কোন বালাই ছিল না। এ যুগকে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ঘৃণা করেন, দিয়েছেন অভিসম্পাত। হাদীস শরীফে আছে ঃ

ان الله نظر الى اهل الارض........

"আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠ পানে আরবী-অনারবীদের দেখে নাখোশ হন। খুশী হন স্রেফ আহলে কিতাবদের দেখে।" (মিশকাত)

এই জাহিলিয়াত আল্লাহর কাছে অপছন্দ ছিল। অভিশপ্ত ঘোষণা করে বান্দাদেরকে তা পরিহার করতে বলেন। তাই ঐ জাহিলিয়াতের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, তার থেকে আগাম হুঁশিয়ারী দিচ্ছেন ঃ

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ -

'যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জেদ পোষণ করত।' (সূরা ফাতাহ-২৬)

নবী করীম (সা.) কোন মুসলমানের মধ্যে জাহিলিয়াতের নামগন্ধ খুঁজে পেলে তাকে ধিক্কার দিয়ে বলতেন ঃ

انك امر فيك جاهلية -

'তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের ছাপ আছে।' (বোখারী খঃ ১, পৃঃ ৯)

হযরত আবুজর গিফারী (রা.)-এর মত একজন মহান সাহাবীকে যখন তাঁর গোলাম ও তাঁর মাঝে সম্পর্কের ফাটল দেখলেন, দেখলেন বাদানুবাদ করতে, তখন তাঁকে এই হাদীসে শোনালেন। একথা শুনে হযরত আবু জর গিফারী (রা.) এতই প্রতিক্রিয়াশীল হন যে, শেষ পর্যন্ত গোলামকে সমমর্যাদা দান করেন, এমন কি নিজে যে পোশাক পরেন, গোলামকে তা পরাতে শুরু করেন। নিজে যা খান তাকে তা খাওয়ান। আল্লাহ্ পাক ইসলামকে তাঁর রঙ বলে অভিহিত করেছেন। ইসলাম যদি একটি স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা না হতো, তাহলে তিনি এমন শব্দে ইসলামের পরিচয় দিতেন না।

صبغة الله و من احسن من الله صبغة ـ

"এটা আল্লাহ্‌র রঙের চেয়ে উত্তম রং আর কার হবে?" (সূরা বাকারাহ-১৩৮)

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আম্বিয়া কেরামের অনুসরণ করার জন্য বান্দাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। পেশ করছেন সুদীর্ঘ পরিসরে আম্বিয়া কেরামের অনুকরণীয় সূচী ও নীতিমালা–

وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط ....

"আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি–তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসূফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সহকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরো যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াছকে, তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, লুতকে-প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি। আরও তাদের ওপর কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে আমি মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথে চালান। যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন'আম-৮৪-৮৯)

এরপর ইরশাদ করেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ........

" এরা এমন ছিল, যাদের আল্লাহ্‌ সৎ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।" (আন'আম-৯০)

আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুসরণের এই হুকুম নবীর জন্য বিশেষিত করে দিয়েছেন যিনি চরিত্র, উত্তম আদর্শের মডেল ছিলেন। সুতরাং নবীর মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন।" (আল ইমরান -৩১)

সত্যি বলতে কি, ইসলাম অন্য ধর্মের তুলনায় স্বতন্ত্র। যদি কোন খ্রীস্টান নিজেকে নাছরা পরিচয় দেয়, তাহলে এতটুকু তার জন্য যথেষ্ট। পরে সে তাহজীব, তামাদ্দুন, দর্শন, জীবনাদর্শ, চিন্তাধারায় যে কোন মতবাদের অনুসারী হতে পারে। আমার এক ভারতীয় দোস্ত একজন শিক্ষিত হিন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইয়া বলুন তো! কোনো মুসলমানকে তার ধর্মীয় পরিচয় পেশ করতে বললে সে বলে ঃ যে ব্যক্তি কালেমা لا اله الا الله محمد رسول الله পড়বে এবং এ বিশ্বাস রাখবে সে-ই মুসলমান। এটাই মুসলমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এভাবে আপনাকে হিন্দু পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আপনি কি বলবেন? আমি বিস্তারিত কোন উত্তর চাইনি। কেননা বিস্তারিত জানবেন ব্রাহ্মণ ও হিন্দু পণ্ডিতগণ। আমার হাতে স্রেফ ১/২ মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে আপনি জানিয়ে দিন, হিন্দু ধর্মমত কি? কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে হিন্দু বাবা বললেন ঃ দেখুন! হিন্দু সব কথার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে। সব বিশ্বাসকে সে অস্বীকার করতে পারে। একজন লোক হিন্দু পরিচয় দিতে এতটুকু তার জন্য যথেষ্ট। আর কিছু তার দরকার নেই। এরপর সে যা-ই কিছু করুক না কেন, সে হিন্দুই থাকবে।

আমি বলতে চাই, ইসলাম এ ধরনের কেন ধর্মের নাম নয়। একটু আগে যেমন বললাম, ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মমতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে ইসলাম সিদ্ধহস্ত। ইসলাম তার গণ্ডি এঁকে দেয়, যাতে সহজেই বোঝা যায়, এটুকুই ইসলামের পরিসীমা। ইসলাম বহু পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছে ঃ এটা ইসলাম, এটা কুফর। এতটুকু হালাল, এতটুকু হারাম, এটা জাহিলিয়াত,.এটা ইসলাম।

পাক-না-পাকের গণ্ডি এঁকে দিয়েছে। একটি এলাকা চিহ্নিত করে বলেছে, এটা ইসলামের গণ্ডি, এর বাইরে গেলে মুরতাদ হয়ে যাবে। মুরতাদ কথাটি কেবল ইসলামের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা অন্য কোন ধর্মে মুরতাদ কথাটি নেই, থাকলে তা যথার্থ নয়। মুরতাদ ইসলাম ধর্মের একটি বড় গুনাহ। হাদীসে এসেছে ঃ

و يكرهان ان يعود الى الكفر......

"পরিপূর্ণ মুমিন কাফের হওয়াকে তেমন ভয় করে, যেমন আগুনে পড়ার ভয়ে সে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে।"

ইসলামের যখন এই সক্রিয়তা ও স্বতন্ত্র সত্তা, তখন ইউরোপ-আমেরিকার মুসলমানদের জিম্মাদারী অনেক বেড়ে যায়। কেননা ইসলাম অন্য ধর্মের মত নিছক মৌখিক স্বীকৃতির নাম নয়, আক্বীদা-আমল ইবাদতের নাম নয়। এমনটি হলে এ ধর্ম পালন খুব সোজা ছিল, কিন্তু এ ধর্ম এক বিশেষ রঙে রঙিন। এক অভিনব জীবন ব্যবস্থা, এক বিশেষ জযবা ও জোশের ধর্ম। স্পৃহা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

ধর্মমত। অন্যান্য ধর্মমতের তুলনায় অধিক নাযুক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। বস্তুগত মাপকাঠিতে এক বুনিয়াদী মতবাদ। তাই এ ধর্ম গ্রহণ করলে কাজকর্ম বহু হুঁশিয়ারীর সাথে করতে হয়। এজন্যই আমরা শুধু গবেষণা ও প্রবন্ধ শোনানোর ওপর ভরসা করতে পারি না। এ সব কিতাব ইলমী মানে যতই উচ্চ মাপের হোক না কেন, যতই উপকারী হোক না কেন, ইসলামকে এর ওপর সীমাবদ্ধ করা যাবে না। ইসলাম হচ্ছে একটি পরিবেশের নাম, একটি রং যেখানে আমরা তাকিয়ে ইসলাম দেখতে পাব, কানে শুনব তার আওয়াজ, হাতে ছুঁতে পারব তা। ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারব যা। এজন্য কানুন ও নীতিমালা মেনে চলতে হবে, আমাদেরকে কেবল সেই ভূ-খণ্ডে যেতে হবে, যেখানে ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম জাতির বসবাস আছে। যেখানে একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে। মুসলিম জাতির আজ সংস্রবের প্রয়োজন। ঈমানদার বুযুর্গদের একান্ত সান্নিধ্যের দরকার। আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছি তিনি তাঁর নবীকে নেক্‌কারদের সাহচার্য অর্জন করার কথা বলেছেন (অথচ তিনি নিষ্পাপ এবং আল্লাহর একান্ত মাহবুব)।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَاتَعْدُعَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُزِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَاتُطِعْ مِنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ـ

"আপনি নিজকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। আপনি তার আনুগত্য করবেন না।" (সূরা কাহাফ-২৮)

নিষ্পাপ নবী সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ এমনটি হলে সাধারণ মুসলমানদের বেলায় কেমনটি হবে, তা বলা বাহুল্য। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সংসর্গ অবলম্বন কর।" (তাওবাহ-১১৯)

এ দ্বারা বোঝা গেল, কিতাব মুতালা' রিসার্চ করা দ্বারা এই মাক্‌ছাদ হাসিল হয় না।

কানাডায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ছোট্ট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। অতএব, এই নব জাগরিত দেশে বসবাসরত মুসলিমদেরকে সতর্ক হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা একটু সচেতন হলে এদেশ অচিরেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

"যারা আমার (দ্বীনের) জন্য মেহনত করবে, আমি অবশ্যই তাদের সৎ পথ প্রদর্শন করব। আর আল্লাহর মদদ নেক্‌কারের জন্য রয়েছে।" (সূরা আনকাবুত-৬৯)

মোটকথা, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বুলন্দ করার চিন্তা-ভাবনা করে, তিনি তাদেরকে এমন ঈমান, হিকমত, দূরদর্শিতা দান করেন, যার কল্পনা মানুষ করতে পারে না।

আমার মনে হয়, দ্বীন প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে আপনারা প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছেন। আপনাদের প্রবাস যদি মুবাল্লিগদের প্রবাস হয়, তাহলে সোনায় সোহাগা হবে! আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হোক, এদেশে ইসলামী কৃষ্টি (Culture) চালু করতে হবে। একটি সত্য সুন্দর ধর্মের প্লাটফরম গড়ে তুলতে যত্নবান হতে হবে। ব্যক্তি থেকে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির সর্বক্ষেত্রে ইসলাম চালু করার পূর্বে মানবাধিকার নিয়ে ভাবতে হবে। সাহাবাদের নীতি এক্ষেত্রে অনুকরণীয়। তাঁরা ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক দিককে বিকশিত করেছেন। তাইতো সাহাবারা ঈমান, আক্বীদা, চরিত্র গঠন, শৌখিনতা, সমাজ গঠন, মোটকথা জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে ছিলেন মাপকাঠি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ

من راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن -

"মুসলমানরা যাকে ভাল মনে করেন, আল্লাহও তাকে ভাল মনে করেন।" মুহাদ্দিসীনদের নিকট 'মুসলিম' শব্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম অর্থাৎ সাহাবাগণ যাকে ভাল মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভাল মনে করেন। তাইতো ঈমান, ইসলাম দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি। আপনাদেরকে এ পাশ্চাত্য নোংরা পরিবেশে এমন একটি সমাজ উপহার দিতে হবে, যা সাহাবায়ে কেরামের মহিমায় মহিমান্বিত। একজন আমেরিকান ও

কানাডীয় আপনাদের অশ্রুতপূর্ব সমাজ জীবন দেখে ইসলামের দিকে ঝুঁকতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তারা পিছে ফেলে আপনাদের দ্বীনী সংস্কৃতিকে যেন আঁকড়ে ধরতে স্বেচ্ছাপ্রবণ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমার সন্দেহ ও সংশয় হয়, আপনারা সাপের খোলসের মত আত্মগোপন করে থাকেন কি-না! খবরদার! যা কিছু জানেন তাকেই অবলম্বন করে নৈতিক বিপর্যয়গ্রস্ত এ সমাজগর্ভে আপনাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ঢুকিয়ে দিন। নিজকে ছোট ভেবে পিছপা হবেন না কভু। আল্লাহ্ না করুন, আপনারা আত্মজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নিজের মাঝে সীমিত রাখতে আমেরিকার ইসলাম, ইউরোপীয় ইসলাম, জাপানী, ইরানী, ভারতীয় ও পাকিস্তানী স্টাইলের ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, যা অদৌ মদীনার ইসলাম নয়, এ দ্বারা পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পারবে না। এরূপ ইসলাম দ্বারা মানুষের স্বভাবজাত মতপার্থক্য থেকেই যাবে। আমেরিকার দ্বন্দ্ব এশিয়ার সাথে থাকবেই। জাপানীরা আফগানীদের সাথে মতানৈক্য করবেই। এমন একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দেখে অন্য জাতি আদর্শের কিছু খুঁজে পাবে না। এমনি ধরনের আধুনিক (Up-to-date) ইসলাম, অন্তঃসারশূন্য ধর্মমত মূল ইসলামের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়, সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। ইসলামকে সম্পূর্ণ সর্ববাদী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলামকে সম্পূর্ণ জড়তাহীন প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করতে হবে, যাতে কোনো দিকই কারো কাছে অজানা না থাকে। ইল্মের জটিলতা আর উলামাদের গাফলতির দরুন আজ ইসলাম সকলের কাছে অপরিচিত হয়ে আছে। তাই আপনারা সেই গাফলতির দিকগুলো চিহ্নিত করুন, অজানা ও অনীহাগত দিকগুলোকে কানাডাবাসীদের সামনে পেশ করুন। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) যদি প্রাচ্যের জন্য হতেন, তাহলে দ্বীন ইসলাম বিকৃতির হাত হতে রক্ষা পেত না। প্রাচ্যের বহু লোকের নিকট ইসলাম আজ অজানা থাকত।

সুতরাং আঞ্চলিকতাদুষ্ট, ভৌগোলিক ও আত্মপূজারী ভাবধারাসম্পন্ন ইসলাম থেকে হুঁশিয়ার হোন! মূল ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হোন!

এই বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্ আমায় বললেন, এই বিষয়টি আপনাদের জন্য যথার্থ মনে করছি, যুগোপযোগী মনে করছি ইউরোপ-আমেরিকাবাসীদের জন্য। ঘরে প্রত্যাবর্তন করলে আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন, আমার টুটাফাটা এলোমেলো কথাগুলো। অভিজ্ঞতা এর সত্যায়নকারী। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! কায়েম রাখুন সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর!

দুর্লভ মানবের সন্ধানে

[আমেরিকায় অবস্থানকালে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী কর্তৃক শিকাগোতে প্রদত্ত ভাষণ]

মাওলানা রুমী (র.)-এর একটি প্রসিদ্ধ চরণ, যা আল্লামা ইকবাল তাঁর 'আসরারে খুদীতে' শিরোনাম করে লেখেন ঃ

وای شیخ باچراغ گشت گردشهر

کزدم دوز ملولم وانسانم ارزوست۔

"মাওলানা রুমী (র.) বলেন, আমি জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে জ্বলন্ত চেরাগ হাতে নিয়ে কিছু তালাশ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হযরত! আপনি কিছু অনুসন্ধান করে ফিরছেন কি? বুযুর্গ বললেন ঃ আমি হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তুর তাড়নায় বিরক্ত হয়ে মানুষ তালাশ করছি। আমার চতুষ্পার্শ্বে যে সব মনুষ্যমূর্তি আছে, এদের দ্বারা আমার অন্তর বিষিয়ে উঠেছে, ভেঙ্গে গেছে আমার ধৈর্যের বাঁধ। তাই খুঁজে ফিরছি একজন শেরে খোদা-একজন রুস্তমের মত বীর পুরুষ। কৌতূহলবশে আরজ করলাম ঃ হযরত! আপনি দুর্লভ বস্তুর সন্ধানে নেমেছেন। আপনি যা চাচ্ছেন, তার সন্ধান মেলা মুশকিল। বুযুর্গ বললেন ঃ এটাই তো আমার দোষ। যা দুর্লভ তার সন্ধানই করি সর্বদা।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি!

আমি মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের আহ্বানে এদেশে আসি নি। এসেছি একজন ছাত্র, একজন যৎসামান্য জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে। আমার জন্য আমেরিকা এক নতুন জগৎ। শুধু এ কন্‌ফারেন্সে দাওয়াত দেয়ার জন্য নয়। এতে যোগদান উপলক্ষে গোটা আমেরিকা দেখতে পারব। মিলিত হতে পারব এখানকার অধিবাসীদের সাথে। নাতিদীর্ঘ এ সফরে তাদের লোক-লৌকিকতা যতদূর জানা যায় জানতে পারব। সুযোগটি আমাকে করে দিয়েছে এ সংস্থাটি। তাই তাদের আন্তরিক মোবারকবাদ দিচ্ছি। উত্তর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, এমন কি কানাডার ৩/৪ হাজার মাইলও সফর করেছি। আমার সফরের অন্তিম লগ্নে হচ্ছে এ সম্মেলন। এক্ষণে আপনারা জানতে চাইবেন আমার সফরের অভিজ্ঞতা। জানতে চাওয়াটাই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। হতে পারে, আমি এমন এক দেশের বাসিন্দা-শতাব্দীকাল ধরে যা পাশ্চাত্যের চেয়ে অনুন্নয়নশীল। যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে তাই পাশ্চাত্যের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রশংসা করার দরকার ছিল। দরকার ছিল এদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন-অগ্রগতির উপাখ্যান শোনানো, কিন্তু এসব করতে গেলে 'মা'র কাছে মামা বাড়ির গল্প' শোনানো হবে। তাই ওদিকে যাচ্ছি না। আমার চেয়ে আপনারা অনেক বেশী জানেন।

আমি আপনাদের সম্মুখে মাওলানা রুমীর ক'ছত্র শুনিয়েছি, যা অনেকের কাছে রহস্যজনক মনে হতে পারে। মাওলানা সাহেব এমন এক দেশের বাসিন্দা ছিলেন, জাগতিক উৎকর্ষ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলায় যে দেশ এতটুকু পিছিয়ে ছিল না। রুমীর জন্মভূমি তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা সভ্য ও সংস্কৃতিশীল দেশ ছিল। তিনি যে শহরে বসবাস করতেন, সে শহর সেলজুকীদের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। নাম তার 'বলখ'। তৎকালে 'বলখ' মডেল সিটি বলে খ্যাতি কুড়িয়েছিল। একে প্রাচ্যের 'গ্রীস' বললেও অত্যুক্তি হবে না। এটি ছিল সাহিত্য, শিল্পকলা, কাব্য চর্চা ও দর্শনের লীলাভূমি। এগুলো নিছক কথার কথা নয়, ইতিহাসের ধূসর পাতাগুলো উল্টালে দিবালোকের ন্যায় তা-ই আপনাদের সামনে প্রতিভাত হবে।

সেই উন্নত দেশের একজন নাগরিক হয়ে মাওলানা সাহেব অন্তরের চেরাগ আর মনের ধুকপুকসর্বস্ব অস্থিরতাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। বলাচ্ছেন নিজের মনের অভিব্যক্তি অন্যের মুখ দিয়ে। শোনাচ্ছেন জনৈক বুযুর্গের কৌতূহলী উপাখ্যান। সত্যি বলতে কি, এসব তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। অন্যের মুখ দিয়ে তো নয়, প্রকারান্তরে খোদ নিজেই বলছেন ঃ পত্র-পুষ্পে পল্লবিত এ শহরের একজন বাসিন্দা আমি। মানুষের বাহ্যিক রূপ দেখে আমার শংকা অন্তহীন। এখানে সবই আছে। তবুও যেন কী নেই! সবই পেয়েছি এখানে। তবুও যেন কী পাইনি! গগনচুম্বী প্রাসাদ, নয়নাভিরাম শহর, চোখ জুড়ানো বাগ-বাগিচা, নজর কাড়া প্রকৃতি, জনাকীর্ণ মহল্লা, রকমারী খাদ্যসম্ভার, নানান রংয়ের পোশাক, সভ্যতার দহরম মহরম। কি নেই এখানে! সবই আছে। নেই শুধু পুণ্যবান মানুষ। আছে শুধু মানবরূপী কিছু জীবন্ত কংকাল, আদৌ যাকে মানুষ বলা যায় না। অন্য এক স্থানে তিনি এ কথাকে রূপ দিয়েছেন এভাবে ঃ

این نہ مرنند اینہاں صورت اند

مردہ نانند و گشتہ شہوت اند ۔

তোমরা যাকে মানুষ ভাবছ, ওরা আসলে মানুষ নয়। ওরা পেটপূজারী, জৈবিক চাহিদাসর্বস্ব প্রাণী বিশেষ।

অগণিত মেশিনারীতে সয়লাব

নাতিদীর্ঘ সফরে আমেরিকার পর্যটন কেন্দ্রগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনটাই বাদ রাখা হয়নি। আমি দেখেছি, মেশিনারী পদার্থের বিপুল সমাহার। দেখেছি গাণিতিক, শৈল্পিক, কলা-কুশলীর ছাপ, দেখেছি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পাশ্চাত্য আজ আহা

মরি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, মানবতাকে যা দেয়া দরকার, পৌঁছানো দরকার যতটুকু শান্তি-সুখ আর সংহতির, নিজকে উজাড় করে তার সবটুকুই সে দিয়েছে। কিন্তু জনাকীর্ণ এই শহরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এখানে প্রকৃত মানুষ ক'জনা যাদের অন্তঃকরণ মানবতার দরদে ব্যথাতুর, নির্মিলিত আঁখি অশ্রুসজল, উপেক্ষিত জনতার হৃত অধিকার আদায়ে যাদের মন জ্বালাপোড়া করে? যারা সত্য ন্যায়ের প্রতীক, সভ্যতা যার কথামত চলে, তিনি সভ্যতার কথামত চলেন না। সংস্কৃতির নরম তুলতুলে কোলে যিনি আপনাকে বিসর্জন দেননি, বরং সংস্কৃতিই তার কোলে মাথা গুঁজেছে। জীবন চালনার লাগাম যার হাতে, আনাড়ী লাগাম-তাড়িত নন যিনি। এরকম ক'জন মিলবে এখানে? মিলবে কি কোটি মানুষের ভীড়ে দু'চারজন?

এ রকম ক'জন মিলবে যারা আপনার সৃষ্টিকর্তাকে চেনেন, যাদের অন্তঃকরণ স্রষ্টার মুহাব্বতে পরিপূর্ণ? ইনসানিয়াতের দরদে ব্যাকুল? যাদের দৈনন্দিন জীবন সাদাসিধা? প্রভু প্রেমে গদগদ? মানবতার মায়ায় পেরেশান? জাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক নেতাদের একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দেন না। রাষ্ট্রের বিপদাপদ দেখলে যারা শিউরে ওঠেন? রাষ্ট্রের সঠিক উন্নয়ন-অগ্রগতি যার স্বপ্ন, নিঃস্বার্থ সেবা করতে যিনি আগ্রহী, যিনি কিছু দিতে হাতেমদিল, নিতে নারাজ? ত্যাগে অকুণ্ঠ, খরচ করতে মহৎ। দান-দক্ষিণায় যার হাত উত্থিত, আঁচল পেতে নেয়ার মত নন যিনি, মজলুম মানবতার চিন্তায় যার বিনিদ্র রজনী কাটে, দুনিয়া আনন্দময় যার যা মনে লয়ে'র মত নন যিনি? নিরন্নকে অন্ন দানে যিনি তৃপ্তিবোধ করেন, হারানোতে প্রাপ্তি, লিপ্সা-মোহে মোহাচ্ছন্ন নন যিনি, গোটা বিশ্বকে এক ও অভিন্ন দেখতে চান যিনি? জীবনে উত্থান-পতন সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে, কোন মহান সত্তার সকাশে জবাবদিহি করতে হবে–এ বিশ্বাস রাখেন যিনি, যিনি মনে করেন, চতুষ্পদ জন্তুর মত খেয়েদেয়ে বিলীন হয়ে যাবার মত নই আমি। দু'দিনের খেলাঘরের খেলা শেষ হলে আমাকে দাঁড়াতে হবে কোন সত্তার সামনে, যে নীড়ে এতদিন থেকেছি, কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব দিতে হবে তার, যে অবিনশ্বর সত্তা নির্জীব মাটির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছেন, বানিয়েছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি, বিছিয়ে দিয়েছেন চাটাইবৎ পাটি, মাথার ওপরে ছাদস্বরূপ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সুবিশাল আকাশ, যিনি আমাদের সৌর রশ্মি দান করেছেন, মেধাবলে চাঁদের বুকে পা এঁকে দেয়ার শক্তি দিয়েছেন, যারা একথা উপলব্ধি করেন, গোটা জড় জগৎকে আমাদের খাদেম করে দেয়া হয়েছে? কিন্তু কেন? এ কেনটির উত্তর যিনি সংগ্রহ করতে পারেন, এমন মানুষ আছে কি এদেশে?

সত্যি বলতে কি, জড় পদার্থ আর বস্তুর গোলামী মানবতার প্রকৃত উৎকর্ষ নয়। প্রকৃত উৎকর্ষ হচ্ছে পদার্থকে নিজের গোলাম বানানোর মধ্যে।

পিঞ্জিরাবদ্ধ কয়েদী

যে ব্যক্তি জমিনে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করতে চান, প্রতিষ্ঠিত করতে চান একচ্ছত্র কর্তৃত্ব গোটা জগতের সামনে যিনি নিজকে মোড়ল প্রমাণ করতে চান না, এমন কি দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র কিংবা পার্টিকে কোন পরাশক্তির লেজুড় বানাতে যিনি নাখোশ। আওয়ামকে আত্মার গোলামী, কু-প্রবৃত্তির গোলামী, ধন-দৌলত ও পুঁজিবাদের গোলামী থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে চান. প্রকৃত মানুষ তিনি না হলে হবেন কে?

আরবের জনৈক বুদ্দু, ঐশী বল যাকে নির্ভীক বানিয়েছিল, সে বলিষ্ঠ দৃপ্ত কণ্ঠে ইরানের সিপাহসালার রুস্তমকে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ

ان ابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى وسعتها ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের গোলামী থেকে মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার সবক দিতে তোমাদের কাছে আমাদের প্রেরণ করেছেন।"

যে রুস্তমের নাম শুনলে সৈন্যদের পিলে চমকে উঠত। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত কণ্ঠতালু, তার সামনে দাঁড়িয়ে এ ধরনের বিস্ময়কর উক্তি চাট্টিখানি কথা নয়! ঐ বুদ্দুর কথায় সেদিন সাসানী সাম্রাজ্যের ভিতে কাঁপন ধরেছিল।

সে রুস্তমকে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ সাম্রাজ্যের নামে তোমরা মানবতাকে গোলাম করে রেখেছ, ইসলাম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে এসেছে সেই নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। সাসানী রাজত্বের ছদ্মাবরণে রাজতন্ত্রের যে ন্যক্কারজনক অধ্যায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়েছ তোমরা, ইসলাম এসেছে সেই বংশগত সংকীর্ণতাকে মিসমার করে তার ওপর হকের পতাকা উড্ডীন করতে। আমরা এসেছি তোমাদের পাশবিক আচার-আচরণের সৌধচূড়া ভেঙ্গে সেখানে আরব্য উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে। হে হতভাগ্য ইরানীরা! তোমরা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির ন্যায় লৌহ খাঁচায় আটকে আছ। তোমরা হাসি ও ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্ন। আল্লাহর নেয়ামতকে ঢালাওভাবে ভোগ করছ। তোমরা অভ্যাসের দাস। বিলাসবহুল কৌতুকসামগ্রী আঞ্জামকারীদের দাস। চাকর-চাকরানীর দাস। বাবুর্চিদের দাস। পক্ষান্তরে আমরা শুধু আল্লাহর দাস। তোমরা এমন অসংখ্য যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। নিষ্প্রাণ পাথরকে বসিয়েছ আল্লাহর আসনে। আমরা এসেছি সেই দেবতার উপাসনা থেকে তোমাদের মুক্তি দিতে। তোমাদের

চরিত্রহীনতার হিসেব কষবে কোন্ যন্ত্র? বস্তুর মায়া তোমাদের অন্তরে সুসংহত। ইসলাম ছাড়া তোমাদের মুক্তি নেই। যে জাতি গোলামী জিন্দেগীকে প্রাধান্য দেয়, তাদের দুর্গতি রুখতে হেজাজের কাফেলা ছুটে এসেছে ইরানের ভূমিতে। এর ছায়াতলে থেকে তোমরা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, পাবে স্বস্তি। এই আমাদের আশা, প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার।

আলো একটি, অন্ধকার অনেক

মুক্তির পথ একটি। গোলামীর পথ অসংখ্য-অগণিত। নূর বা আলো একটি, অন্ধকার অনেক। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন, কুরআনুল করীমে যেখানেই নূরের আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে!

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور -

"আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেন।"

আরবী ব্যাকরণে কি নূরের বহুবচন হয় না? কুরআনের আলোচনার আঁচল আদপেই কি সংকুচিত? আসল কথা হচ্ছে নূর একটাই। পক্ষান্তরে অন্ধকার অগণিত। নূরের স্রোতধারা একটি। সেটি হচ্ছে, আল্লাহর মারেফাত। এখান থেকে নূরের সংযোগ না হলে হেদায়েতের আশা কল্পনাতীত। প্রতীচ্যের এ দেশ সফর করে আল্লামা ইকবালের ক'চরণ মনে পড়ছে। ইকবাল এদেশে কোনদিন পদধূলি দেননি। কিন্তু পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার উপলব্ধি আমার আপনার চেয়ে তাঁর অনেক বেশী ছিল। শুনুন ইকবালের কণ্ঠে :

یورپ میں بہت روشنی علم هنر هے
سچ یه هے که بے چشمه حیات هے یه ظلمات -

"পাশ্চাত্য এমন এক সমুদ্রের নাম যেখানে আবে হায়াতে'র কোন অস্তিত্ব নেই।"

লোকমুখে একটি প্রবাদ আছে, অন্ধকার সমুদ্রে 'আবে হায়াত' (জীবন সঞ্জীবনী পানি) পাওয়া যায়। কথিত আছে, সেকেন্দার রুমি হযরত খিজির (আ.)-এর কাছে হার মেনে বললেন, না! আমি পারলাম না আপনাকে গন্তব্যে পৌছতে। এটাকেই ইকবাল মরহুম তাঁর কলমে প্রকাশ করেছেন : এ জগৎ অন্ধকার জগৎ। এখানে প্রকৃত মানুষ নেই বললেও চলে। যে জাতি ঐশী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, যাদের হাত থেকে ছুটে যায় নবুওয়াতী ছোঁয়া, সসীম

জ্ঞানের ওপর যারা ভর করে থাকে, বস্তুবাদের ওপর যাদের দিনরাত্রির মেহনত উৎসর্গীকৃত, লোহালক্কর আর কলকজার উন্নতি যাদের স্বপ্ন, আত্মশুদ্ধির স্থলে যারা বস্তুর ওপর মেহনত করছে, তাদের পরিণতি এমনই হয়! বস্তুর কাছে যারা নতজানু, আত্মার কাছে যারা নতশির, তাদের দ্বারা কিইবা আশা করা যায়! পাশ্চাত্যের ভোগবাদীরা বস্তুগত উৎকর্ষকেই পার্থিব জীবনের একমাত্র ব্রত বানিয়েছে। নিয়তির অমোঘ নীতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে–যে কেউ যা করতে চায় তিনি তাকে তা করতে মদদ করেন। যিনি জীবন কালকে যে ধাঁচে পরিবর্তন করতে চান, কুদরত তাকে সেভাবে সাহায্য করে। এক্ষণে জগৎ মাঝে যা কিছু হচ্ছে, তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর কুদরত-ই মদদ জোগাচ্ছে।

খ্রীস্টবাদ ইউরোপে বেমানান

আপনার যারা পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও এখানকার তামাদ্দুনগত উন্নয়ন-অগ্রগতির ওপর গবেষণা করেন, যারা ড্রিপর প্রণীত 'ধর্ম ও বিজ্ঞানে সংঘাত' নামক পুস্তকখানা পড়েছেন, যারা রাষ্ট্র ও গীর্জার দ্বন্দ্ব, ধর্ম ও বিজ্ঞানের রক্তক্ষয়ী উপাখ্যান সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তারা জানেন, গীর্জার পোপ-পাদ্রীগণ খ্রীস্টবাদকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত করে খ্রীস্টের বাণী গোটা বিশ্বে পৌছে দিয়েছেন। খ্রীস্টের আদর্শগত বাণীর মোহে ইউরোপবাসী আজ মোহাচ্ছন্ন! অথচ ঐ সব পোপ-পাদ্রীগণই ধর্মভিত্তিক জীবন যাপন না করে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার পিছু নিয়েছেন। গীর্জায় আজ ধর্মের ঠাঁই নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ফায়দা লুফে নিয়ে এদ্বারা জীবন গঠনের সুযোগ অন্তত আজ খ্রীস্ট ধর্মে নেই। এ ধর্ম ইউরোপবাসীদের ক্রমশ পিছে টানছে। গোটা ইউরোপবাসী একদিন হতাশার নিঃসীম আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ধর্ম চাচ্ছিল তাদের আশার প্রদীপে তেল সঞ্চার করতে। কুদরতের স্নেহার্দ্র ছোঁয়া ওদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সভ্যতার দাবীদার ইউরোপবাসীদের মধ্যে যখন নৈতিক এ হারজিতের খেলা চলে আসছিল, ধর্ম এসে ঠিক এ সময় তাদের মাঝখানে দাঁড়াল। শেখাল সভ্যতার সবক। কিন্তু ধর্ম আর গীর্জার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ওরা বস্তুবাদের পেছনে লেগে গেল। ওদের শিরা-উপশিরায় বস্তুর মায়া জেঁকে বলল। বস্তুকে ওরা জীবন-মরণের মূল হাতিয়ার বানাল। ফলে যা হবার তা হলো। মানবতার সু-উচ্চ আসন থেকে ওরা পশুত্বের অতল তলে নামল।

শিল্প বিপ্লব দ্বারা ইউরোপ ভূমিতে ওরা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করল, যেখানে বাইবেল আর গীর্জার কাছে ধরনা দিতে না হয়, বাছ-বিচার করতে না হয় কোনটা জায়েজ আর কোনটা না-জায়েজ? সত্যি বলতে কি, এটা মানবতার বিপর্যয় খ্রীস্টবাদের বিপর্যয়।

যিনি ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ইউরোপবাসীদের নগ্নতার দিকে কোন্ ধর্ম টানছে? উত্তরে তাকে বলতে হবে, খ্রীস্টবাদ ছাড়া আবার কে! পক্ষান্তরে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ইউরোপবাসীদের অতৃপ্ত মন-মগজকে তৃপ্ত করতে, সঠিক পথের দিশা দিতে, সত্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে, চাওয়া-পাওয়াকে সুষ্ঠ সুন্দর করতে, হেঁয়ালী জীবন থেকে প্রকৃষ্ট জীবন বিধান দিতে, মানবতাকে এক নব জীবন দান করতে কোন্ ধর্ম ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে? বিবেকবান ব্যক্তির জন্য 'ইসলাম' জওয়াব দেয়া ছাড়া গত্যন্তর আছে কি?

খ্রীস্টীয় বিশ্বাসে মানুষ রাশি রাশি পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। জন্মের সূচনা থেকেই সে এক ভারবাহী বোঝা বইতে থাকে। এর চাপে কোমর ন্যুব্জ হয়ে আসে তার। একজন নিরঙ্কুশ খ্রীস্টান হিসেবে 'জন্মগত পাপী' বিশ্বাস রাখা ফরয। যে ব্যক্তি গোনাহর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, জন্মগতভাবে চাপিয়ে দেয়া গোনাহর কারণে যে লজ্জিত, পৃথিবীর সম্মুখে সে কি করে মুখ দেখাবে? ধর্মীয় উদারতা তার পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব কি? সাগরের বুক চিরে কি করে সে মুক্তো আহরণ করবে? মহাকাশ বিজয় করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সে যেতে পারবে কি?

জন্মগত পাপের লজ্জায় সে এক অবাঞ্ছিত কাফ্ফারার সম্মুখীন হলে এই পীড়া তাকে আজীবন কুঁরে কুঁরে খাবে। জীবন নাটকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে একবুক জ্বালা নিয়ে তার পক্ষে বাকি অংকগুলো মঞ্চায়ন করা সম্ভবপর হতে পারে কি? এ রকম তালগোল পাকানো বৈসাদৃশ্যের ধর্ম পৃথিবীতে আর আছে কি-না কে জানে? ইউরোপের অবস্থা ঠিক ঐ গাড়ির মত, দু'টি ঘোড়া যাকে সামনে-পিছে থেকে টানছে। এ দেশের মানুষ যখন যান্ত্রিক প্রযুক্তিতে আহা মরি পর্যায়ে পৌঁছল, ঠিক সেই মুহূর্তে খ্রীস্টবাদের পাগলা ঘোড়া এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়াল। একদিকে বিজ্ঞান তাদেরকে প্রগতির সবক দিচ্ছিল, অপরদিকে 'তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে গীর্জা তাদেরকে বৈরাগ্যবাদের তালিম দিতে লাগল। বিজ্ঞান আর গীর্জার রশি টানাটানিতে অসহায় ইউরোপবাসীর জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে এল। ওরা দেখল-গীর্জাকে জীবন থেকে বিদায় করে না দিলে প্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন তো সম্ভব নয়। এসো! সকলে জোট বেঁধে জীবন মঞ্চ থেকে গীর্জাকে বিদায় (Good Bye) জানাই। শুরু হলো ওদের ধর্মমুক্ত জীবন। শুরু হলো এখান থেকে অধঃপতন।

দার্শনিক 'লেকে'র 'আখলাকে ইউরোপ' পুস্তকখানা উল্টিয়ে দেখুন! সেখানে লেখা আছে-অধুনা ইউরোপবাসী নারীদের থেকে বিমুখ থাকে, এমন কি গর্ভধারিণী মায়ের সাথে পর্যন্ত দেখা করতে ওদের বিবেকে বাঁধে। সন্তানের মায়ায় দূরপাল্লার পথ পাড়ি দিয়ে মা যখন তার সন্তানকে দেখতে আসেন, তখন সন্তান তাকে দেখে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, যেমনটি করে শয়তান আজান শুনলে।

ইউরোপবাসী গীর্জাবিমুখ হবার দরুন তারা যেমন অধঃপতনের শিকার হয়েছে, ঠিক এমনটির-ই শিকার হয়েছিল মুসলিম জাতি যখন তারা ইসলামকে তাদের জীবন থেকে বিদায় দিয়েছিল।

মেশিনের গোলামী

আধুনিক আমেরিকা মেশিনের গোলামে পরিণত হয়েছে। আমেরিকা আজ তামাম দুনিয়ার মোড়ল সেজেছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গোটা বিশ্বের ওপর আমেরিকার বলয় কোন না কোনভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। কোন দেশই এ ধারা থেকে বিয়োজ্য নয়। ইসলামী-অনৈসলামী বিশ্ব কোন না কোনভাবে আমেরিকার মায়াজালে আটকা পড়ে অসহায় ঘুঘুর মত ছটফট করছে। আমাদের সংসদ, আমাদের ক্যান্ডিডেট, টাকা-পয়সা সবই আমাদের, কিন্তু গ্রীনরুমে বসে সুতা টানে আমেরিকা। এই বিশ্ব বসের রিমোট কন্ট্রোলে সারা দুনিয়া পরিচালিত হচ্ছে। এর বোতাম চালনে গোটা বিশ্ব ওঠা-বসা করে। পক্ষান্তরে আমেরিকা কার কথায় ওঠাবসা করে? সত্যি বলতে কি, আমেরিকা কিন্তু মেশিনের গোলাম হয়েছে। বস্তুবাদের গোলামীকে বরণ করেছে। শুধু কি তাই? ওরা বিলাসী জিন্দেগীর গোলাম। ফ্রি সেক্সের গোলাম। যেমন খুশী তেমন উচ্ছৃঙ্খল জীবনের গোলাম। লোহা-লক্করের টরেটক্কা ছাড়া ওদের ঘুম আসে না। এগুলোর ওপর রিসার্চ-স্টাডি করতে করতে ওদের মাথার চুল পড়ে গেছে। আজ যে জিনিসটির অভাব আমেরিকার সমাজে অনুভূত হচ্ছে, তা হলো একজন খাঁটি মানুষ যার অন্তরটা নির্মল নিষ্কলুষ। মেশিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওরা সাক্ষাৎ এক একটা মেশিনে পরিণত হয়েছে। ওদের উপলব্ধি পর্যন্ত মেশিন হয়ে গেছে। মায়া-মমতা বলতে ওদের অন্তরে কিছুই নেই। ধর্মের নাম শুনলে তাই ওরা নাকে কানে তেল তুলো দেয়। এটাই হলো আমার আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা।

আত্মপক্ষ সমর্থন অনুচিত

আমেরিকা ত্যাগের কালে নিজকে লক্ষ্য করে বলতে চাই, হে মুসাফির! তুমি এ পাপময় জগতের জৌলুসে প্রভাবিত হয়ো না। তুমি নবুওয়তী বৃক্ষের ফসল। আপনাদের উদ্দেশে বলতে চাই, নিছক শৌখিন ভরে বাস করেছেন–আপত্তি নেই। কিন্তু বস্তুবাদের পূজারী হবেন না। আপনারা এই অসভ্য সংস্কৃতির শেখানো বুলি আওড়াবেন না। নিজের জীবন-বিধান, লোক-লৌকিকতাকে তুচ্ছ নযরে দেখবেন না। ওদেরকে মানুষ আর আপনাকে পরও ভাববেন না। কে বলেছে, ওরাই মানুষ? প্রকৃত মানুষ তো আপনারা। রাত্রিকে দিনে পরিণত করার যে আলোকসজ্জা দেখছেন, এটা বাস্তবিক আলো

নয়। বাস্তবসম্মত আলো হচ্ছে রহমতের আলো। হেদায়েতের আলো। এই আলো আমেরিকায় জ্বলে না। এই আলো থেকে আমেরিকা বঞ্চিত। ইকবাল কত সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ

تاریك هے افرنگ مشینوں کے دھوائے سے
یه وادی ایمن نهیں شیان تجلی -

"মেশিনের কালো ধোঁয়ায় চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন। এ উপত্যকায় তাই কোন নিরাপত্তা নেই, নেই কোন আলোর ঝলকানি।"

স্বহস্তে গড়া মূর্তিপূজারী

এরা আপনার অভ্যাসের গোলাম। স্বহস্তে গড়া মেশিনারী গোলাম। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সমকালীন মূর্তি পূজারীদের লক্ষ্য করে বললেন, একি তামাশা করছ তোমরা? আজ যা নিজ হাতে গড়ছ, কাল তার পদতলে মাথা ঠুকছ? ঠিক এ অবস্থাই দাঁড়িয়েছে আমেরিকাবাসীদের জীবনে। আজ একটি উপাদান আবিষ্কার হচ্ছে, একটি মেশিনের অভ্যুদয় ঘটছে, কালকেই গোটা জাতি ঐ মেশিনের গোলাম হয়ে যাচ্ছে। একেই বলে স্বহস্তে গড়া মূর্তিপূজারী।

আযর ঘরে ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রতিনিধি

এ দেশটি একটি বিশাল আযর ঘর। সুধীমণ্ডলি! এখানে ইব্রাহীমী আযানের প্রয়োজন আছে। আপনারা শোনাতে পারেন সে আযান। আপনারা ইব্রাহীম (আ.)-এর যোগ্য উত্তরসুরি, ইহুদী খ্রীস্টানরা নয়। কারণ ওরা ইব্রাহীমী রাস্তা থেকে বিচ্যুত। ইব্রাহীম (আ.)-এর স্মৃতিচারণ ওদের মুখে শোভা পায় না। ওরা মিল্লাতে ইব্রাহীমী থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে, এমন কি ওদের নবী ঈসা (আ.)-এর প্রদর্শিত পথেও নেই ওরা। ওরা আছে সেন্ট পলের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ খ্রীস্টবাদের ওপর। মূল ধর্ম-দীক্ষা হতে ওরা আজ দূর–সুদূরে। এটা আসলে এক গভীর ষড়যন্ত্রের দরুন হয়েছে। সম্ভবত ধর্মীয় সাজশের মধ্যে এই সাজশই সবচে' বেশী কার্যকরী হয়েছে। সেন্ট পল সফল হয়েছেন ঈসায়ী ধর্মের বিকৃতি সাধনে। অধুনা কেউ ক্যাথলিক হোক কিংবা প্রোটেস্ট্যান্ট, সকলেই সেন্ট পলের অনুসারী। তিনি যে নয়া খ্রীস্টবাদের উদ্গাতা-বর্তমান সকলেই তার গোলাম। এজন্য ওরা ইব্রাহীমের যোগ্য অনুসারী নয়। ইকবালের কণ্ঠ এখানে এসে প্রতিবাদদীপ্ত হয়েছে ঃ

'তুমি হেরেমের মিস্ত্রী, তোমাকে নয়া দুনিয়া গড়তে হবে। শুধু হেরেমের মিস্ত্রী নতুন দুনিয়া গড়ার অধিকার রাখে। জগতে আনাড়ী মিস্ত্রী বহু পাওয়া যাবে। বস্তুত এরা ইমারত গড়তে নয়, ভাংতে পটু। তুমি যে পয়গামের বাহক,

যে আসমানী কিতাবের ধারক, যে নবীর উম্মত, সেই নবীর চিন্তাধারা হচ্ছে গোটা বিশ্বকে বস্তুবাদের পূজা থেকে মানুষকে এক আল্লাহর পূজায় নিয়ে আসা। এক্ষণে আমেরিকার নগ্ন তামাদ্দুন তোমার মাঝে জেঁকে বসতে পারে। তাই সাবধান থেকো।'

تبان رنگ و خون کو تُوڑکر ملت میں گم ہوجا
نہ تورانی رہی باقی نہ ایرانی نہ افغانی

'তাবানী রং ও খুনের নেশা পরিত্যাগ করে ধর্মপাশে আবদ্ধ হও,
না তুরানী, না ইরানী, না আফগানী (বরং তুমি মুসলিম)।'

তুমি মিসরী বা সিরীয় নও। তুমি একজন মুসলমান। তুমি মুসলিম উম্মাহ। উম্মতে মুহাম্মদী, উম্মতে ইব্রাহীমী। তুমি আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন জাতির সন্তান। অটোমোবাইলের দোকানে পার্টস ফিটিংয়ের তুচ্ছ কাজে নিজেকে লিপ্ত করো না। তুমি পেটপূজারী নও। তুমি মজলুম মানবতাকে পয়গামে হক শোনাবে। অলসতার ঘোরে নিমগ্ন জাতির ঘুম ভাঙ্গাবে। ওদের সিল-আঁটা কানে ঝংকার তুলে বলবে ঃ

"তোমরা জীবনের ভুল রাস্তায় বিচরণ করছ। জীবনের কোন্ আস্বাদনটা তোমরা পেয়েছ? তোমাদের জীবন উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত; নীড়হারা পাখির মত তোমাদের বিচরণ। চল 'যেদিকে মন চায় সেদিকে'। এটা আত্মহত্যা ছাড়া কিছু নয়। সত্য সুন্দর পথ হতে তোমরা পদস্খলিত। হিন্দু যোগীদের মত লাগামহীন এ জীবন ছাড়ো! বৈরাগ্যবাদে শান্তি নেই।"

আপনি কখনো এলাহাবাদের কুম্ভ মেলায় এলে দেখতে পাবেন, এখানকার শিক্ষিত লোকজন আমেরিকার হায়েনাদের মত বিচরণ করছে। হাঁটু গেড়ে বসছে সাধু-পুরোহিতদের সামনে। হয়ে পড়ছে মন্ত্রমুগ্ধ। ঠিক যেন জিনে ধরা রোগী এক একজন! সংস্কৃতির শরাব পানে ওরা বুঁদ হয়ে আছে। পাশবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন, কুদরতী অনুদানের অস্বীকার, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছেদন ও সত্য সুন্দর জীবন হতে পশ্চাৎগামী হয়ে ওরা স্বস্তির ঢেঁকুর তুলছে। হায়! ইসলামী চিন্তাবিদগণ যদি ওদের সৎ পথে আনয়নের সদিচ্ছা পোষণ করতেন! মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ এগিয়ে আসতেন! আহা! তারা যদি পথহারা আমেরিকাবাসীদের পথ নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমেরিকাকে আজ এ নাযুক পরিস্থিতির শিকার হতে হতো না।

হায়রে কপাল! ইসলামী সাম্রাজ্যের কুলীন রাজা-বাদশাহগণ কেউই ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পান না। পারেন না ওদের বিবেকের রুদ্ধ কপাটে আঘাত করতে। শুধু সমালোচনাই করেন তারা।

পাশ্চাত্যের পর্যটকরা নেপালের নৈসর্গিক পর্বতশৃঙ্গে এসে মদ গিলে মাতাল হয়ে থাকে। মুসলমান জাতি একটু সচেতন হলে ওদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। সচেতন অলী-আউলিয়াদের এদিকটির প্রতি লক্ষ্য দেয়া ঠিক নয় কি? পৃথিবীর এই প্রান্তে বসবাসরত পথহারা জাতির কানে আজ ঢুকিয়ে দেয়া প্রয়োজন ঃ

الا بذكر الله تطمئن القلوب -

"প্রকৃত স্বস্তি আল্লাহর জিকিরের মাঝেই নিহিত।" এসব ধর্মীয় কথা শোনানোর জিম্মাদারী ছিল মুসলিমদের। কিন্তু কোথা সে মুসলমান? মুসলিম বিশ্বে এমন কোন দেশ আছে কি, যে আমেরিকানদের কানে এ কথার ঝংকার তুলবে?

খোদ মুসলিম জাতির-ই এর প্রতি নিরঙ্কুশ বিশ্বাস নেই। কি করে তারা অন্যকে এর সবক দেবে? নামায ও তার ঐশী ছোঁয়ায় যাদের আকীদা দোদুল্যমান, কালেমার সততায় যারা সন্দিহান, তাকদীর যাদের কাছে হাস্যস্পদ, আমেরিকাকে যারা রুটি-রুজির স্বর্গরাজ্য মনে করে, কল-কারখানাকে যারা খাদ্য দেবতা ভাবেন, তারা কি করে অন্যকে তৌহিদের মর্মবাণী শোনাবে? কোন্ মুখে তারা বলবে ঃ

لا رازق الا الله "অন্নদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই"

সুধীমণ্ডলি! আপনারা আপনাদের ঈমান-আমলকে মযবুত করুন। নামাযের পাবন্দি করুন। কিছুক্ষণ মুরাকাবায় বসে আল্লাহকে স্মরণ করুন। তারপর জ্বালিয়ে দিন মেশিনের ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন মানবের আলোহীন হৃদয়ে প্রভুপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা। পুড়িয়ে ছাই করে দিন শয়তানী রূহ! স্থির করুন আপনার জীবনের লক্ষ্য। কুরআনের গবেষণা করুন। সীরাতুন্নবী (সা.) পড়ুন। গড়ে তুলুন এর আলোকে আপনার জীবন। সচেষ্ট হোন অন্যের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে। এরপর পৌছে দিন আমেরিকাবাসীদের মনে সত্য সুন্দর চিরন্তন ধর্মের পয়গাম।

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম

ইসলাম সত্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম বাস্তবের মুখোমুখী। বাস্তবকে গলা টিপে মারার মত নয় এ ধর্ম। ইসলামের অজেয় শিক্ষা অনস্বীকার্য। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فطرت الله التى فطر الناس عليها -

আল্লাহ্ তা'আলা সত্য-স্বাভাবিক ধর্মের ওপর মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সাদাসিধে করে বানিয়েছেন। নিষ্পাপ প্রবৃত্তি দিয়েছেন, কল্যাণমুখী করেছেন, আমরাই সেই কল্যাণের দরজা নিজ হাতে

বন্ধ করেছি। মানুষ জন্মগতভাবেই নেককার ও হকপন্থী। তাকে সত্যের পয়গাম দিলে সে সহজেই গ্রহণ করবে। এজন্য আপনাকে চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। তনু-মন দু'টোই ব্যয় করতে হবে। এরপর দাওয়াত দিতে হবে। তুমি উম্মতের দাঈ (দিশারী), উম্মতে রেসালাত, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে বদ্ধপরিকর। জাতির কর্ণধার। জাতির সুখ-দুঃখের সাথী। তুমি ভোগবাদী হয়ো না। হয়ো না খেয়ে দেয়ে পেট ভরা অধিক প্রজননশীল প্রাণী।

উদাত্ত আহ্বান

আমরা মনের কথাগুলো আপনাদের জানিয়ে দিলাম। আমেরিকায় সব কিছু দেখলাম, কিন্তু খুঁজে পেলাম না মনের মত একজন মানুষ। প্রকৃত মানুষ দেখলে আপনাদের দেখেছি। আমেরিকা আর আমেরিকাবাসীদের সম্পর্কে আমি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নই। পোস্টার আর টিভির মিনি পর্দায় তাদের দেখেছি। রেডিওর ইথার তরঙ্গে তাদের লোক-লৌকিকতা, জীবনকাল ধারণ করেছি। তাই বলতে গেলে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় এরা। সত্যি বলতে কি, মানব জাতি আল্লাহ্র খলীফা। এদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টির সেরা করেছেন। তামাম দুনিয়ার উৎকর্ষ আর প্রগতি আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে তুচ্ছ।

সেই মহাপ্রাণ মানবের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান! মানবতাকে জাগিয়ে তুলুন, তাহলে আপনার প্রবাস সঠিক ও যথার্থ হবে। আপনার প্রবাস ইবাদত হবে। হবে দাঈ ও মুবাল্লিগের জীবন। আমার আশংকা হয়, আপনার সন্তানকে যদি দ্বীনী তালিম দিতে না পারেন, দিতে না পারেন ঈমান ইসলামের শিক্ষা, তবে এ প্রবাস আপনার জন্য গোনাহের কারণ হবে। নিপতিত হবেন আপনি গভীর সমস্যার আবর্তে।

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْأَرْضِ ۚ قَالُوْٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ـ

"জালেমদের রূহ্ কজাকালে ফেরেশ্তাগণ তাদের বলেন, তোমাদের হলো কি? তারা বলে, আমাদের কি করার ছিল? এ রাজ্যে আমাদের কোন শক্তি ছিল না। ফেরেশ্তাগণ বলবেন ঃ আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না? অন্য রাজ্যে হিজরত করতে পারলে না?" (সূরা নিসা আয়াত-৯৭)

এমন স্থানে আমাদের বসবাস করা দরকার যেখানে মানব জাতি স্ববৈশিষ্ট্যে থাকতে পারে। আদায় করতে পারে ইবাদাত। আমেরিকার পরিবেশ অনুকূল না হলে মনে করবেন এখানে আপনার থাকা চলবে না। থাকতে হলে মাথা উঁচু করে

থাকতে হবে। একজন মর্দে মুমিন হিসেবে বাস করতে হবে। পরিবেশ সৃষ্টি করে হালচাল ইসলামী ভাবধারা মোতাবেক চালাতে হবে। বাচ্চাদের সহীহ্ তালীম দিতে হবে। হযরত ইয়াকুব (আ.) সন্তানদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى ط قالوا نعبد الهك و اله اباءك ابراهيم و اسمعيل -

হযরত ইয়াকুব (আ.) ইহধাম ত্যাগের পূর্বে ছেলে-সন্তান ও নাতি-পুতিদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কলিজার টুকরা সন্তানগণ! মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চিত হতে চাই! আমার তিরোধানের পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা বললেনঃ আমরা আপনার ও পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম-ইসমাঈলের আল্লাহর ইবাদত করব। ইয়কুব (আ.) নিশ্চিত হলেন। অতঃপর চোখ বুজলেন।

এমনিভাবে আমাদেরও জানতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে, সন্তানরা আমাদের মৃত্যুর পর ইসলামের ওপর থাকবে কি না। ওদের ইসলাম ইনজেকশনের ওপর সন্দিহান হলে আপনাদের এ প্রবাস কতটা যুক্তিযুক্ত, ভেবে দেখবেন আশা করি।

মুসলিম হয়ে এখানে থাকতে পারেন

আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে এম. এস.-আই. এর সেবামূলক কার্যক্রমকে স্মরণ করছি। তারা আমেরিকা সমাজে দ্বীনের কতটুকু খেদমতের আঞ্জাম দিচ্ছেন, তার পুরোপুরি বিবরণ এখন যদিও আমার কাছে নেই, তথাপিও সম্যক যা দেখলাম, তাতে অন্তর থেকে দু'আ আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শ্রম-সাধনা কবুল করুন! বাড়িয়ে দিন তাদের মর্যাদা! তবে আপনারা সর্বদা একটি কথা খেয়াল রাখবেন, আমেরিকায় থাকতে হলে মুসলিম হিসেবেই থাকতে হবে। মোম আর তুষারের মত বিগলিত হওয়া যাবে না।

নগ্ন সভ্যতার সেবাদাস হওয়া যাবে না। হলে, যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে চলে যাওয়াই শ্রেয়। স্বদেশে আয়-রোজগার এখানকার চেয়ে কম হলেও ইসলামী জিন্দেগী যাপন করে ওখানে মরা ভাল। আপনি এদেশে থাকবেন। দ্বীনী দায়িত্ব পালন করবেন। আপনার দ্বারা বিদূরীত হবে এক আলোর ঝলকানি যদ্দারা পথহারা আমেরিকাবাসী খুঁজে পাবে ইসলামের সুমহান রাস্তা।

এ দেশ ও জনগণের জন্য প্রয়োজন আসমানী শিক্ষার

[১৯৭৭ সালের ২৫ শে জুন ইসলামিক সেন্টার ওয়াশিংটন কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ। অনুষ্ঠানের এন্তেজামিয়া কমিটি প্রধান মাজহার হুসাইন পরিচয়পর্ব সম্পাদন করেন। উক্ত কনফারেন্সে ভারত, পাকিস্তান, আরবের শিক্ষানবীশ ও মডেল সিটি ওয়াশিংটনে বসবাসরত মুসলিম নর-নারীরা উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে জনৈক মিশরী ক্বারী সূরা কাহাফের ঃ

و اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين .

আপনি তাদের কাছে দু' ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করুন। আমি তাদের একজনকে দু'টি বাগান দিয়েছি।

এই রুকু তেলাওয়াত করেন। বিদগ্ধ দার্শনিক নদভী সাহেব এই আয়াতগুলো তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।]

সমবেত ভাই-বন্ধুগণ!

আমেরিকার মডেল সিটি ওয়াশিংটনে আপনাদের লক্ষ্য করে কিছু বলতে পারায় নিজকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এই শহর পুরো দুনিয়ায় তাহজীব-তামাদ্দুন ও পরিপাটিতে গুরুত্ববহ মনে করে। এতদ্‌সত্ত্বেও আপনাদের ভালো লাগুক, চাই না লাগুক, আমি একটি ঘটনা শোনাচ্ছি।

এখানে কিসের অভাব

আমেরিকা এমন উন্নত হলো কিভাবে? আমেরিকাবাসীদের যোগ্যতা, অনুশীলন, নিয়মানুবর্তিতা, সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মেধাগত বিকাশ সাধন, একতা-সমঝোতা তাদেরকে এই ঈর্ষা করার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা-কৌশলে প্রাচ্যের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

জড়বাদী সভ্যতার বস্তুবাদী দর্শনে ধন্য আমেরিকাবাসীরা তাদের দেশকে দুনিয়ার স্বর্গ বানিয়েছে। আগাম মাফ চেয়ে নিচ্ছি একটি কথার জন্য, তা হলো, আপনাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছেন আমেরিকার জৌলুস দেখে নিশ্চয়ই। চুম্বক যেখানে থাক না কেন, লোহার অণু-পরমাণুকে সে আকর্ষণ করবেই, এতে বিচিত্রের কিছু নেই। পিপাসুরা সেখানেই ভীড় জমায় যেখানে ঝর্ণা আছে। আমি আমেরিকার নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এক সময় প্রত্যাবর্তন করব। এ দেশটি শুরু থেকে শেষ তক আমি সর্বস্থানে ইতোমধ্যেই গিয়েছি। কুরআন-হাদীস পড়ুয়া একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে মনে করতে পারেন আমার এই সফর। আমি দেখেছি আমেরিকায় অনেক কিছু আছে, তবে সব কিছু

নেই। সব কিছু যে নেই তা জানতে পারলাম ক্বারী সাহেবের পঠিত ক্বেরাত থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বারী সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যিনি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করলেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াতে আমাদের বাস্তব চক্ষু খুলে দিয়ে গেলেন, বিশেষ করে আমার বেশ উপকার করেছেন। চিন্তা করছিলাম কি বলব। বলার অনেক কিছু থাকলেও সব তো আর সবখানে বলা যায় না, বিশেষ করে আমেরিকার কেন্দ্রবিন্দুতে বসবাসরত মানুষদেরকে কিছু বলতে গেলে ভেবে-চিন্তে বলতে হয়। হঠাৎ করেই শ্রদ্ধেয় ক্বারী সাহেব আমার ভাবনা জাল ছিন্ন করতে সহায়ক হয়েছেন। মনে করলাম, আধুনিক সভ্যতার দাবীদার মার্কিনীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষা দিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ـ وَفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ـ وَ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ـ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ـ

"উভয় বাগানই ফল দান করে এবং তা থেকে হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল ঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।" [সূরা কাহাফ ঃ ৩৩-৩৪]

আমেরিকার সাথে এ আয়াতের মিল বেশ দেখা যায়। جَنَّتَيْنِ 'বাগান দু'টি' দ্বারা উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা অথবা পূর্ব-পশ্চিম আমেরিকা বুঝতে পারেন। جنتين من الاعناب এখানে কিসের অভাব? কোন্ ধরনের ফল এখানে দুষ্প্রাপ্য? কিসের শূন্যতা এখানে? আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত সব চেয়ে এখানে পরিদৃশ্যমান। এরপরও এখানে কিসের অভাব? সেই অভাব ও শূন্যতার দিকে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঈমানদার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

"যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই।" [কাহাফ ঃ ৩৯]

এখানে শুধু "মাশা-আল্লাহ্ লা কুওআতা ইল্লাবিল্লাহ"র অভাব। ماشاء الله। ঐ জিনিস যা মাটিকে স্বর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। মাশা-আল্লাহ সেই বাণী যা জড়বাদকে ইবাদত বানিয়ে দিতে পারে। এই 'মাশা-আল্লাহ'ই মানব প্রবৃত্তির দাম্ভিক ঘোড়াকে পরিচালনা করে অনুগত এক শান্ত সুন্দর বাহন বানিয়ে দিতে পারে। এই মাশা-আল্লাহই হলো চাবিকাঠি, যে তালার ওপর রাখুন না কেন একে, তালা খুলে দেবে। পাশ্চাত্য জগতে, জড়বাদী দুনিয়ায় যে জিনিসটির অভাব তা হচ্ছে ঐ মাশা-আল্লাহ। মাশা-আল্লাহ তো কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টির নাম কিন্তু জীবনে স্তরে স্তরে এস্তেমাল করছি আমরা। যেমন 'মাশা-আল্লাহ! এ বাড়ি কবে বানালেন? বাস্তবিকপক্ষে মাশা-আল্লাহ শব্দটিতে বেশ বালাগাত (বাগ্মিতা) রয়েছে, সারা দুনিয়া এর মাঝে ঢোকানো সম্ভব। এই মাশা-আল্লাহই জড়বাদ ও বস্তুবাদকে মদদ জোগাচ্ছে, এটাই মানব শক্তিকে পরিচালনা করছে। এই শক্তিকে বিলীন করার জন্য তার যে কেমন সুদূরপ্রসারী সু-কুদরত আছে তা আমাদের জানা নেই। তাই আমরা যত্রতত্র একে ব্যবহার করি। মাশা-আল্লার অর্থ হচ্ছে ঃ জগতে যা কিছু হচ্ছে তার সবই আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায়ই হচ্ছে, এতে মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই, নেই কোন পুণ্য।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তামাম সৃষ্টি জীবের পালনকর্তা।"

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন।" "হও" তখনই হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২]

সুতরাং মাশাআল্লাহ ছাড়া জগতে কোন কিছুই হয় না। আজ যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করে বলেন ঃ আমেরিকায় সব কিছুই আছে, কুদরতী খাজানা তাদের কাছে ভরপুর।

اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة -

"আমার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নেয়ামত তোমাদের ওপর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি" এই আয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হচ্ছে আমেরিকার ব্যাপারে।

ياتيها رزقها كل مكان -

এর সত্যায়ন হচ্ছে ওদের বেলায়। এই আমেরিকার উৎপাদিত খাদশস্য সব দেশই কম বেশী ভোগ করে। রুজির বৃষ্টি এদেশে মুষলধারে বর্ষিত হয়। পাল্টা প্রশ্ন করে যদি বলিঃ এত কিছু আছে আমেরিকায় মানলাম, এতদ্‌সত্ত্বেও তারা

নিরাপত্তা ও স্বস্তির গ্যারান্টি কেন দিতে পারছে না? দুনিয়াকে কেন সুপথ প্রাপ্তির দিশা দিতে পারছে না তারা? তারা কেবল জড়বাদের মদদ জোগাচ্ছে, জাগতিক জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করার তালিম দিচ্ছে, কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে ওদের কোন সমাধান জানা নেই।

আমেরিকার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই

আজ আমেরিকা সারা বিশ্বের সাহায্যকারী। অনেকে এদেশকে (নাউযুবিল্লাহ) খাদ্য দেবতা মনে করে, চলমান বিশ্বের অনেক দেশই আমেরিকার ডলার আশীর্বাদে জীবন অতিবাহিত করছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত বহু জাতি উন্নতির মুখ দেখছে ঐ আমেরিকা দ্বারা; প্রতিরক্ষা খাত, মেশিনারী, কলকব্জা থেকে ছোটখাট বস্তু আমেরিকা দিয়ে আসছে অনেকজনকে। এমনও দেশ বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে-আমেরিকার মিত্র হবার দরুন যারা শত্রু থেকে মুক্ত, এতদ্‌সত্ত্বেও কেউই আমেরিকার গুণ কীর্তন করছে না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই এদেশের সমালোচনা করছে। লিখে কাগজ ভরে ফেলছে আমেরিকাবিদ্বেষী হয়ে। খুঁজে পাওয়া যাবে না তাই এদেশের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি আজ ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস-এর ছায়াতলে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছি ঃ আমেরিকা! তোমার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই।

এ দেশের বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা কি ভেবে দেখেন, তাদের দেশ পানির মত ডলার খরচ করে পররাজ্যের শূন্য থলি ভরে দিচ্ছে। এদেশটি এত উদারচিত্ত ও রহমদিল হওয়া সত্ত্বেও কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না কেন? তাই বলা যায়, আমেরিকার কোন একনিষ্ঠ বন্ধু নেই। বিশ্ববাসী আমেরিকাকে দু'চোখে দেখতে পারছে না। কিন্তু কেন বিশ্ববাসীর এ অনীহা? হাতেম-হৃদয়ের অধিকারী মোড়লদের অনুদান তাদেরকে মুখলিছ দোস্ত হতে বাধা দিচ্ছে কে? এ প্রশ্নের জবাব আজ খোঁজবার প্রয়োজন। তবে কি আমেরিকা একনিষ্ঠতার সাথে সাহায্য করছে না? স্বার্থপরতার বেড়াজালে বন্দী হয়ে সাহায্য করছে কি?

আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেকশনে পড়াশুনা করছেন। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী। আপনারাই বলুন, এত দান-সদকা শেষে আমেরিকা বিশ্ববাসীর কাছে কি প্রতিদান পেয়েছে? আমেরিকা যদি কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তবে কেউ কি এগিয়ে আসবে তার সাহায্যার্থে? দু' ফোঁটা অশ্রু ফেলবে কি কেউ? আমার তো মনে হয় কেউ ফেলবে না। সকলেই অপেক্ষা করছে কবে আসবে আমেরিকার পতন।

নবী ও তাঁর অনুসারীগণ প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণ

নবীগণ মানবতার সাহায্য করেছেন, খেদমত করেছেন, দিয়েছেন জনগণকে খোদায়ী তোহ্ফা, ইখলাসের তোহ্ফা, দান এবং সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁরা। মানুষ মাত্র ভাই ভাই-এর সবক দিয়েছে তাঁরা; তাইতো জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকলেই তাঁদের গোলাম হয়ে গেছে। ঐ জাতি তাদের স্বধর্ম জাতীয় কালচার, হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে বিদায় জানিয়েছে। মিশরীয়, সিরীয়, ইরাকী জনতা আরবদের বশ্যতা জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করেছে, এমন কি এরা আরবদের ভাষা পর্যন্ত রপ্ত করেছিল। ইংরেজীর বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রাচ্য হয়ে আসছে। প্রাচ্যবাসীরা সাইনবোর্ড ইংরেজী লিখলেও কেউ কিন্তু আজতক আরবীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে বলে শোনা যায়নি। আরবী ভাষা নিপাত যাক বলে কেউ শ্লোগান দেয়নি, যেমনটি দিয়েছে ইংরেজীর বেলায়। বাস্তবিকপক্ষে আরবী ভাষাপ্রধান রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামী কালচার আরব্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহও হয়নি কখনও। কিন্তু দুনিয়ার কোণে কোণে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠছে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন পাশ্চাত্যের অপাংক্তেয় পুতিগন্ধময় সভ্যতাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে প্রাচ্যের সভ্যতা কিংবা স্বদেশীয় কালচার চালু করবে প্রাচ্যবাসী।

আমেরিকা সঠিক আসমানী ধর্ম থেকে বঞ্চিত

আমেরিকায় সব কিছু আছে কিন্তু আসমানী কিতাব ও আসমানী তালীম থেকে তারা বঞ্চিত। একথা অনস্বীকার্য, এ সংসারকে আল্লাহ্ নিজ গুণে পরিচালনা করছেন। আমরা যা কিছু করছি আল্লাহর কুদরত বলে করছি; তাই আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁর মর্জি মোতাবেক করা চাই। আমরা আল্লাহর গোলাম, তাঁর অধীন। রাষ্ট্রে যদি কোন অভাব থাকে তা ঐ জিনিষের অভাবটিই আছে।

جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ -

তো আছে, কিন্তু মাশা-আল্লাহ নেই। জান্নাতী ভূ-খণ্ডের মালিক তো কেবল সেই হতে পারে কুরআনে مثل الرجلين এর মধ্য থেকে احد الرجلين যিনি কমজোর মুমিন, তিনি جنتين من اعناب - এর থেকে নন। তিনি ফলদায়ক বাগান থেকে বঞ্চিত, তবে তিনি একজন মুমিন, আল্লাহ্ তাকে ঈমান নামের অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا -

উভয় বাগানে কোন কমতি নেই। বাগানে ফলমূল ভর্তি। যেন উপচে পড়ছে ঝরনার পানি!

অন্য সঙ্গী বলছেন ঃ এগুলো সবই যথার্থ, তবে 'মাশা-আল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা চাই–

لولا اذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله ـ

যখন তুমি বাগানে কদম রাখো, বলো! 'আল্লাহর শক্তি বলে' এগুলো হচ্ছে সবই আল্লাহর দান। এগুলো সবই তাঁর দ্বীন ও রহমতের বদৌলতে হচ্ছে।

হায়! আমেরিকা যদি ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত হতো!

আমেরিকা কখনও বলছে না, এগুলো আল্লাহর নেয়ামত। কেন তারা বলছে না? এর আলোচনা বিস্তর! ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলছি। এর কারণ অত্যন্ত লজ্জাকর। ব্যথা মনে এজন্য আমেরিকায় ঈমানী চেতনা থাকলে দুনিয়ার নকশা অন্য ধাঁচের হতো, ইতিহাস লেখা হতো অন্য ধারায়, যুদ্ধের দামামা যখন তখন বেজে উঠত না, পারমাণবিক বোমার আশংকায় থাকতে হতো না। লজ্জাকর এজন্য, মুসলিম জাতি ইসলামী দাওয়াত যথাযথভাবে পৌঁছায়নি। মুসলমানদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিল যখন আমেরিকা ছোট্ট শিশুটর মত অস্তিত্বের পৃষ্ঠায় হামাগুড়ি দিচ্ছিল–তখন দাওয়াত কার্য জোরদার করা। আফসোস! তখন মুসলিম মিল্লাত অলসতার ঘুমে বিভোর ছিল। এর পূর্বেও সুযোগ ছিল যা আমরা হাতছাড়া করেছি। দোর্দণ্ড প্রতাপে মুসলিম জাতি যখন স্পেনে মসজিদ না গড়ে ইসলামের পয়গাম অন্ধকার ইউরোপে ছড়িয়ে দিলে কমপক্ষে ইউরোপবাসীর দিল-দেমাগে ইসলাম পৌঁছে যেত। মুবাল্লিগ ও দাঈগণ যদি ইউরোপের অলিতে গলিতে পৌঁছে যেত তবে আজ পরিণতি এমনটি হতো না। কিন্তু আজ তা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি বলতে চাই, এ এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির লজ্জাকর উপাখ্যান।

মোদ্দা কথা, যা হবার হয়েছে। এদেশকে নতুন কিছু উপহার দিতে হবে। দিতে হবে নবুয়তের ছোঁয়া ও তার কালজয়ী দীক্ষা। আফসোস! খ্রীস্টবাদ সে চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ রিক্ততার ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

খ্রীস্টবাদের ব্যর্থতা

শতাব্দীকাল ধরেই খ্রীস্টবাদ তার ধর্মীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে। খ্রীস্টবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, খ্রীস্টবাদ নেহায়েত বৈরাগ্যবাদ বিশ্বাস করে আসছে, এমন কি উগ্রতা আর কট্টর মনোভাবাপন্ন হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। ধর্ম জ্ঞানের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। তাই সর্বকালের ধর্মবিমুখ ইউরোপ-আমেরিকাবাসীদের নতুন করে দেয়ার কিছু নেই খ্রীস্ট ধর্মের। সভ্যতার দাবীদার উগ্র আমেরিকার লোকজন যদি বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ

এরপর তারা বলতে পারে ঃ

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة -

অথচ এই শিক্ষা দিতে খ্রীস্টবাদ নারাজ। কেননা জাগতিক জীবনে উন্নয়ন-অগ্রগতিতে তারা বিশ্বাসী নয়, বরং এরা বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী।

ইসলামই যথার্থ ব্যাপকভিত্তিক ইলমবাহী ধর্মমত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً -

এর শিক্ষা দিতে অকুণ্ঠ ছিল আপনাদের গর্বিত পূর্বসূরীরা। আজ সময় এসেছে, ইসলামের মননশীল জগৎজোড়া শিক্ষায় আমেরিকাবাসীদের শিক্ষিত করার। ওদেরকে জানিয়ে দিতে হবে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে শিক্ষা দিতে ইসলামের বিকল্প নেই। পয়গামে মুহাম্মদী, ঐশী তালীম, ইসলাম বুনিয়াদী দিক নিদর্শন পেলে বোধ করি আমেরিকায় আল্লাহর রহমত নাযিল হতো। বদলে যেত আমেরিকার ভাগ্য। যুদ্ধভীতি থেকে জগৎবাসী মুক্তি পেত। মনের কোণে জমাট-বাধা ঘৃণার স্তর দূরীভূত হয়ে যেত, শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি পেত। এগুলো একমাত্র ইসলামের কালজয়ী শিক্ষার বলে সম্ভব।

খ্রীস্টবাদের বিকৃতি

হাজার দু'য়েক বছর পূর্বে খ্রীস্ট ধর্মের আবির্ভাব হয়। ফিলিস্তীন ভূ-খণ্ডে এর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। যুগটা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের যুগ। অধুনা খ্রীস্টবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আমি নির্ভীক কণ্ঠে বলছি; এ ধর্ম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রবর্তিত সেই খাঁটি ধর্ম নয়। তিনি যে ধর্মমতের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন তা ছিল নিছক আল্লাহর ধর্ম, কিন্তু বর্তমানে খ্রীস্টবাদ সেন্ট পলের সৃষ্ট ধর্মমত, এটা তার মন-মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদ। সেন্ট পল মধ্যযুগীয় একজন খ্রীস্টান। সভ্যতার আশীর্বাদধন্য মানবদের জন্য তাই এই বিকৃত ধর্ম কাজে আসছে না। মানবীয় মতবাদ ধর্মীয় মতাদর্শে মিশ্রিত হলে যা হবার তাই হয়েছে। এদের ক্ষেত্রে খ্রীস্ট ধর্মে নেই আদর্শ. নেই শিক্ষণীয় কিছু।

উদাত্ত আহ্বান

হে আমেরিকাবাসি! হে হোয়াইট হাউজে বসে বিশ্ব চালনাকারী দেশ! তোমাদেরকেএজন্য মুবারকবাদ জানাই, ঘৃণার বিষ নযরে দেখছি না এজন্য। শুধু বলতে চাই, তোমরা মাশা-আল্লাহ-লাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্ বসিয়ে নাও প্রতিটি কাজের শুরুতে। আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে সব কিছু করবে। তোমাদের সব কিছু আল্লাহর জন্যে কর। জড়বাদী উৎকর্ষকে মানবতার মুক্তির জন্য সোপর্দ কর, সমতার কল্যাণের জন্য কর। এমন সমাজ গঠনের প্রয়াস বলো যে সমাজে ধনী-নির্ধন, প্রজা-রাজা, আসামী-জজ সকলে সমান সমান।

তোমরা এমন একটা সমাজ গড়, যে সমাজে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। এমনটি করতে না পারলে এই সভ্য সমাজ মূলত সত্যের নামে অপলাপমাত্র। হোয়াইট হাউজের মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছি, যে তাহজীব মানবতার ধ্বংসস্তূপের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় সে তাহজীব চিরঞ্জীব নয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

وہ فکر گستاخ ھے جس نے عریاں کیاھے فطرت کی طاقتوں کو

اسی کی بتیاب بجلیوں سے خطرہ میں ھے اسکا اشیانہ ۔

ঐ ভ্রান্ত চিন্তাধারা যা ধর্মীয় শক্তিকে উলঙ্গ করেছে, তার লাগামহীন জৌলুস সংশয়ে রয়েছে উপকারলোভী ব্যক্তিরা।

আজ বিজ্ঞানের জৌলুস সর্বত্রই, তবে কতদিন থাকে এই জৌলুস কে জানে।

ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দাও

আপনারা ভাগ্যবান জাতি; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে এমন জৌলুস ও প্রাচুর্য দান করেছেন। আপনারা মানবতার মূল্য দিতে শিখুন। এই আকাশচুম্বী প্রাসাদ চিরদিন থাকবে না তাই পরকালের জন্য নিজেদের তৈরী রাখুন। নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে আপনাদের কথার উল্লেখ রয়েছে ঃ

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا ط والعاقبة للمتقين ـ

"এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনিষ্টতা সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।"

আপনারা এক মুসলিম ভাইয়ের মুহাব্বতে শরীক হওয়ায় আমি শোকরিয়া জানাই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের ঈমান আমলের হিফাজত করুন। আপনাদের সন্তানরাও ঈমানী জীবন যাপন করুক!

فلا تموتن الا و انتم مسلمون ـ

"তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" যতদিন তোমরা দুনিয়ার মধ্যে জীবিত থাকবে, প্রভুর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকবে। নামাযের পাবন্দী করবে, কালেমা-কালাম ইয়াদ রাখবে। দুনিয়া থেকে চিরবিদায়কালে যেন ঈমানের নূর থাকে। জবানে যেন জারী থাকে কালেমায়ে শাহাদাত।

আমেরিকা ও কানাডায় বসবাসরত মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[১৯৭৭ সালের ১০ই জুন টরেন্টো ভার্সিটি (কানাডা)-তে মুসলিম ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে মাওলানার প্রদত্ত ভাষণ।]

"হে ঈমানদারগণ! আমার জমিন সুপ্রশস্ত। তোমরা একমাত্র আমার ইবাদত করো।" [সূরা আনকাবুত ঃ ৫৬]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উপস্থিত ভাই ও বোনেরা! পার্থিব জিন্দেগীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী করা অর্থাৎ আল্লাহর মারেফাত-তার আহকাম মোতাবেক জীবন গঠন, পরকালের তৈরী, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূলের (সা.) তরীকা মোতাবেক চলা, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা সবই আনুষঙ্গিক ও উসিলামাত্র। আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যমে অন্বেষণ করা, জুৎসই পরিবেশ সৃষ্টি করা, শক্তি-সামর্থ্য সাধ্যমত প্রয়োগ করা, যাতে আল্লাহর হুকুমকে সহজে মান্য করা যায়, বাধ্যবাধকতার শিকার না হতে হয় আর বাইরের কোন শক্তির ধ্বজা ধরতে না হয়। কুরআন মজিদ মুজেযানা শব্দে ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

حتى لا تكون فتنة -

"যেন ফেৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি না হয়, দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" আকর্ষণ-বিকর্ষণের সৃষ্টি হলে দু' শক্তির মাঝে টক্কর বাঁধে। দুটি ধর্ম থাকলে মানুষের মাঝে সংশয় থাকে কোন্‌টা গ্রহণ করবে? কেউ বলবে এদিকে, আবার কেউ ওদিকে।

اطيعوا الله -

অর্থাৎ অনুকরণ-অনুসরণ শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলারই হবে। এজন্য দাওয়াতের কাজ করতে হবে, করতে হবে সৎ কাজে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে জিহাদ করতে হবে। এজন্য এখনই লোকজন তৈরি করতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় নতুবা আকস্মিক জেহাদ হলে নবদীক্ষিত জনতা বলে উঠবে, এটা আমাদের জন্য অসম্ভব।

আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর বন্দেগী

দুনিয়া সৃষ্টি, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী করা–

وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون -

এক্ষণে সকলে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন। ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষিত লোকজন কেবল উসিলা আর জড়বাদের পেছনে দৌড়ঝাঁপ করেন, মেহনত করেন গোহালঘরের ওপর, ভুলে যান তাঁদের সৃষ্টির রহস্য। আল্লাহ্ তা'আলা একটি জীবনকাল দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন, এগুলো তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক ব্যয় করতে হবে, যাতে আখেরাতে তিনি আমাদের ওপর রাজী খুশি থাকেন। আমরা যেন তার নৈকট্য অর্জন করতে পারি। জান্নাতে যেন আমাদের উঁচু মাকাম অর্জন হয়-এটাই তো সৃষ্টির মূল রহস্য! আপনারা যদি এ কাজ করে থাকেন তো আপনাদের প্রবাস জীবন ধন্য। এ কাজ মাতৃভূমিতে করতে বাধার সম্মুখীন হলে ঐ মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হবে। মাতৃভূমি ঐ স্থানকে বলে যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে যেখানের কাঁটা ও ফুলের চেয়ে প্রিয় হয়। কবির ভাষায় "জন্মভূমির কাঁটার ছোবলও রায়হান ফুলের চেয়ে সুগন্ধময়।"

জন্মভূমির মাটি মুক্তোর চেয়ে দামী, মানুষ একে চোখের সুরমা বানায়, এমন স্থান যেখানে মানুষ ভালবাসার নীড় রচনা করে, পিতামাতার উপস্থিতি, ভাইবোন ও বংশের লোকজনের কোলাহলে মুখর থাকে, মোটকথা জন্মভূমির সাথে মানবের সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.) ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" [সূরা তাওবাহ ঃ ২৪]

হুযুর (সা.)-এর হিজরত

মক্কা মুকাররমা এমন এক পূত-পবিত্র ভূ-খণ্ড যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) দোয়ার ফসল, অতি প্রিয় এ ভূমি। কুরআনে এসেছে-

فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم -

"হে আল্লাহ! মানুষের অন্তরকে এর দিকে এমনটি করে দাও যেমনটি লোহা চুম্বকের দিকে।"

এ প্রিয়ভূমি পবিত্র হরমে মক্কা। এখানে বায়তুল্লাহ আছে। আছে জমজম, সাফা-মারওয়া, মীনা-আরাফাত। রাসূল (সা.) যখন দেখলেন এখানে ইবাদত-বন্দেগী করা মুশকিল তখন তিনি সাহাবাদের একটি দলকে হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ কেন দেয়া হলো? নিশ্চয়ই এখানে স্বাধীনভাবে ইবাদত করা যাচ্ছিল না। হাবশায় গেলে স্বাধীনভাবে ইবাদত করা যাবে, পড়া যাবে নামায। এভাবে দু'বার হাবশায় হিজরত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হিজরত করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যাও, মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাও। আল্লাহর ইবাদাত স্বাধীনভাবে কর। ইবাদাতে বিঘ্ন ঘটার দরুন মক্কা ছাড়ার নির্দেশ এলে বিশ্বের অপরাপর শহরের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে? অন্যান্য শহরে যদি ইবাদাতের বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাহলে তা ছাড়তে হবে, চাই তা নিউ ইর্য়ক, কর্ডোভা, গ্রানাডা, কায়রো বা দামেস্ক শহর হোক না কেন! মোটকথা আল্লাহর ইবাদাত যেখানে স্বাধীনভাবে করা যায় সেটাই প্রিয় দেশ। এছাড়া যেখানে তা সম্ভব নয় তা অপ্রিয় দেশ-পরিত্যাজ্য দেশ। চাই তা যতই মনোমুগ্ধকর মডেল সিটি হোক না কেন।

তৃপ্তি ও অতৃপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমি বহু শহর প্রদক্ষিণ করেছি। সেই পরম্পরায় আজ কানাডার এই শহরে উপনীত হয়েছি। বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের এখানে দেখে একদিকে যারপর নেই আনন্দিত হয়েছি। কেননা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হলো সমজাতীয় লোকদের সাথে সাক্ষাত হলে পরিতৃপ্তি লাভ হওয়া। অন্যদিকে অজানা আশংকায় দিল মন কেঁপে ওঠে এই ভেবে, এখানে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক জীবন যাপন সম্ভবপর কি? আগামী প্রজন্ম তথা আপনার সন্তান-সন্ততি কি ইসলামের ওপর থাকবে? আপনাদের মাঝে ইসলামের যে চেতনা আছে তা কি থাকবে ওদের মাঝে? একথা ভাবার প্রয়োজন কি আমার একার-না আপনাদেরও দরকার আছে? আপনারা কিছু মনে না করলে একটি কথা বলি, অধিকাংশ লোকই এখানে স্বার্থের জন্য এসেছে। এসেছে ডলার কামাই করতে। উপার্জন কোন হারাম জিনিষ নয়, কোন গোনাহের বস্তু নয়, কিন্তু যেখানে জড়বাদী ধ্যান-ধারণা প্রবল, সে সমাজে বসবাস করা কতটুকু সঠিক তা জ্ঞানীমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। আপনাদের এ প্রবাসে যদি দ্বীনের সামান্যতম উপকার হয়, ঈমান-আমলও সঠিক থাকবে এমনটি যদি দৃঢ়মূল থাকে, আপনাদের তাহলে তো কোন ক্ষতি নেই। হতে পারে এ ভূ-খণ্ডে একদিন ইসলামের পতাকা উড়বে আপনাদের উসিলায়।

আরবের বাণিজ্য জাহাজগুলো যখন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে নোঙ্গর ফেলছিল তখন হাজারো বে-দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হয়। আজ মুসলমান সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। ইতিহাসের ধূসর পাতাগুলো উল্টালে দেখতে পাবেন ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সিংহভাগই আরব্য বাণিজ্য কাফেলার সহযাত্রী দ্বারা। এরপর সূফী ও দরবেশ দ্বারা। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ ক'টি প্রদেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সূফীদের দ্বারা। যেমন, সিন্ধু, কাশ্মীর, বাংলাদেশ প্রভৃতি।

সুধীবৃন্দ! আপনারা যদি ঈমান-আমল ঠিক রেখে সন্তানদের ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে পারেন, আপনাদের সৃজনশীল সভ্য জীবন যাপন দেখে বিধর্মীদের মাঝে অনুরাগের সৃষ্টি হলে এ প্রবাস আপনাদের জন্য শুধু বৈধই নয়, বরং জেহাদের পর্যায়ভুক্ত হবে বলে আমি মনে করি। পক্ষান্তরে আপনারা যদি নিছক ভোগবিলাসে মত্ত থাকেন তবে এ জীবন ব্যবস্থার সাথে শরীয়তের কোনই যোগ্যসূত্র নেই।

আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, বিশ্বাস না হলে মুসলিম মনীষীদের কাছে এ কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। আমি যা আরজ করলাম তা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক হলে আপনাদের প্রবাস জীবন যায়েজই নয়, বরং একটি ইবাদাত হবে। আল্লাহ্ না করুক, আপনার সন্তানরা পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে প্রভাবিত হয়ে পথহারা হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন? হালুয়া-রুটির অন্বেষায় এসে ঈমানের মত দুর্লভ নেয়ামত খুইয়ে বসা জ্ঞানী লোকের পরিচয় নয়। অবশ্য যে কথা আগেও বলেছি, আপনারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন যে পরিবেশে আপনার ঈমানে আঁচড়টুকু লাগবে না। আপনি উপার্জনের সাথে সাথে দ্বীন প্রচারের জন্য একটা দাওয়াতী দলের সাথে সম্পর্ক রাখলেন, আখেরাতে চিন্তা করলেন, এমন একটি সুন্দর পরিবেশ গড়লেন, যা দেখে আকর্ষিত হয় বিধর্মীরা, শিশুদেরকে দ্বীনী তালীম দিলেন, এর মত প্রশংসনীয় কাজ আর হতে পারে না। এমনটি না হলে কিয়ামতের দিন শিশুদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তোমরা আমার নাম জান না, জান না আমার রাসূলের নাম, জান না নামাজ, তবে দুনিয়ার থেকে কি নিয়ে এলে? তখন তারা বলবে ঃ

إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ـ

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম। অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।" [সূরা আহ্যাব ঃ ৬৭]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজকে ও পরিবারকে (সন্তান) জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" [সূরা আত-তাহ্‌রিম ঃ ৬]

আপনার শিশুরা স্কুলে যায় ভালো কথা, কিন্তু তৌহিদ-রেসালাত ও দ্বীনের তালীম দেয়ার কোন একটা সময় নির্ধারণ করেছেন কি? যা ছাড়া মানুষ মুসলমান হতে পারে না তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে আদৌ?

মনে রাখবেন! দ্বীনী তালীম ছাড়া মুসলিম শিশু বাচ্চার মৃত্যু শ্রেয়। এ ধরনের স্পষ্ট কথা বলায় বেয়াদবী হলে আমায় মাফ করবেন। আপনারা চব্বিশ ঘণ্টার এক ঘণ্টা যদি দ্বীনী তালীমের জন্য নির্ধারিত করেন, তবে আমি বলতে পারি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে কানাডায় টেনে নিয়ে এসেছেন। পাক-ভারতসহ এশিয়া মহাদেশীয় রাষ্ট্রের যুবকশ্রেণী বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় পাশ্চাত্যমুখী হচ্ছে হালুয়া-রুটির লোভে।

দৃষ্টান্তমূলক কিছু ঘটনা

আমি শুধু ঐসব লোকের এদেশে বসবাস করাকে বৈধ মনে করছি যারা ঈমান-আমালী পরিবেশ গড়ে বিধর্মীদের আকর্ষণ করতে পারে নতুবা এখানে কোন মুসলমানদের ইন্তেকাল হলে শরীয়া মোতাবেক তার কাফন-দাফন হবে কিনা এ গ্যারান্টিটুকু নেই। কানাডার বোস্টন শহরের বসবাসকারী আমার প্রিয়ভাজন মৌলভী মুদাসসির সাহেব বলেছেন ঃ এখানে জনৈক হাজী সাহেবের ইন্তেকাল হয়। ফোনে খবর এল, দাফনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এখানে এসে দেখলাম লাশ বাক্সবন্দী, স্যুট-কোট পরিধান করানো হয়েছে, লাগানো হয়েছে টাই, আংগুলে সোনার আংটি, খ্রীস্টান নারী-পুরুষ আসছে আর চুমু খাচ্ছে আর কফিনের ওপর ফুল-পাপড়ি বিছাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা মৌলভী সাহেবের হায়াত দারাজ করুন! তিনি শেষ জীবনে মাদ্রাসায় পড়েছিলেন। তিনি পরিস্থিতি দেখে শিউরে উঠে হাজী সাহেবের ছেলেকে বললেন ঃ আমি চলে যাচ্ছি।

তারা বলল ঃ কেন?

মৌলভী বললেন, আমি যা কিছু বলব, আপনারা তা তো করবেন না।

আরে মৌলভী সাহেব! আমরা আপনাকে ডেকে পাঠালাম আর আপনার কথা মানব না? এগুলো কি বলছেন আপনি?

মুদাসসির সাহেব বলেনঃ প্রথমে তাঁর (মরহুম হাজী সাহেব) স্যুট-কোট খুলে ফেলুন। সমবেত লোকদের সরিয়ে দিন। আমি শরীয়া মোতাবেক গোসল দেব, কাফন পরাব। সোনার আংটি খুলে নিন।

সোনার আংটি না খুললে হয় না? নতুবা আম্মা হার্টফেল করবেন।

আমি অবশ্যই সোনার আংটি খুলব। আপনার আম্মার হার্টফেলের আশংকা থাকলে তাকে এখন জানাবেন না। শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে যায়।

ভাগ্যিস! আমার স্নেহভাজন মৌলভী মোদাসসির সাহেব সেখানে পৌঁছেছিলেন। না জানি কত মুসলমানের কানাডায় এভাবে খ্রীস্টান স্টাইলে দাফন হচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদা কানাডায় এক মিশরীয় আলেমের মৃত্যু হয়। তিনি জীবদ্দশায় ইংরেজীতে একটি ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন বই রেখেছিলেন। এদিকে তার স্ত্রী ছিল আমেরিকান। দূরে ছিল মুসলিম কবরস্থান, তাই স্ত্রী তার স্বামীকে খ্রীস্টান কবরস্থানে দাফন করবে। এ দৃশ্য জনৈক মুসলমান স্বপ্নে দেখে চিৎকার করে ওঠেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি বাঁচাও, তাঁকে সংরক্ষণ করো। এ ঘটনা দুটো শোনার পরও কি আমাদের হুঁশ আসবে না?

উপসংহার

সুধীজন! আপনারা একটু চিন্তা করুন। শিশুদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করুন নতুবা এখানে দু'টি দুশ্চিন্তায় পড়বেন। প্রথমত আপনি নিজে, দ্বিতীয়ত আপনার দেশ। পাক-ভারতের যে যুবকশ্রেণী এদেশে এসেছেন, তারা মাতৃভূমিতে ১০/১২ জন লোকের অধীনে কাজ করতেন। তার একটি শক্তি ছিল, পিতামাতা আশেপাশে ছিলেন। আরবের বহু লোক এখানে আছেন। তারা আপনার দেশে থাকলে নিজেরা শক্তিশালী বানাতেন অন্যকে। নিজ যোগ্যতা বলে অন্যের উপকার সাধন করতেন। শুধু পার্থিব হালুয়া-রুটি, একটি সুখের নীড়, অভিজাত পোশাক-আশাকের আশায় এই নির্জন প্রবাসী জীবন কাটানো কি আপনাদের জন্য ঠিক হচ্ছে? আপনারা হয়তো আমার থেকে এমন কথা চাচ্ছিলেন যা আপনাদের মনমত হয়। কিন্তু আমি আপনাদের অন্তরে কষ্ট দিলাম। জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাগুলো ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

মুসলমানদের অবস্থান ও করণীয়

[নিম্নোক্ত ভাষণ ১৯৭৭ সালের ৩রা জুন নিউ ইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরের এক হলরুমে জুম'আর নামাযের খুৎবার তরজমা। ঐ নামাযে আরব বিশ্বের বিভিন্ন সেবা সংস্থার অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। আরব দেশের লোকজন ওদিন বেশী ছিলেন। রাবেতা আলমে ইসলামী ও জাতি সংঘের অনেক কর্মকর্তাও শরীক ছিলেন। বাদ নামাজ খুৎবার ইংরেজী তরজমা করেন মোজাম্মেল হোসেন সিদ্দীকী।]

আল্লাহর হামদ ও ছানার পর মাওলানা বলেনঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" [সূরা আল-ইমরান ঃ ১৩৯]

এ আয়াত ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন ইসলাম ছোট্ট শিশুটির মত ছিল, ছিল না ইসলামের কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলাম ছিল কেবল আরব উপদ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আরবী ভাষাভাষী লোকজন দারুণ দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত থেকে কালাতিপাত করত। খেজুর, উটের গোশত আর যবের রুটি তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। মোটাসোটা পোশাক পরত তারা। ঘর-বাড়ী কাঁচা মাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। অনেকে তাঁবুর মধ্যে যাযাবরী জীবন যাপন করত।

শীতকালের শৈত্য প্রবাহে আর নিশিথে হাড়কাঁপানো ঠক ঠক অবস্থায় জড়োসড়ো হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকা বকরীর মত তাদের জীবন ছিল। বিধ্বস্ত এই জাতিকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করে সভ্যতার পথ দেখিয়েছিল মুক্তির মহাসনদ আল-কুরআন। তাদের সাবেক অবস্থা কুরআনে কারীমে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

واذكروا اذ نتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون ...

"আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমরা সংখ্যালঘু ছিলে, ছিলে ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল জাতি। ছিলে ভীত-সন্ত্রস্ত, তোমাদের না অন্যে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।" [সূরা আনফাল ঃ ২৬]

আরবদের অবস্থা যখন এমন নাযুক ছিল তখন ধন-ধ্যানে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে রোম-পারস্য গোটা বিশ্বের মোড়লে পরিণত হয়েছিল। এরা তাহজীব-তামাদ্দুনের স্বর্ণ শিখরে পৌছেছিল। মানবতা তাদের হাতের মুঠোয়

বন্দী ছিল। বিশ্বকে ওরা ভাগাভাগি করে শাসন করত। প্রাচ্যের দেশগুলো পারস্যের কব্জায় ছিল আর প্রতীচ্য ছিল রোমাকদের দখলে। দুনিয়ার সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য তাদের কাছে নত হয়ে যেন ধরা দিয়েছিল! খাদ্যের প্রয়োজন ছিল প্রচুর। অন্যান্য জাতি এদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। চলত ওদের ইশারায়। তাদের হাত মাটিতে পড়লে মাটি সোনা হয়ে যেত। মোটকথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সব রাষ্ট্র তাদের গুণকীর্তন করত।

আরব জাতির এই দৈন্যের কালে যখন হতাশার বাঁকে ঘুরপাক খাচ্ছিল দুনিয়ার নেতৃত্বে ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো থেকে তারা হতাশ হয়েছিল, এমতাবস্থায় কুরআন তাদেরকে সোৎসাহ দিয়েছে। মুসলিমদেরকে উদ্দীপিত করতে কুরআনের আয়াত এভাবে অবতীর্ণ হয়েছে :

وَلَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না, তোমারাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" [আল-ইমরান : ১৩৯]

এ সেই কুরআন যা মক্কার কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ করেছে, রোম-পারস্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই মুষ্টিমেয় মুসলিম জনতার নেতা ও প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সূরা ইউসূফ নাযিল হয়েছে।

কুরআন ঘোষণা করছে :

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ -

"অবশ্য ইউসূফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" [সূরা ইউসূফ : ৭]

এই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে :

حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَايْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ - لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

"এমন কি যখন আম্বিয়াগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমন কি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রতিটি বস্তুর বিবরণ ও হেদায়েত।" [সূরা ইউসূফ ঃ ১১০-১১১]

এমনিভাবে সূরা কাসাসের এই আওয়াজ মহাশূন্যে গুঞ্জরণ করে ফিরত। আল্লাহ্ তা'আলার এই সূরায় জুলুম, অন্যায় ও স্বৈরাচারের কাহিনীর বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ

طٰسٓمٓ - تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ - نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ..........

"ত্ব-সীন-মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি আপনার কাছে মূসা ও ফেরআউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছে হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার। তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকার প্রদান করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত।" [সূরা কাছাছ-১, আয়াত ঃ ৬]

এ ধরনের সংশয় ও নাযুক পরিস্থিতিতে কোন মঙ্গলের আশা-ভরসা করা যায় কি? সে কোন্ হৃদয় ও দুঃসাহসী বুকের পাটা যা এ ধরনের ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতিকে ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাতে ভবিষ্যদ্বাণী করে? দুনিয়ার যত বড় গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক হোক না কেন, হোক না সে অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতা বলে জগদ্বিখ্যাত, তার পক্ষে থোড়াই সম্ভব এমন একটি মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু জাতিকে সোৎসাহ প্রদান করে কুরআনের মত চিরন্তন নীতিবাক্য শোনানো?

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

সত্যি বলতে কি, কালজয়ী বিশ্বাস ও দৃঢ়চেতা মন-মস্তিষ্কসম্পন্ন আরব জাতি ছিল নিবেদিতপ্রাণ বীর বাহাদুর। বিশাল সাম্রাজ্যবাদীদের তারা দেখত অতি তুচ্ছ। প্রভাব-প্রতাপশালী শক্তিকে তারা খুঁটিহীন ঘর আর ভিত্হীন দালানের মত দেখত। কুরআনে কারীমে এই নিষ্প্রাণ হুকুমাত-এর চিত্র খুব প্রাঞ্জলভাবে চিত্রিত করেছে। আর কুরআনের চেয়ে কেউ বাস্তব চিত্র অংকনকারী আছে কি?

وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ - كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ -

"আপনি যখন তাদেরকে দেখেন তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শোনেন। তার প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ।" [সূরা মুনাফিকুন ঃ ৪]

এ দুর্বল, নিঃস্ব আরব জাতি যখন ঈমানী দৌলত শুনতে থাকেন তখন তারা গৌরবাতিশয্যে আরব উপদ্বীপ থেকে ভিন্ দেশে বের হন এবং তারা জাগতিক শক্তিতে দাপটশীল শাসকবর্গকে 'কুচ নেহী'-এর পর্যায়ে দেখেন।

আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

"পাহাড়-পর্বত ও সাগর-মহাসাগর তাদের আন্দোলনের সামনে সংকুচিত হয়ে যেত। এত কিছু করা সত্ত্বেও তারা উভয় জগতে আত্মার প্রবৃদ্ধিতে মশগুল হয়েছে। কী আশ্চর্য তাদের এ অঙ্গীকার! তাদের তৃপ্তি ছিল কত সুন্দর।"

জাগতিক শক্তি ও দাপটের নিক্তিতে ওজন করে দেখলে গোটা মানবতা যেন বাঘের মুখে ছিল, এমন কি বাঘের দু' চোয়ালে তা চোয়ালবদ্ধ ছিল। আরবরা অভিযানে বের হলে বাহু-অস্ত্র শক্তি ছাড়া আর এক প্রকারের শক্তি নিয়ে বের হতো। তাদের সেই শক্তি ছিল অলৌকিক, ঐশী ও আসমানী কুদরতী শক্তি। তারা অপরাপর জাতি থেকে এক স্বতন্ত্র শক্তির (Power) অধিকারী ছিল। তারা রিক্তহস্ত ও বুভুক্ষ থাকলেও যে দেশ তারা দখল করত যেখানে লুটেরা ও স্বৈরাচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো না, বরং একত্ববাদের মোহতানে মোহগ্রস্ত হয়ে আসমানী শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করে তাই-ই বুকে আগলে দেশ শাসন করত। তাদের সামনে খুলে গিয়েছিল ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যের দ্বার। জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে তারা অনন্ত জীবনের স্বপ্নের ঠিকানাকে লক্ষ্য করে

এগুত। জ্ঞান খুঁজে পেয়েছিল মানবতার মসনদ। কেবল পেট পূজাই মানুষের মূল পরিচয় নয়, বিলাসবহুল জীবন যাপন নয়, তাদের মূল পরিচয় হচ্ছে, "তারা মানুষ। মানুষের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তারা অনুধাবন করতে পারে জাগতিক জীবন এবং তার প্রাসঙ্গিক যা কিছু আছে সবই নিরর্থক; তাই জাগতিক জীবনকে তারা তুচ্ছ মনে করে এবং সিংহের জাতি অলসতার নিদ ভেঙ্গে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। কাইসার ও কিসরা পিঞ্জিরায় কূজনরত পাখির মত বন্ধ ছিল। পিঞ্জিরা খুব মনোরম। এর তলা স্বর্ণ দিয়ে তৈরী, ওপরের ছাউনি স্বর্ণের, খাদ্য বাসনও ঐ স্বর্ণনির্মিত। কিন্তু শত হলেও পিঞ্জিরা পিঞ্জিরাই। সোনার হোক কিংবা লোহার হোক, প্রশস্ত হোক কিংবা সংকীর্ণ, ঝিল থাকুক কিংবা নহর, এর মধ্যে উঁচুনীচু পাহাড়-উপত্যকা থাকুক বা না থাকুক; সর্বাবস্থায় সে তো জেলখানা! সেখানে স্বাধীনভাবে ফুড়ুত করে উড়াল দেয়া যায় না।

আরব জাতি রাজমুকুটধারী এসব রাজন্যবর্গকে, যাদের অনেকে ছিলেন শাহানশাহ্ ও গভর্নর, কেউ বা ছিলেন জেনারেল-সিপাহসালার, কেউ বা দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী, শাহজাদা ও ভাবী সম্রাট ছিলেন অনেকে, এদের সবাই আরবদের কাছে তেলের ড্রামের মত ছিলেন। এদেরকে তারা ফোলাফাঁপা বেলুনের মত মনে করত।

তারা মনে করত এই জাতি নির্জীব, এদের অন্তরনদী শুষ্ক, জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক ন্যুজ, তারা আপনার ব্যর্থতা নিয়েই ব্যস্ত। মানুষকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে পূজা করা ছিল এদের ধর্ম। দরকার ছিল এদের জীবনকালকে পরিবর্তন করা। এদেরকে মানুষ পূজা থেকে এক আল্লাহর পূজায় নিমগ্ন রাখার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ওদের বেশভূষা চাকচিক্যময় থাকলেও অন্তরলোক ছিল বাতিল আক্বীদায় তমসাচ্ছন্ন।

এই আরব্য কাফেলা বিজয়ের নেশায় বের হয়েছিল, বের হয়েছিল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, কদম বাড়িয়েছিল বর্বরতার তুফান থেকে জগৎবাসীকে স্বস্তির উপকূলে পৌঁছে দিতে, আবহমান কালের শোষিত জনপদকে শান্তির পয়গাম শোনাতে, সংকীর্ণ দুনিয়া থেকে প্রশস্ত দুনিয়ার জৌলুস দেখাতে। তারা জাগতিক প্রাচুর্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন। হুকুমতের রাজন্যবর্গকে দেখেন তালপাতার সেপাইয়ের মত। ওদের অস্ত্রশস্ত্রকে পুতুল খেলার কাঠি মনে করতে থাকেন। প্রাসাদোপম মহলগুলোকে তাসের ঘর মনে করেন। বিশাল পৌত্তলিক সৈন্য বহর তাদের কাছে ইতর গরু-বকরীর পালের মত মনে হতে থাকে। তারা ভেবে দেখেন এই অথর্ব খরদেমাগ জাতিকে নবুওয়াতী ছোঁয়া দিতে না পারলে এই অভিযান ব্যর্থ হবে। তাই বুকে অদম্য সাহস, হাতে তরবারি আর মুখে রাসূল করীম (সা.)-এর অমীয় বাণী নিয়ে ছুটে চলেন দেশ থেকে দেশান্তরে।

কুরআন পাক জাহেল আরব জাতিকে তাহজীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দিয়ে এক আদর্শবান জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল। তারা জড়বাদকে পিছে ফেলে বাস্তববাদী হয়েছিল। দেখিয়েছিল কুরআনের দিশা আরব-অনারবীদের সমান তালে।

সমবেত শ্রোতামণ্ডলি! এক্ষণে আমরা জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অবস্থান করছি। আজ আমাদেরকে বিবিধ রাষ্ট্রনায়করা খবরদারির করছে, তবে তাদের খবরদারির আর সেদিনের আরবদের খবরদারি মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। আফসোস! আমরা তো সেই জাতি যারা একদিন অন্যের খবরদারি করতাম, আর আজ আমাদের করছে অন্য জাতি। সেদিন আমরা পেয়েছিলাম কুদরতের পক্ষ হতে মহাসনদ, মহাসান্ত্বনা ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

এ আয়াত নাযিলের যুগে ইসলাম দুধের বাচ্চার মত ছিল। এক পা দু'পা করে সে চলাচল করত। এমতাবস্থায় তাদের আল্লাহ্ তা'আলা বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। মহামহিমের এই বাণীর উদ্দেশ্য সেদিন আরবরা যদি হতে পারে তাহলে আজকের এক শ' কোটি জনতা কি ঐ আয়াতের যোগ্য অধিকারী হতে পারে না? আজ আমরা ছোটখাট চল্লিশটি রাষ্ট্রের মালিক। এক্ষণে আমাদের বহু দেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করছে। যদিও বর্তমানে আমরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী নই, যদিও আমরা অত্যাধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে বহু পেছনে, আসমানী শিক্ষাকে দেখছি ঘৃণা ভরে, তথাপিও কুরআনের চিরন্তন নীতির প্রেক্ষাপটে আমরা আবার সেই পূর্বেকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি, যদি আমাদের ইচ্ছে ও সাহস সমানভাবে সহায়ক হয়। বাস্তবিকপক্ষে মুমিনের আসল অস্ত্র হচ্ছে ঈমান-আমল চালিকা শক্তি ঐ জিনিষটির। তেল না থাকলে কুপির যেমন মূল্য নেই, ঠিক তেমনি ঈমান ছাড়া মুমিনের আর কোন অস্ত্র নেই। এই মুমিনরাই গোটা বিশ্বের শক্তি ও সাহস। বদরের দিনে রাসূল (সা.) তাই দোয়াচ্ছলে বলেছিলেন ঃ

اللهم هذه عصابة ان تهلك هذ القوم -

হুজুর (সা.) বুঝেছিলেন এখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া গতি নেই। হুজুরের সত্তা আল্লাহর খাস নূরে নূরান্বিত ছিল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তাঁর স্বভাবজাত গুণ, পরিস্থিতির সামাল দিতে তিনি ছিলেন অনন্য। ইসলামের সূচনাকালেই সংখ্যাধিক্য থাকলে ইসলামের বিকাশ-প্রসার এতটা সম্ভবপর হতো না।

বদরের যুদ্ধে মাত্র তিন শ' তের জন জানবাজ সিপাহী মুকাবেলা করেছেন তিন গুণ সৈন্য ও অস্ত্রবলে বলীয়ান পৌত্তলিক মুশরিকদের। ঐতিহাসিকরা ভেবেই পান না, কেমন করে সম্ভব হলো এই নগণ্য সৈন্যদলের বিশাল সৈন্য বহরের বিরুদ্ধে জয় লাভ করা? রাসূল (সা.) অনুধাবন করছিলেন, আল্লাহর নুসরত না পেলে এ যুদ্ধে টেকা মুশকিল, তাই তাঁর বিনয়ী দোয়ার হাত উত্তোলিত ছিল, সর্বদা মুখে ছিল এই কালাম।

ان ينصركم الله فلا غالب لكم -

মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নীবৃন্দ! বর্তমানে সারা বিশ্বে যে মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রগুলো আছে, তাদেরকে একতার সেতুবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। আমি হল্‌ফ করে বলতে পারি, আজো যদি মুসলিম জাতি তাদের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে হুংকার ছাড়ে তবে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমেরিকাবাসীরা কাইসার ও কিসরার মত আমাদের অধীন হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে আমরা যদি ঈমানহারা হয়ে যাই যেমনটি হয়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলো তবে আমাদের অবস্থা আরো নাযুক হবে। হবে আরো করুণ।

মুহ্‌তারাম ভাই বন্ধুগণ! এখন হুঁশিয়ার হোন! পরগাছা যেমন কোন বস্তু ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি পরগাছাসুলভ মুসলিম জাতি টিকতে পারবে না। আমাদের নাম তো মাশা-আল্লাহ্ ইসলামী। আদমশুমারীরেও দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী, কিন্তু আল্লাহর নিক্তিতে আমরা যদি ভারী না হতে পারি তাহলে আমাদের জনম বৃথা, আখেরাত বরবাদ। অতএব, বিশাল জনগোষ্ঠীর ঈমান-আমল ভারী ও মজবুত হওয়া দরকার। আমরা যে অবস্থায়ই আছি সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমেরিকার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে পারি, তোমরা আসমানী কিতাবের ধারক-আমরাও ধারক। তবে তোমাদের ঈমানের চেয়ে আমাদের ঈমান মজবুত। আমরা বিশ্ব ভুবনে পরগাছা হয়ে আর থাকতে চাই না। আমাদের জীবন শিশুসুলভ জীবন নয়। আমরা বীরের জাতি। আমাদের ইতিহাস আছে, আছে কালজয়ী ঐতিহ্য। আমাদের কালচার-কৃষ্টি আছে। আমাদের ধর্ম আছে, আমরা অধর্মের বেড়াজালে বন্দী নিঃস্ব জাতি নই।

আমরা ইসলামের নেয়ামত ভোগ করছি। ইসলাম আমাদের, আমরা ইসলামের। আল্লাহর মদদ থাকলে তাই আমাদের সাথে থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমাদেরকে জগত থেকে বিলীন করে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অদৃশ্য সাহায্য যে জাতির কাছে এসে ধরা দেয় তাদের অস্তিত্বের পৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলা সহজ নয়। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ -

"তোমরা আল্লাহ সাহায্য করলে আল্লাহ্ও তোমাদের সাহায্য করবেন। করবেন তোমাদের কদম দৃঢ়।" [সূরা মুহাম্মদ ঃ ৭]

পক্ষান্তরে আমরা নামমাত্র মুসলমান হলে, ইসলামের দীক্ষা হতে দূরে থাকলে হতাশা-পরাজয় আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যবাসীরা পুরানো "লীগ অব নেশান্স"-এর পর্যালোচনা করে লিখছে যা কেবল জ্যামিতির অংকিত সমুদ্র রেখার মত নিষ্ফল সমুদ্র অর্থাৎ ওরা জাতিসংঘ গড়লেও এটা মানবতার মুক্তির জন্য করেনি, বরং মানবতাকে গলা টিপে মারতে করেছে। জ্যামিতিক সমুদ্রে আমরা বিশ্বাসী নই, বরং আমরা বাস্তব সমুদ্র গড়তে পারি এমন মতবাদে বিশ্বাসী। এই সংঘের কাছে তাই আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। চাইলে কিছু চাও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের মর্ম উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। ইসলাম ছাড়া গতি নেই। আল্লাহ্কে ভয় করুন, অন্য কাউকে নয়। দ্বীনের জন্য আত্মনিবেদিত হোন, পয়গামে মুহাম্মদী (সা.)-কে জগতময় ছড়িয়ে দিতে অকৃপণ হোন, ঈমান-আমল মজবুত করুন। আল্লাহ্ তাঁর কুদরতী বলে আমাদের বলীয়ান করুন, এই দোয়া করি।

পশ্চিমা গবেষকদের দৃষ্টিতে নারী

'নারী' বর্তমান বিশ্বের এক আলোচিত বিষয়। নারীর অবস্থা–অধিকার নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। সর্বশেষ বিভিন্ন ধর্মে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে শেকড়সন্ধানী পড়াশোনা করছেন গবেষকরা। সেই অধ্যবসায় ও গবেষণার আলোকে তারা খুঁজে পেয়েছেন, পবিত্র কুরআন ও ধর্মশ্রেষ্ঠ ইসলামই নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। একথা স্বীকার করেছেন সমকালীন প্রাচ্যের কয়েকজন ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি গবেষক। তারা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করেছেন, ইসলাম নারীকে তার যথার্থ অধিকার দিয়েছে। নারীকে সম্মানিত করেছে। অপূর্ব শ্রদ্ধার আসনে করেছে সমাসীন।

আমরা এখানে গবেষকদের দেয়া কয়েকটি খণ্ড জবানবন্দী পত্রস্থ করছি। প্রথমেই এমন একজন পশ্চিমা গবেষকের সাক্ষ্য তুলে ধরছি, যিনি নিজেই নারী, যিনি দীর্ঘ দিন সংস্কারমূলক প্রশিক্ষণ কর্মে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের ভারতে। তিনি 'থায়ামোফিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানা ছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন নারী। আর যে কোন নারী 'নারী বিষয়ে' অত্যন্ত সচেতন হবেন এবং কোন অবিচারের প্রতিবাদী হবেন এটাই স্বাভাবিক। তিনি হলেন মিসেস এ্যানি বেসান্ট (Mrs. Annie Besant)। তিনি বলেন, "আপনি এমন অনেক লোক পাবেন, যারা ইসলামের সমালোচনা করে শুধু এ কারণে, ইসলাম একাধিক বিবাহকে বৈধ করেছে অবশ্য সীমিত সংখ্যায়, কিন্তু লন্ডনের একটি সেমিনারে আমি করেছিলাম একটি ভিন্ন অভিযোগ। আমি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে বলেছিলাম, একটিমাত্র বিবাহের ধুয়া তুলে অসংখ্য নারীর সাথে মেলামেশা শুধুই মুনাফেকী ও ভণ্ডামি। সীমিত একাধিক বিবাহের বৈধতার চাইতেও বেশি অপমানজনক এটা। আজ মানুষ এই জাতীয় কথাকে অপছন্দ করে, অথচ এগুলো বলা দরকার। কারণ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, নারী সম্পর্কে ইসলামী রীতিনীতি আমাদের এই ইংল্যান্ডেও কিছুকাল আগ পর্যন্ত মানা হতো। ইংল্যান্ডের নারী সভ্যতায় ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন খুব প্রাচীন অতীত নয় এবং এই আইনই ছিল সর্বাধিক ন্যায়সংগত ইনসাফভিত্তিক। সমকালীন পৃথিবীর সর্বাধিক সুন্দর ও নীতিসমৃদ্ধ আইন ছিল এটা। এই আইনে, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার স্বত্ব ও তালাকের ব্যাপারে পশ্চিমাদের চাইতেও অধিক উন্নত ছিল এই আইন। নারীর অধিকারের যথার্থ সংরক্ষক ছিল এই আইন। কিন্তু এই বিবাহ আর একাধিক বিবাহের স্লোগান মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ঘুলিয়ে ফেলেছে, অথচ তারা দৃষ্টি মেলে দেখে না, এই প্রাচ্যে একজন নারীকে বার্ধক্যে যখন 'মন

ভরে না' অভিযোগ এনে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়, তখন আর তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। তারা ভাবে না এই অপমান থেকে নিষ্কৃতির উপায় সম্পর্কে।"

মিস্টার এন. এল. কলসেন (N. L. Coulsen) লেখেন, "নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা অনন্য, বিশেষ করে বিবাহিতা নারী সম্পর্কে কুরআনী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে ইসলামের প্রচুর আইন রয়েছে। এর উদ্দেশ্য নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা। আরবদের রীতিনীতিতে ইসলামের এই আইন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে নিয়ে স্বতন্ত্র আইন রচনা করেছে, যা ইতিপূর্বে আর হয়নি। ইদ্দতের সীমারেখা নির্ধারণপূর্বক তালাকের আইনে পবিত্র কুরআন এক ব্যতিক্রমী পরিবর্তন সাধন করেছে।

ধর্ম ও সভ্যতা বিষয়ক বিশ্বকোষের এক প্রাবন্ধিক লিখেছেন, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরব্য সমাজের অবহেলিত নারী জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ করে যে নারী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত জানোয়ার হিসেবে গণ্য হতো, সেই নারী মৃত স্বামীর সম্পদের ভাগীদারের মর্যাদা পেয়েছে। অধিকন্তু ইসলাম তাকে দিয়েছে স্বাধীন জীবন। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতেও এখন বাধ্য নয়। স্বামী তালাক দিলে স্ত্রীকে খোরপোষ দেয়ার বিধান প্রবর্তন করেছে ইসলাম। তাছাড়া বিবাহের সময় উপহার হিসেবে যা পেয়েছিল, তাও ফেরত দিতে হয়।

উঁচু শ্রেণীর নারীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্যের প্রতিও ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। তাদের কেউ কেউ গদ্যে ও পদ্যে উচ্চতর স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেকে তো শিক্ষিকা হিসেবেও সাহিত্যকর্ম করেছেন। সাধারণ শ্রেণীর নারীরা নিজেদের ঘর-সংসারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, রাণীর মত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেছেন। তারা সুখ-দুঃখে স্বামীর অংশীদার হয়েছেন। মায়েরা অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছেন।

নব প্রজন্ম

পবিত্র কুরআন আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষকদের এই চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নারী জাতির জন্যে একটি নতুন দিগন্ত বলা যায়। বলা যায় একটি নতুন নির্দেশনা, নতুন পথ। কারণ ইসলাম-পূর্ব যুগে নারী ছিল চরমভাবে অবহেলিত। গৃহপালিত পশু, বাজারের পণ্যসামগ্রী আর নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। বন্ধক রাখা হতো। তারা ব্যবহৃত হতো রংমহলের শোভা-সৌন্দর্য হিসেবে।

অধঃপতনের এই ভয়ানক দুর্দিনের আবির্ভূত হলো এই নতুন সভ্যতা—শুরু হলো মহাইনকিলাব। এ বিপ্লব ছিল চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। বরকতময় এই বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছিল সর্বত্রই এবং এটাই ইসলাম। এই বিপ্লবের স্বাদ ভোগ করেছে কম-বেশী সকল রাষ্ট্রই। সকল দেশ সমাজই এই বিপ্লবকে সামর্থ্য মাফিক স্বাগতম জানিয়েছে, বিশেষ করে যে সব দেশে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছে, সেসব দেশ অথবা যেখানে ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে কিংবা আমলী দাওয়াত ও আমলী নমুনা হিসেবে যেখানে প্রবেশ করেছে, সেখানেই এই বিপ্লব অভ্যর্থনা পেয়েছে, অভিনন্দিত হয়েছে।

ইসলামের এই মানবিক উপহার সে সব দেশে সর্বশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, যেখানে বিধবা নারীরা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত অবলীলায়। সমাজও তাদেরকে স্বামীর পরে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উপযুক্ত মনে করত না, তারা নিজেরা ভাবত, পতির পরে আর বেঁচে থাকার অধিকার কোথায়? এই অন্ধকারে আলোর প্রদীপ জ্বেলেছে ইসলাম। বঞ্চিতাদের এই আঁধার ভাগাড়ে ইসলাম এনেছে নয়া বিপ্লব। মুসলমান বাদশাহগণ তাদের শাসন আমলে এসব হিন্দুআনী অপসংস্কৃতির দাওয়াই করেছেন যত্নের সাথে। তাদের সংশোধনের পথ করে দিয়েছেন, বিশেষ করে 'সতীদাহ' প্রথাকে এমনভাবে সংশোধন করেছেন যাতে ভারতীয় সভ্যতাও পথে মারা যায়নি এবং অপমানিতও হয়নি, অথচ আসল সত্য জেগে উঠেছে স্বমহিমায়। এ সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রখ্যাত পর্যটক ডক্টর বারনিয়ার লিখেছেন ঃ

"আজকাল ভারতবর্ষে সতীদাহের হার কমেছে। কারণ এ দেশের মুসলিম শাসকরা এই পাশবিক প্রথাটি নির্মূল করতে যার পর নাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকারী কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। কেননা এ দেশের শাসকদের নীতি হলো, তারা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ধর্মীয় রেওয়াজবিরোধী কোন কিছু করা প্রশাসনিক নীতির পরিপন্থী, বরং সকল ধর্মের সমান স্বাধীনতা স্বীকৃত এখানে। এরপরও বিভিন্ন কায়দা-কৌশলে তারা সতীদাহের সংস্কৃতিকে নির্মূল করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যেমন কোন মহিলা প্রাদেশিক হাকিমের অনুমতি ছাড়া সতীদাহ করতে পারবে না বলে আইন করা আছে। আর প্রাদেশিক হাকিম তাকে ঘোরাতে থাকেন। যদি পূর্ণাঙ্গ আস্থা হয়ে যায়, এই নারী স্ব-ইচ্ছাই অটল, সে এই সিদ্ধান্ত থেকে আদৌ ফিরে আসবে না, তখনই কেবল কোন নারীকে সতীদাহের অনুমতি দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে হাকিম বিধবাকে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন। তর্ক-বিতর্ক হয়। তাদেরকে বিভিন্ন আশা দেয়া হয়। ভয় দেখানো হয়। তখন কোন কৌশলই যদি কাজে না লেগে, তখন অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মহলের বেগমরা তখন তাকে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন।

এত সব কায়দা-কৌশলের পরও সতীদাহের সংখ্যা এখনও বেশ, বিশেষ করে যে সব রাজার এলাকায় মুসলমান হাকিম নেই, সেখানে সতীদাহের সংখ্যা বেশি।" এটা বাদশাহ্ শাহজাহানের আমলের কথা।

আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে নারী

বর্তমান সময়ের দার্শনিক কবি ডক্টর ইকবাল এমন সময় শিক্ষা লাভ করেছেন যখন নারী স্বাধীনতা সংগ্রাম একেবারে স্লোগানে সারা পৃথিবীকে এমনভাবে মাতাল করে রেখেছিল এর বিপরীত কোন শব্দ উচ্চারণ করার কারও হিম্মত হতো না। নারী আন্দোলনের শিংগার ধ্বনিতের হারিয়ে যেত যে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ। ইকবাল লেখাপড়া করেছেন ইউরোপ। তাঁর অবশিষ্ট জীবন কেটেছে নারী স্বাধীনতার আর সমানাধিকার সংগ্রামের পবিত্র ভূমিতে। নারী বিপ্লবের তপ্ত বাতাস ইকবালের জীবনকে অতিষ্ঠ করে ফেলবার উপক্রম করেছিল বটে। কিন্তু ইকবাল হোঁচট খাননি। তাঁর চিন্তা ব্যাহত হয়নি। পরাজয় বরণ করেনি তার আদি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিশ্বাস আধুনিক কালের ভঙ্গুর স্লোগানের কাছে। অপরিপক্ব অযৌক্তিক বোঝাপড়া করতে সম্মত হয়নি।

ইকবাল নারী বিপ্লবে প্রকম্পিত ইউরোপে বসে বরং অবলোকন করেছেন ভিন্ন দৃশ্য যে দৃশ্য স্থান পায়নি অন্য অনেকের দৃষ্টিতে। ইকবাল দেখেছেন, প্রাচ্যের দেশগুলোতে সর্বত্র কেবল বিশৃংখলা। কোথাও বাঁধন নেই। নিয়ন্ত্রণ নেই। মানবতার মৃতদেহগুলো সেখানে লা-ওয়ারিস হয়ে পড়ে আছে। এই বিশ্বাসভেজা দৃশ্য ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইকবালের চেতনাকে করেছে আরও শাণিত। তাঁর ঈমানকে দিয়েছে অবিনশ্বরতা। ইকবাল খুঁজে পেলেন, পশ্চিমা নারী আর মুসিলম নারী এক নয়। একজন মুসলিম নারী কখনো কোন পশ্চিমা নারীর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করতে পারে না, বরং এড়িয়ে চলা তার জন্যে অনিবার্য। ইকবালের দৃষ্টিতে কোন নারীর জীবনে শৃংখলা ও প্রতিষ্ঠা আসতে পারে না, যদি তার মধ্যে নারীত্ব, সাধুতা, পবিত্রতা, সততা ও মায়ের মমতা না থাকে এবং যে সম্প্রদায় এ কথাটি জানে না, বিশ্বাস করে না, সে সম্প্রদায়ের জীবনে কখনো প্রতিষ্ঠা আসবে না। তারা আজীবন বিশৃংখলা-ক্ষত, পরাজিত এক দুর্বল সম্প্রদায় হিসেবে বেঁচে থাকবে। ইকবালের ভাষায় ঃ

جہاں رامحکمی ازامہات است

نہاد ستاں امین ممکنات است

اگایں نکتہ راقولی نداند ۔

نظام کاروبارش بی ثبات است

কবি ইকবাল মনে করেন, তাঁর জীবনের সকল উন্নতি, সচেতনা, চেতনা, বিশ্বাস-চিন্তা-বেদনা সবই তাঁর মায়ের তরবিয়তের ফসল। তাঁর মায়ের আত্মিক পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার অবদান। তিনি বলেন, আমার মধ্যে ঈমান ও ভালোবাসার যে জ্যোতির্ময় দীপ্তি নজরে পড়ে এটাই আমার তাপসী মায়ের দৃষ্টিতে বরকত। আমি যা কিছু পেয়েছি তাঁর কোলেই পেয়েছি, তাঁর তরবিয়তের মধ্যেই পেয়েছি। পাঠশালা আমাকে অন্তর্দৃষ্টিও দেয়নি, দেয়নি কোন ব্যথিত হৃদয়, বেদনাশীল অন্তর। এই সম্পদ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে আছে কিছু গল্প-কাহিনী। ঈমান ও ব্যথা অনুভব করার মত অন্তর তো কেবল সেই পেতে পারে, যার তরবিয়ত ও লালন-পালন হয়েছে কোন ঈমানদার মায়ের কোলে। ইকবালের ভাষায় ঃ

مرااواین خرد بودرجنبو نی
مکاه ماد رباك اندرونی
زمکتب جشم ودل نتوان گرفتن
که مکتب نیست جزسحرو فسوے

ইকবাল মুসলমান নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, পশ্চিমা সভ্যতা যুবক পটানোর যে কৌশল ও সংস্কৃতি এবং ভিন পুরুষকে কুপোকাত করার কলা-শিল্প নারীদেরকে শিখিয়েছে, তা কোন মুসলিম নারীর ভূষণ হতে পারে না। তিনি নারীদের উদ্দেশে আরও বলেছেন, যে সব ফ্যাশন আর রূপচর্চা মুসলমান দেশগুলোতে এখন নন্দিত আর্ট হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে, এ সবেরও তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। গাঁজা আর পাউডারের সৌন্দর্যের প্রতি যেন তোমাদের আত্মার আকর্ষণ না হয়। কারণ তোমার মর্যাদা, তোমাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব ওই মেকী রূপ লাবণ্যে নেই। সে তো তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির মধ্যে নিহিত। যে নারীর মন পবিত্র, সে তো প্রকৃত সুন্দরী।

আল্লামা ইকবাল আরও বলেন, সৌন্দর্য আর রূপের জন্যে তো উলঙ্গপনা শর্ত নয়! এই নব্যযুগ ও সভ্যতার কাছে কিছুই নেই। তাই সে উলঙ্গপনাকেই সম্মান ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে! আল্লাহর নূর ও আলোকে দেখ। কত শত সহস্র পর্দার ভেতরে তাঁর অবস্থান, অথচ সেই আলোয় উজ্জালা সারা জাহান। মুসলিম নারীদেরকেও এমন গুণে গুণান্বিত হতে হবে; তাদের আত্মাকেও আলোকিত করে তুলতে হবে এমন সব আমালাত ও পূর্ণতায় যাতে পর্দায় থেকেও তারা মানবতাকে উজ্জীবিত করতে পারে, ভাস্বর করতে পারে।

কবি ইকবাল বিশ্বাস করেন, যদি মুসলিম নারীদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী গুণাবলী থাকে, তাহলে তারাই হবে মানবতার লালনকারী অভিভাবক বন্ধু। মানবতা সর্বদায় তাঁদের প্রতি মুখাপেক্ষী। সভ্যতা আসে, বিকশিত হয়, বিস্তৃতি ঘটে, আবার হারিয়েও যায়। কিন্তু মুসলিম নারী মানবতার এমন এক বৃক্ষ, যা কখনো বিরান হয় না, যা সদা ফলবান।

কবি মুসলিম নারীদের আরও বলেছেন, তোমার স্থান কিন্তু হৈ-হাঙ্গামা-তাড়িত মাঠ-প্রান্তর নয়। কল-কারখানা তোমার নিবাস নয়। তুমি যদি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে জীবিকার সন্ধান লেগে যাও, তাহলে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয় যা মানবতার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে। হে নারি, তোমার সৌভাগ্য তো এখানে, তুমি নবীনন্দিনী ফাতেমার পথে চলবে। স্বামীর ঘর আবাদ করবে। স্বামীকেই বানাবে চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্যবিন্দু। স্বামীর ঘরে বসে এমন সন্তান গড়ে তুলবে, যারা মুসলমানদের দুর্দিনের কাণ্ডারী হবে। ইসলাম ও মুসলমানের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেবে অকুণ্ঠ চিত্তে। এখন ইসলাম বড় অসহায়। ইসলামের জন্যে হাসান-হুসাইন (রা.) প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কেবল মুসলিম জননীরা।

ডক্টর ইকবাল মনে করেন, মুসলিম জাতির দিন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা অনেক বড় অবদান রাখতে পারে। নারীর মধ্যে আল্লাহতা'আলা এমন শক্তি, বিশ্বাস ও দরদ দিয়েছেন সে চাইলে এখনও মুসলিম জাতির ধমনীতে ঈমানের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। ইকবাল তো ইসলামী ইতিহাসের সেই কাহিনী ভুলতে পারেন না এবং কোন মুসলিম নারীরও ভোলা উচিত নয়। কাহিনীটি হলো—এক উজ্জ্বলমতি আরব্য নারী। প্রাণ খুলে কোরআনে তিলাওয়াত করছিল। তাঁর সে হৃদয়স্পর্শী তিলাওয়াত এক কঠিন কাফের মানুষের আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তার বিশ্বাসের রুদ্ধ ঈমানী আলো মুসলিম উম্মাহকে দান করেছিল। হযরত উমরের (রা.) মত দৃঢ়চেতা, প্রত্যয়ী, বীরযোদ্ধা আমীরুল মুমিনীন; বিজেতা রাহবর যাঁর মাধ্যমে উন্নতি ও বিজয়ের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। প্রাণে প্রশান্তি জেগেছিল নবীজীর।

এই কাহিনী তো সকলেই পড়ে। হযরত উমর (রা.) তলোয়ার হাতে ইসলামের মূলোৎপাটনের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হন। সংবাদ পান বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কথা। ভাবেন তাঁদেরকেই আগে শায়েস্তা করা দরকার। হাজির হন বোনের ঘরে। কিন্তু বোনের ঈমান-ধোয়া কোরআন তিলাওয়াত উমরের (রা.) মনকে মোমের মত গলিয়ে দেয়। হৃদয়ে আসন পাতে ইসলাম মহাসমাদরে। ইকবালের কামনা, বর্তমান বিশ্ব আজ এমন নারীই কামনা করে। এই নারীর আজ বড় প্রয়োজন।

ধর্মনিষ্ঠ ও ধর্মহীন সরকার

[১৯৪০ সালের কোন এক সময় বাদশা সাউদ-এর নিকট আল্লামা নদভীর লিখিত পত্র।]

ধর্মহীন সরকার মূলত একটি উন্নত, সুসংগঠিত ও সুরক্ষিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের সরকার বাস্তব ক্ষেত্রে জনগণের উপকারের জন্য নয় বরং নিজেরা উপকৃত হওয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠিত। মানবতার চারিত্রিক পয়গাম ও সংস্কারমূলক কোন প্রোগ্রামই তারা হাতে রাখে না, দেশ বা জাতির চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানুষকে সত্যের প্রতি হিদায়ত দান ও মানবতার সঠিক খিদমতের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না, বরং সাধারণত দেখা যায়, আর্থিক আয়ের উৎস খোঁজাখুঁজি, সরকারী কর, ট্যাক্স ও দাবী-দাওয়াগুলো আদায় করে নেয়াই তাদের মূল লক্ষ্যবস্তু। এ লক্ষ্যেই তারা চরিত্র ও সম্মানের কোন নিয়ম-নীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, জাতির চারিত্রিক শিক্ষা-দীক্ষা ও যাবতীয় মঙ্গল-কল্যাণকে তারা আর্থিক দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

মোট কথা সর্বক্ষেত্রে জীবিকা ও আর্থিক উপার্জনই তাদের মূল লক্ষবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ব্যাপক হারে ও সুসংগঠিত পদ্ধতিতে সুদী লেন-দেনে সব সময়ই মশগুল থাকে। সভ্য সুন্দর নামের লেবেলে জুয়ার মত ঘৃণ্য পেশার অনুমোদন দিয়ে দেয় নির্বিঘ্নে। শুধু নাম লেবেল পরিবর্তন করে নামে মাত্র কিছু সীমাবদ্ধতার সাথে অনেক অনেক চারিত্রিক অপরাধও সরকারী অনুমোদন লাভ করে থাকে।

মাদক দ্রব্যের শুধু অনুমোদনই নয়, বরং অনেক সময় মাদক দ্রব্যের ব্যবসা সরকার নিজের হাতেই পরিচালনা করে, এমন কি এর বিরুদ্ধে কোন কলা-কৌশল যদি কেউ ইখতিয়ার করে সরকার অনেক সাজা-শাস্তির মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করে।

সিনেমা, অশ্লীল ফিল্ম তৈরি বলতে গেলে যা বর্তমান অপরাধ জগতের প্রধান বস্তু এবং জাতির মধ্যে চরিত্রহীনতা ও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টির প্রধান নায়ক, একেও সরকার রাষ্ট্রীয় আয়ের বৃহত্তম উৎস মনে করে। এসব অশ্লীল কার্যকলাপের চারিত্রিক ক্ষতি ও ধ্বংস ক্রিয়াকে দেখে ও জেনেশুনেও সরকার এর প্রতিরোধ করে না।

রেডিও-টিভি তার সরকারী ট্রাইবুনাল, জাতির চারিত্রিক দীক্ষা ও শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে আনন্দোল্লাস ও ফূর্তি প্রচারণারই জিম্মাদারী পালন করে। এভাবে মানুষের মধ্যে মননশীলতা ও সঠিক রুচি-অভিরুচি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার কু-রুচি ও

মনোবৃত্তিকে এক সহায়তা করে চলে, আপন প্রোগ্রামগুলোতেও আনন্দঘন ভাবধারাই সৃষ্টি করে, শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম যন্ত্র হওয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লাসী যন্ত্র হিসেবেই সর্বমহলে বিবেচিত হয়।

এ ধরনের ধর্মহীন রাজত্বে চরিত্রের পাশাপাশি জাতির শারীরিক সুস্থতাও রক্ষা পায় না। কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমন এমন স্বাস্থ্যক্ষতিকর ঔষধও তৈরি করে থাকে যা পুরো দেশবাসীর স্বাস্থ্যকে শারীরিক দুর্বলতা ও রুগ্নতার শিকার করে দেয়। কিন্তু ঔষধের নামে এ ধরনের বিষ ব্যবসায়ীরা সরকারী কোন আমলাকে ঘুষ দিয়ে বা সরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোটা অংকের টাকা দিয়ে সরকারী ধরপাকড় থেকেও মুক্তি লাভ করে নেয়। মূলত এর পেছনে কারণ হলো এসব ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য নীতি, চরিত্র হিদায়ত ও সংস্কার সংশোধন কোনটাই নয়, বরং আর্থিক ফায়দা লুটা ও সচ্ছলতা অর্জনই হলো সরকারের মূল লক্ষ্য।

এ ধরনের রাজনীতির অনিবার্য ফলাফল এই হয়ে দাঁড়ায় যে, দেশের জনগণের চরিত্র দৈনন্দিন অবনতির দিকেই ধাবিত হতে থাকে এবং একটি ভয়ানক চারিত্রিক রোগ-ব্যাধিই পরিলক্ষিত হয় পুরা জাতির মধ্যে। জাতির প্রতিটি স্তরে ব্যবসায়িক মনোভাব, অর্থ সঞ্চায়ন ও খোসামোদীর মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সাধারণ পর্যায়ে লুটতরাজ বৃদ্ধি পায়, একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার হীন চেষ্টায় লিপ্ত থাকে এবং নীতি ও চরিত্রের ধারণায় সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

ধর্মহীন সরকারের বিপরীত হলো ধর্মপরায়ণ সরকার মূলত যে সব সরকার নববী তরীকা তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত নিয়ম-পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যবসার স্থলে মানবতার হিদায়তই হয় তার বুনিয়াদ। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) তাঁর এক কর্মকর্তাকে বললেনঃ (যিনি ধর্মভিত্তিক সরকার পরিচালনার কারণে রাষ্ট্রীয় আয়ের ঘাটতি ও আর্থিক অবনতির সমালোচনা করেছিলেন) সারা বিশ্বের অধিনায়ক মহান রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য হাদী তথা হিদায়তকারী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তহসীলদার ও অর্থ উসূলকারক হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয় নি।" মূলত তাঁর এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ধারা ফুটে উঠেছে।

একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের পুরো লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে সাধারণ জনগণের ধর্ম, চরিত্র ও তাদের পরকালীন লাভ-লোকসানের প্রতি। ট্যাক্স, কর আদায় ও আর্থিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধি একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের মৌলিক কাজ হতে পারে না,

বরং এগুলো এর দ্বিতীয় স্তরের কাজ এবং এগুলো দেশের সংস্কার, দ্বীনী প্রোগ্রামগুলোর পরিপূর্ণতা ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলার মাধ্যমে বিবেচিত হতে পারে। একটি ধর্মপরায়ণ সরকার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে ধার্মিকতার প্রতিই গভীর লক্ষ্য রাখে, ধর্মীয় ও চারিত্রিক নীতিমালাকে জাগতিক ফায়দা ও কল্যাণের ওপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, এ ধরনের রাজত্বের আন্তঃসীমানায় সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ্যপান, জিনা-ব্যভিচার, গুনাহ্ ও নাফরমানী সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও এসব কিছুই সুমদয় উৎসাহী-উদ্যোগী বস্তুগুলোও এমন আর্থিক কার্যকলাপ-যদ্দারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপকারিতা অর্জিত হলে সমাজ বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক লোকসানই সাধিত হয়–এগুলো সবই রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ এবং সরকারী আইনের বরখেলাপই বিবেচিত হয়, যদিও এ দ্বারা সরকারের বৃহত্তম আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় এবং সরকারকে বৃহত্তম পরিমণ্ডলের অর্থায়ন হতে মাহরুম থাকতে হয়।

একটি ধর্মপরায়ণ সরকার দেশে এমন কিছু সংস্কারমূলক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে থাকে, যা শুধু জাতির দৈনিক কাজের সাথেই সম্পর্ক রাখে না, বরং পুরো জাতির ভাবধারা ও মনোভাবের সাথেও সম্পর্ক রাখে। কারণ চারিত্রিক ভাবধারাই দৈহিক কাজকর্মের আয়োজন যোগায়; অতএব, চারিত্রিক ভাবধারায় যদি মানুষের সৎ ও উন্নত না হয়, তাহলে দৈহিক কাজকর্মের সংশোধন, অপরাধ ও চরিত্রহীনতার দরজা বন্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ চারিত্রিক ভাবধারা উন্নত হওয়া এমন কিছু বিষয়কে বাধা আরোপ করে থাকে, যা মানুষের মধ্যে চরিত্রহীনতা, আইন লংঘন, প্রবৃত্তিপূজা ও বিলাসিতা পূজার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং এমন কিছু ব্যক্তিবর্গকে অপরাধী ও দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করে তোলে যারা মানুষের মধ্যে লজ্জাহীনতা, পাপ ও গুনাহ্ প্রীতির জন্ম দেয়, যদিও তারা জ্ঞানী হোক, ব্যবসায়ী হোক বা শিল্পী ধ্যান-ধারণার লোক হোক। একটি ধর্মপরায়ণ সরকারকে নিরাপদ অবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় এন্তেজাম ও শৃঙ্খলার সাথে সাথে চরিত্র সভ্যতার জিম্মাদারী পরোপুরি বহন করে নিতে হবে। কারণ একটি ধর্মভক্ত সরকার শুধু একজন পুলিশ ও চৌকিদারের দায়িত্ব পালন করে না, বরং মানুষের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মুরুব্বী ও অভিভাবক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করে।

সাধারণত এ ধরনের একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের পরিণাম ফলাফল তাই হয়, যা পবিত্র কুরআনে প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির সাহাবাদের সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎ বাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

"তারা ঐ সমস্ত (মজলুম) মুসলমান, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী করলে তখন তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রতিটি কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।"
[সূরা ঃ হজ্জ ঃ ৪১]

ধর্ম ও সভ্যতা ঃ যুগে যুগে

যে কোনো সভ্যতার নিজস্ব রূপ ও স্বকীয়তা রয়েছে। যেমন ইসলামী সভ্যতার আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি ভোগবাদী গ্রীক ও রোমান ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য খ্রীস্টীয় সভ্যতারও রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত ও সংক্রমিত ধর্মহীন গ্রীক রোমান উপাদানাবলী থেকে তাকে আলাদা করার উপায় নেই। অনুরূপ যে মুসলমান এ সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে অযাচিত অনুগত ও ভক্তের ন্যায় তার সব কিছু গ্রহণ করবে অচিরেই সে যে একটি অনৈসলামী সভ্যতার অতল গহ্বরে নিপতিত হয়ে তা ভুলে যেতে বাধ্য হবে। যুগে যুগে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে দেদীপ্যমান। যেমন বর্বর তাতারীদের ইতিহাসে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যখন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত মুসলিম বিশ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ল, নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে হত্যা ও যখমের বাজার গরম করল এবং মুসলিম উম্মাহকে চরমভাবে অপমানিত করল তখন একটি প্রবাদ চালু হলো, "যদি বলা হয়, তাতারীরা পরাজয় বরণ করেছে তা তুমি বিশ্বাস কর না।" এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম বিশ্বের দেহে ও মননে তাতারীদের কী গভীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিরাজ করেছিল! কিন্তু পরবর্তীতে কেন তারা ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করল? এতে কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল? মূলত তাদের এ আমূল পরিবর্তনের দু'টি উপকরণ কাজ করেছে! (১) নির্মোহ ও স্বেচ্ছাচারমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি যা হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মুত্তাকী বান্দাদের পূত-পবিত্র হৃদয় জগতে প্রোথিত ছিল; (২) কোনো সভ্যতা নয়, ধারালো তরবারির সাথে কিছু চৈনিক জাহেলী কুসংস্কার বহন করত অসভ্য তাতারীরা; তাদের জীবন যাত্রায় সভ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতার কোনো বালাই ছিল না। তারা যখন উৎকর্ষের বিশালতা ও গভীরতায় সুশোভিত সভ্যতার মুখোমুখী হলো, স্বভাবতই তার প্রতি বিমোহিত ও অনুগত হয়ে পড়ল। নির্মল ইসলামী সভ্যতা মূর্খ তাতারীদের

এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তার সিঁড়ি বেয়ে সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করল। নিঃসন্দেহে একটি মানব ইতিহাসে এক বিরল ও অবিস্মরণীয় অধ্যায় যার সঠিক ও পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত ইতিহাস দিতে পারেনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাঘা বাঘা বিদ্বান এর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বার বার হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন! নিঃসন্দেহে তাতারীরা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করেছিল একমাত্র ইসলামী সভ্যতার মোহনী শক্তির প্রভাবে। কারণ তখনো তারা বেদুঈন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। শৈশব অতিক্রম করেনি তাদের সভ্যতা। তাই যখন তারা সেই উন্নত মুসলিম বিশ্বে ঢুকে পড়ল যা সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌড়ে অনেক এগিয়ে গেছে তখন তারা অবলীলায় ইসলামী সভ্যতার প্রতি দারুণভাবে ঝুঁকে পড়ল। তখন বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। মুসলমানরা বিস্মিত হলো তাতারীদের অদম্য বিজয়ে আর তাতারীরা বিস্মিত হলো ইসলামী সভ্যতার অনন্য রূপ দর্শনে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার প্রতি অনুগত হওয়া যে কোন জাতির অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে সেই বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে স্বীয় অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়া।

সুতরাং ভ্রাতৃমণ্ডলি, আপনাদের বলতে চাই, সভ্যতার বিষয়টি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর পরিণামের দিক দিয়েও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গুরুত্ববহ ও স্পর্শকাতর। আমরা তথা মুসলিম উম্মাহ এখন জীবনের একটি কঠিন সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছি। আর তা হলো আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছু ভাল মন্দ যাচাই না করে সর্বক্ষেত্রে সমানে গ্রহণ করে চলেছি। কোন্‌টি খাঁটি, কোন্‌টি ভেজাল বা ত্রুটিপূর্ণ তা পরখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। খানার টেবিলে অনাহূত ব্যক্তির মত তার অথৈ সাগর থেকে অঞ্জলি ভরে নিচ্ছি এবং চতুর্দিক থেকে তার উত্তাল তরঙ্গরাজি আমাদের গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য ভয়াবহ পরিণতির ঝুঁকি রয়েছে।

হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করুন। আমি ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে কোনো সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের আশংকা করছি। পাশ্চাত্য জগত যখন দেখল, মুসলমানরা দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তখন তারা তাদের পুরাতন অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়। ধর্মে ওপর আক্রমণ থেকে তারা অসংখ্য অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছে, মুসলমানদের আক্বীদা বিশ্বাসের পেছনে পড়া ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে এবং তাদের সমূহ প্রচেষ্টাও সুদূরপ্রসারী ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিকল্প হিসেবে মুসলিম বিশ্বের ওপর সভ্যতা চাপিয়ে দিয়ে পরিতুষ্ট হয়েছে। আমাদের আক্বীদা স্পর্শ করা থেকে বিরত রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তারা যেন বলছে যাকে ইচ্ছে পূজো কর, যাকে ইচ্ছে বিশ্বাস কর, যা হতে চাও হও, যা পড়তে চাও

পড়ো, কোনই বাধা নেই, তবে হ্যাঁ, এটা আমাদের সভ্যতা। আমাদের মতো হয়ে জীবন যাপন করো। আমাদের স্টাইলে পানাহার করো, পরিধান করো, হোটেল, মোটেল, ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা তথা তাবৎ নির্মাণ অবকাঠামো আমাদের মডেলে তৈরি করো, তাতে ইসলামী সভ্যতার কোনো নিদর্শন ও ইসলামী ঐতিহ্যের কোনো নমুনা থাকবে না এবং থাকবে না ইসলামী শরীয়তভিত্তিক পায়খানা, প্রস্রাব ও ওজু-গোসলের কোনো ব্যবস্থা। কেননা তারা বুঝতে পেরেছে, মুসলিম বা আরব বিশ্ব যদি ধর্মহীন পাশ্চাত্য সভ্যতার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সিংহ ভাগ হারিয়ে ফেলবে এবং সীমিত পরিসরে ও নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যেই শুধু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যেমন সে মসজিদেই মুসলমান থাকবে শুধু নামাজ-দোয়া পড়বে, ইবাদত করবে কিন্তু যখন সে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ীর শরণাপন্ন হবে, হোটেল-মোটেলে অবস্থান করবে, তখন বোঝার উপায় থাকবে না সে একজন মুসলমান। তবে হ্যাঁ, যদি নাম জিজ্ঞেস করা হয় উত্তরে একটি চমৎকার আরবী নাম নিয়ে বলবে, আমি অমুকের ছেলে অমুক। সর্বসাকুল্যে এ নামটিই যেন তার মুসলমান হওয়ার একমাত্র দলীল! এটাই হচ্ছে নতুন কৌশল যা পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর উদ্ভাবন করেছে। এ কৌশলের মাধ্যমে তারা মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসারীতে পরিণত করেছে। এখন তারা মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেয় এমন কথা বলছে না, বরং সুললিত কণ্ঠে বলছে, এইতো ইসলাম ধর্ম! একেবারে নিখুঁত! যেভাবেই আপনারা চান সেভাবেই সংরক্ষিত। কুরআন তো আপনাদের হাতেই! ইচ্ছামত বিদ্যা শেখো, ইবাদত বন্দেগী করো, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যুগোপযোগী মডেল সভ্যতা হিসেবে একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই মেনে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে আজকের মুসলিম বিশ্বের ভয়াবহ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

আমার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত যে ব্যথা আমাকে সব সময় তাড়া করছিল তা প্রকাশ করে প্রশান্তির নিশ্বাস নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম কোনো আরব দেশীয় শহরে একটি ইসলামী সম্মেলনে। তখন আরব শ্রোতাদের উদ্দেশে আমার সেই ব্যথার কথা বলেছিলাম এবং তা বলার আমার অধিকারও ছিল। আরব ভাইয়েরা, আপনারা আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, আপনাদের বাধ্য করার কেউ নেই। কোনো দেশ ও শক্তির করতলে নন আজ। নতুনভাবে সমাজ গড়ার অধিকার আপনাদের রয়েছে। সমাজ সভ্যতা ও সার্বিক জীবন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছেন যথেচ্ছা। কিন্তু কে আপনদেরকে এত প্রচণ্ড বেগে ও তীব্রভাবে সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কল্যাণকর ও শান্তি-শৃঙ্খলার ধারক-বাহক

শাসতে কিছুই নেই, অথচ মহান আল্লাহ আপনাদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, বরং আজ পাশ্চাত্য জগত আপনাদেরই মুখাপেক্ষী । কেন আপনারা নিজেদের ইচ্ছা ও আগ্রহকে অন্তত নিজেদের দেশে ব্যক্ত করছেন না? আমি তো সেই শুভক্ষণের প্রত্যাশায় রয়েছি, যখন আমরা মুসলমানরা নিজেদের পছন্দ ও আগ্রহ পশ্চিমাদের ওপর চাপিয়ে দেব। কিন্তু সেই সময় এখনো আসেনি। তাই কেন অন্তত আমাদের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের দেশ, সমাজ-সভ্যতায় ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না,? সুন্দর ইসলামী ধাঁচে আমরা নির্মাণ অবকাঠামো সৃষ্টি করতে পারি। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাহজীব-তামাদ্দুনের সাথে সংগতিপূর্ণ ইসলামী মডেলে হোটেল-মোটেল নির্মাণ করা যায়, যা ওজু-তাহারাত, নামাজ ও জিকির-আসকারের সহায়ক হয়। পরিবেশ ভাল-মন্দ দুটিরই উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু এসবের পরিবেশ মঙ্গলময় ও আল্লাহর জিকিরের সহায়ক হবে। মানুষ স্বভাবত আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু যখন সে এ ধরনের পরিবেশে পদার্পণ করে এবং তার নির্মলতায় সিক্ত হয়, তখন আল্লাহর কথা, পরকালের কথা মনে পড়ে, এমন অবস্থাই ছিল ইসলামের স্বর্ণ যুগে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র নগরী মদীনা মুনওয়ারা বা অন্য যে কোনো ইসলামী শহরে প্রবেশ করতেই ইসলামের স্নিগ্ধতা ও সৌরভে যে কারো অন্তরাত্মা ভরে যেত। নাকে তার সুঘ্রাণ নিত। হাতে স্পর্শ করত, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করত। অতঃপর এক জগত থেকে অন্য জগতে এবং এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে বয়ে নিত। এভাবেই ইসলামের ধারণা অর্জন ও তার মধ্যকার দূরত্ব কমে যেত এবং সহজ হয়ে যেত বরং ইসলাম মতে আমল করা তার কাছে অতি প্রিয় বস্তুতে পরিণত হতো। যখন সে ইসলামের এই মডেল টাউন সোসাইটি থেকে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করত ইসলামের একজন প্রাজ্ঞ প্রচারক ও অনুপম আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবেই প্রত্যাবর্তন করত, আজকের আরবের শহরগুলোর পরিবেশও সোনালী যুগের মতো হোক, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এর বিপরীত পরিবেশ নয় বা আমাদের তাহজীব ঐ তামাদ্দুনের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে আক্ষেপের বিষয় হলো কল্পনার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। বর্তমানে অতীতের স্বীকৃতি নেই। ফলে সুশীল সমাজ গঠন ও নিষ্কলুষ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ তথা মানব জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে ইসলামের সক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করা হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই যাকে চান সঠিক পথের দিশা তাকে দান করেন।

কাদিয়ানী মতবাদ ঃ ইসলাম ও নবুওয়তে মুহাম্মদী (সা.)-এর বিরুদ্ধে জঘণ্য বিশ্বাসঘাতকতা

আমি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এমন একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব যা প্রত্যেক মুসলমানেরই, তিনি যে কোন দেশেই অবস্থান করুন না কেন, মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবীদার।

বিষয়টি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর (বুনিয়াদী ভিত্তি) সাথে সম্পর্কিত। মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন, তাহলে এ সমস্যা এমন এক বিপদসঙ্কুল রূপ ধারণ করবে, যা গোটা ইসলামী জগত, এমন কি পুরো ইসলামী বিধানের জন্য গুরুতর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং যার ক্ষতি হবে অপূরণীয়।

ইতোপূর্বে (পাকিস্তানে) যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল, তা সকল জ্ঞানী-গুণী লোকদের মনোযোগকে কাদিয়ানী সমস্যার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কাদিয়ানী সংক্রান্ত যে বিষয়টি মানুষ ভুলতে বসেছিল, হাঙ্গামা তাদেরকে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিল। শুধু কি তাই? অনেকে তো আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আসলে কাদিয়ানী সমস্যা কি এতই গুরুতর ও বিপদসঙ্কুল, যা সমগ্র মুসলিম জাতির মনোযোগ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে?

কিন্তু এতে কিছুই করার ছিল না। মূলত সমস্যাটি তার নিজস্ব ভাবধারায় এ গুরুত্ব পাওয়ার দাবীদার। ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন লোকদের ঐদিকে দৃষ্টি দেয়া অবশ্যই যথার্থ। কেননা মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি অস্বস্তিকর বিষয়।

খুব কম লোকই এর আসল প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত আছেন, সমস্যাটির আসল গুরুত্ব কি? ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে এর সম্পর্ক কতটুকু গভীর?

এ দ্বন্দ্ব কোন ফেরকা সৃষ্টি করা, সংকীর্ণতা ও মাযহাবী সাম্প্রদায়িকতার বীজ নয়, যেমনটি কারো কারো ধারণা।

বরঞ্চ নির্ভেজাল খালেস ইসলামী স্বার্থ ও মুসলমানদের যিন্দেগীর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আসুন, ইতিহাস ও জ্ঞানের নিরিখে তা নির্ণয় করা যাক। জ্ঞান-গবেষণায় ও ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত, কাদিয়ানী মতবাদ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক গর্ভের জারজ সন্তান। ব্যাপারটি হলো এই, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

চতুর্থাংশ হিন্দুস্থানের বিখ্যাত ও সুপরিচিত বীর মুজাহিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (মৃত্যু-১২৪৬ হিজরী, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের যে আন্দোলন শুরু করেন, তাতে মুসলমানদের মাঝে জিহাদের ও কোরবানীর স্পৃহা আগুনের মত জ্বলে ওঠে। আল্লাহর পথে ইসলামী বীরত্ব প্রদর্শন ও প্রাণ উৎসর্গ করার ঐতিহ্যবাহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজারো মুক্তিপাগল মানুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদের বিদ্রোহের পতাকাতলে জমায়েত হন। এমন অভ্যুত্থানের জোয়ার বৃটিশ সরকারের জন্য অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা ও শংকিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে সুদানে শায়খ মোহাম্মদ সুদানী জিহাদের ডাক দেন। তাতে সুদানে বৃটিশ ক্ষমতার কম্পন শুরু হয়। তারা এটা ভাল করেই জানত, বিদ্রোহের এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একবার যদি জ্বলে ওঠে, তাহলে এটা নির্বাপিত করা আর সম্ভব নয়।

অন্যদিকে সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানীর ইসলামী ঐক্যের আন্দোলন দিকে দিকে প্রসার এবং মুসলমানদের মাঝে তা গ্রহণযোগ্য হতে দেখে তার আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে বৃটিশ শোষকগোষ্ঠী মুসলমানদের চরিত্র, প্রবণতা ও দুর্বলতার ওপর ব্যাপক সমীক্ষা ও গবেষণা চালায়। তারা বুঝতে পারল, প্রকৃতিগতভাবে মুসলমানগণ ধর্মভাবাপন্ন। ধর্মই তাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারে, আর ধর্মই তাদেরকে শান্ত করে দিতে পারে।

অতএব, মুসলমানদেরকে দমন ও নিস্তেজ করে দেয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের আক্বীদা, ধর্মীয় চেতনা ও মন-মানসিকতার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

ধর্মীয় পথ ছাড়া মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে বৃটিশ সরকার এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করল, মুসলমানদের মধ্য থেকেই কোন এক ব্যক্তিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পদবীর ছত্রছায়ায় আত্মপ্রকাশ করাতে হবে যাতে করে সাধারণ মুসলমানগণ অধ্যাত্ম চেতনায় ভক্তি সহকারে তার দরবারে এসে সমবেত হয়।

ঐ ব্যক্তি অনুসারীদের বৃটিশ সরকারের অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করার এমন শিক্ষা দেবে যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইংরেজদের আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকবে না, পরিকল্পনা মাফিক যাতে করে অবদমিত হয়ে যায় বিদ্রোহের চেতনা।

এটা ছিল বৃটিশ সরকারের একটি চক্রান্ত। কেননা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি পরিবর্তনের দ্বিতীয় কোন পন্থা এর চেয়ে বেশী কার্যকরী ছিল না।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর, যে ছিল মানসিক অস্থিরতা ও হতাশার শিকার, মাঝে একই সময় তিনটি এমন জিনিসের সমাবেশ ঘটিয়েছিল, যা দেখে

কোন ঐতিহাসিক এ সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারতেন না, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও আসল কারণ কোন্‌টিকে বলা যেতে পারে, যার ভিত্তিতে লোকটি এসব কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো হচ্ছে :

ক. ধর্মীয় নেতৃত্বে পৌঁছা এবং নবুওয়তের নামে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে প্রভাব বিস্তার।

খ. তার ও তার অনুসারীদের বইপত্রে বারবার আলোচিত আজব আজব ধ্যান-ধারণার উল্লেখ দেখা যায়।

গ. অস্পষ্ট ও গোলমেলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, স্বার্থসিদ্ধি ও বৃটিশ সরকারের প্রতি অপরিমিত আনুগত্য।

সে মনে মনে তীব্রভাবে এমন একটি ধর্মের প্রবর্তক হওয়ার আশা পোষণ করত, যার কিছু অনুসারী হবে, কিছু লোক তার ওপর ঈমান আনবে এবং ইতিহাসে তার নাম ও মর্যাদা তেমনই হবে, যেমনটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর।

ইংরেজরা এ কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান পেল। বলা যায়, তার চরিত্রে একজন এজেন্টের চরিত্র পাওয়া যায়, যে তাদের স্বার্থে মুসলমানদের মাঝে কাজ করবে।

অতএব, সে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কর্মতৎপরতা শুরু করল।

প্রথমে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক (Renovator) হওয়ার দাবী করল। তারপর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ইমাম মাহদীতে পরিণত হলো। কিছুদিন পর প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার সুসংবাদ পেয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত নবুওয়তের সিংহাসনে সমাসীন হলো।

এভাবে ইংরেজরা যা চাচ্ছিল তা পূর্ণ হলো। কাদিয়ানী এ লোকটি চমৎকারভাবে তার অভিনয় করে। ইংরেজরাও তার পৃষ্ঠপোষকতায় কোন ত্রুটি করেনি। অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ কাজে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা তারা তাকে প্রদান করে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও বৃটিশ সরকারপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, তাদের একক ও ব্যাপক উপকারের কথা ভুলে যায়নি, বরঞ্চ এ কথা সে সব সময় স্বীকার করত, তার তথাকথিত যশ ও খ্যাতি একমাত্র বৃটিশ সরকারেরই অবদান।

তাই দেখা যায়, সে তার এক প্রবন্ধে নিজেকে বৃটিশ সরকারেরই "স্ব-উৎপাদিত বৃক্ষ" হিসেবে পরিচয় দেয়।[১]

১. ১৮৯৮ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের গভর্নরের কাছে লিখিত "আবেদনপত্র"। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মীর কাশেম আলী লিখিত "তাবলীগ ও রেসালাত", ৭ম খণ্ড।

অন্য স্থানে নিজের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে গিয়ে সে লেখে, "আমার জীবনের বৃহত্তম অংশ বৃটিশ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় ব্যয়িত হয়েছে। আমি জিহাদের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এত বেশী বইপত্র লিখি এবং ইশতেহার প্রচার করি, যদি সেগুলো একত্র করা হয়, তাহলে পঞ্চাশটি আলমারী তা দ্বারা পূর্ণ করা যাবে। এ বইগুলো আমি সমস্ত আরব দেশ, মিসর, সিরিয়া, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌছে দেই।"[১]

অন্য এক স্থানে সে লেখে–

"জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে আজ প্রায় ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কলম ও রসনাকে আমি নিয়োজিত রেখেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে। সেটা হচ্ছে, বৃটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতি, শুভেচ্ছা ও সত্যিকারের ভালবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে কম মেধাসম্পন্ন লোকদের হৃদয় থেকে জিহাদের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা, যা তাদেরকে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সম্পর্কের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।"[২]

উক্ত বইতেই একটু পরে সে লেখে ঃ

"আমি বিশ্বাস করি, আমার অনুসারীদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই জিহাদী চেতনায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কেননা আমাকে 'মসীহ' ও 'মাহদী' হিসেবে গ্রহণ করা মানেই জিহাদী উদ্দীপনাকে প্রত্যাখ্যান করা।"[৩]

অন্য এক স্থানে সে বলে ঃ

আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে আমি প্রচুর বই এ উদ্দেশ্যেই লিখেছি, এ সদাশয় (বৃটিশ) সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোনক্রমেই জায়েয নেই, বরং সর্বান্তকরণে তাদের আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানদের ওপর ফরয।

সুতরাং বহু অর্থ ব্যয় করে বইগুলো প্রকাশ করে ইসলামী দেশসমূহে পৌছে দেই। আমি জানি, এদেশেও (ভারতে) বইগুলোর অনেক প্রভাব পড়েছে। আমার সাথে যাদের মুরীদ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এমন একটি দলে পরিণত হয়েছে, যাদের অন্তরে (বৃটিশ) সরকারের অনুপম আন্তরিকতার আলোকে উদ্ভাসিত। তাদের চারিত্রিক অবস্থা অনেক উর্ধ্বে। আমি মনে করি, তারা সবাই দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ এবং সরকারের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।"[৪]

---

১. মীর্জা কাদিয়ানী লিখিত "তিরয়াকুল কুলুব", পৃষ্ঠা ১৫।

২. মীর্জা কাদিয়ানী রচিত "শাহাদাতুল কোরআন"- এর সংযোজন অধ্যায়, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০।

৩. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৭।

৪. তাবলীগ-ই রিসালাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫, মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পক্ষ হতে মহিমান্বিত বৃটিশ সরকারের প্রতি বিনীত আবেদন।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এ আন্দোলন বৃটিশ সরকারের জন্য অনেক নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা, বিশ্বস্ত বন্ধু ও আত্মউৎসর্গকারী এজেন্টের জন্ম দিয়েছে। এ দলের বাছাই করা কিছু লোক ভারতের ভেতরে ও বাইরে ইংরেজ সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দেয় এবং এজন্য তারা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

যেমন, আব্দুল লতীফ কাদিয়ানী। সে আফগানিস্তানে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার ও জিহাদের বিরোধিতা করে আসছিল। আফগান সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। কারণ তার প্রচারণার কারণে এ আশঙ্কা দেখা দেয়, জিহাদী প্রেরণা ও যুদ্ধোৎসাহী হিসেবে বিশ্ব জুড়ে আফগান জাতির যে সুপরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এভাবে মোল্লা আব্দুল হালীম কাদিয়ানী ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানীও ইংরেজ সরকারের স্বার্থেই আফগানিস্তানে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

কেননা আফগান সরকার তাদের কাছ থেকে এমন কতগুলো চিঠি ও কাগজপত্র উদ্ধার করে, যাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তারা বৃটিশ সরকারের এজেন্ট ছিল এবং আফগান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ১৯২৫ সালে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে এ তথ্য প্রকাশ করেন এবং কাদিয়ানীদের নিজস্ব মুখপত্র "আল ফযল" ১৯২৫ সালের ৩রা মার্চ সংখ্যায় এ প্রতিবেদন প্রচার করে এবং প্রাণ বিসর্জনের জন্য তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

তারই ভিত্তিতে এই কাদিয়ানীগোষ্ঠী তার যাত্রালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বদা সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদী বা দেশীয় আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জীবদ্দশায় যেমন তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি, তেমনি তার মৃত্যুর পরও তারা ঝাঁপিয়ে পড়েনি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে।

শুধু তাই নয়, ইংরেজদের মোড়লীপনার ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় তল্পীবাহকদের হাতে মুসলিম বিশ্বের ওপর অত্যাচারের যে স্টিমরোলার চালানো হচ্ছিল, তা তাদেরকে শোকের পরিবর্তে আনন্দ দিয়েছিল। সাধারণ ব্যবস্থা, ইসলামী বিষয়াদি অথবা রাজনৈতিক অনুভূতি ও ইসলামী প্রেরণার প্রতিফল হিসেবে সৃষ্ট আন্দোলন- এসব ব্যাপারে কখনও তাদের মাথা ব্যথা ছিল না। ধর্মীয় বাদানুবাদ ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিই ছিল তাদের কাজ।

মসীহ'র মৃত্যু, মসীহ'র জীবন, মসীহ'র অবতরণ ও মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াতের ওপর বিতর্কানুষ্ঠান পর্যন্ত তাদের উৎসাহ সীমাবদ্ধ ছিল।

ভারতের উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই কাদিয়ানী ফিত্‌নাকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখলেন। তাঁরা নিজেদের বক্তৃতা, লেখনী ও জ্ঞানের অস্ত্র দ্বারা এ ফিত্‌নার মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

আর এটা স্পষ্ট, এমন এক রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন সরকার যে নিজেই এই ফিত্‌নার উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠপোষক, তার যুগে তেমন বড় ধরনের কোন ঘটনাক্রমে নেয়া সম্ভব ছিল না। ইসলামী মুজাহিদদের মধ্যে চারজনের নাম শীর্ষে। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী (র.), মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (র.), লক্ষ্ণৌস্থ নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (র.), মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.), শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।

ইসলামী দলগুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যে দলটি এ বিদ্রোহী গ্রুপের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল, সে দলটির নাম হচ্ছে "মজলিসে আহরারে ইসলাম"।

দলটির সভাপতি ও প্রাণ ছিলেন মাওলানা সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী (র.)। ইসলামের গর্ব মহান চিন্তাবিদ আল্লামা ড. মোহাম্মদ ইকবালও তাঁদের সাথে ছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "কাদিয়ানী মতবাদ নবুওয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আল্লায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্ম-বিশ্বাস। তার অনুসারীরা ভিন্ন একটি সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় কখনও মহান ইসলামী উম্মাহর অংশ নয়।"

এটা সর্বজনবিদিত, ড. ইকবাল গোঁড়াপন্থী মৌলভী ছিলেন না। তিনি মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবীদের একজন এবং মুসলিম ঐক্যের প্রবল আবেগপ্রবণতায় বিশ্বাসীদের প্রথম সারির ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষপাতহীনতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা হচ্ছে এ ঐক্যের মূলনীতি। কিন্তু যেহেতু ড. ইকবাল মীর্জা গোলাম আহমদের অতি নিকটে অবস্থান করে তাকে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তার ধর্মীয় অভিসন্ধি ও রহস্য সম্পর্কে ওয়াফিকহাল ছিলেন, এজন্য তিনিও এ ফিত্‌নার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা অমুসলিম সংখ্যালঘু একটি জাতি হিসেবে ঘোষণা দেয়ার দাবী উত্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও আল্লামা ইকবাল দু'জন পাঞ্জাবের অধিবাসী। এখানে আমরা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতাসমূহ হতে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ভারতের বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র 'দি স্টেটস্‌ম্যান' একবার এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। আল্লামা ইকবাল তাতে একটি প্রতিবেদন পাঠান। তাতে তিনি লেখেন, "কাদিয়ানী মতবাদ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের সমান্তরাল একটি আলাদা নবুওয়াতের ভিত্তিতে একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশে নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতার নাম।"[১]

সে সময়েই ভারতের প্রখ্যাত নেতা, সাবেক প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ প্রশ্ন তোলেন, মুসলমানগণ কেন কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম থেকে আলাদা করে অমুসলিম ঘোষণার জোর দাবী জানাচ্ছে? অথচ কাদিয়ানীরাও মুসলমানদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত একটি সম্প্রদায়!

ভারতের দেশপূজক নেতা সাধারণভাবে কাদিয়ানী মতবাদকে পছন্দ করত। কেননা এ মতবাদ প্রসারিত হলে ভারতের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমানগণ তাদের কেবলা ও আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র হেজাযের পরিবর্তে ভারতকে বানিয়ে নেবে। ঐ নেতাদের ধারণানুযায়ী এর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের হৃদয়ে দেশপূজার ভিত অনেক দৃঢ় হবে।

যে সময় পাকিস্তানে কাদয়ানীবিরোধী আন্দোলন চলছিল, তখন ভারতের কিছু কিছু পত্রিকা কাদিয়ানীদের সমর্থনে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাদের পাঠকদেরকে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের সমর্থক ও তাদের সহযাত্রী বানানোর চেষ্টা চালায়।

এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা এও লেখে, পাকিস্তানের কাদিয়ানী ও মুসলমানদের এই দ্বন্দ্ব মূলত আরবী ও হিন্দী নবুওয়াতের দ্বন্দ্ব এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নবুওয়তের অনুসারীদের দ্বন্দ্ব।

তখন আল্লামা ইকবালই এর উত্তরে বলেন, "আমরা বিষয়টির ওপর এজন্য চাপ প্রয়োগ করছি, কাদিয়ানী আন্দোলন নবী আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত থেকে হিন্দী নবীর উম্মত করার প্রয়াসে লিপ্ত।" তিনি আরও বলেন, "ইয়াহুদী জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদেরই একজন বিদ্রোহী দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza)-এর আক্বীদা-বিশ্বাস যত মারাত্মক হতে পারে, ভারতে ইসলামী সামাজিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি এ কাদিয়ানী আন্দোলন তার চেয়েও বেশী মারাত্মক।"

আল্লাহ্ পাক খতমে নবুওয়তের আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ড. ইকবালের হৃদয়কে প্রসারিত করেছিলেন।

---

১. দি স্টেট্‌সম্যান, ১০ই জুন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

তিনি সুগভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, একমাত্র এই আক্বীদাই ইসলামের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা, উম্মতের সংহতি ও শৃঙ্খলার চাবিকাঠি। এ আক্বীদার বিরুদ্ধে চক্রান্ত, বিদ্রোহ কোন অবস্থাতেই শিথিল দৃষ্টিতে দেখার যোগ্য নয়। কেননা এ বিদ্রোহ ইসলামী প্রাসাদের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতের নামান্তর।

পূর্বে দি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাতে প্রেরিত যে প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তিনি লেখেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী"-এর আক্বীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে একক উপাদান, যা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মাঝে স্থায়ী সীমারেখা (Line of Demarcation) টেনে দেয়।

তারা মুসলমানদের সাথে তাওহীদের ব্যাপারে এই আক্বীদা পোষণ করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতকেও স্বীকার করে। কিন্তু ওহী ও নবুওয়তের পরম্পর বা সিলসিলার সমাপ্তি স্বীকার করে না। যেমন, ভারতে ব্রাহ্ম সমাজ। তখন এ আক্বীদাই হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি যার আলোকে কোন্ দল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা বহির্ভূত তা নির্ণয় করা যেতে পারে।

আমি ইতিহাসে মুসলমানদের এমন কোন দলের নাম জানি না, যারা এই সীমারেখা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। ইরানের একটি গোষ্ঠী 'বাহাইয়্যাহ' খতমে নবুওয়তের আক্বীদাকে অস্বীকার করে বটে, কিন্তু তারা একথাও স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়, তারা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় যে সম্প্রদায় সাধারণতভাবে প্রচলিত অর্থে মুসলমান নয়।

আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি, ইসলাম আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দ্বীন বা ধর্ম। কিন্তু একটি সোসাইটি হিসেবে অথবা একটি জাতি হিসেবে এর অস্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সুতরাং কাদিয়ানীদের সামনে দু'টি পথ রয়েছে।

হয় তারা বাহাইয়াদের অনুসরণে নিজেদেরকে মুসলিম মিল্লাত থেকে আলাদা করে নেবে নতুবা খতমে নবুওয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যার ভাষ্য হতে বিরত থাকবে।

অন্যথায় তাদের এ ধরনের রাজনৈতিক অপব্যাখ্যা তাদের মনে লুক্কায়িত মতলবের প্রতিই ইঙ্গিত করে, এরা কেবল সেই সকল সুবিধার লোভে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়, যে সুযোগগুলো শুধু মুসলমান নামের সাথে সম্পর্কিত। কেননা এছাড়া ঐ সুবিধাদি ও স্বার্থের কোন অংশই তারা পাবে না।

তিনি অন্য এক জায়গায় লেখেন ঃ

"কোন দল যারা সর্বজনবিদিত ও সাধারণভাবে পরিচিত ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এবং সে দলের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও মন-মেযাজ এক নতুন নবুওয়তের

অস্বীকারকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলে, সে দল ইসলামের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সব সময়ই তাদের ওপর মুসলমানের কড়া দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইসলামী সামাজিকতার ঐক্য একমাত্র খতমে নবুওয়তের আক্বীদার ওপর সীমাবদ্ধ।"

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তাধারাসম্পন্ন আল্লামা ইকবালের মত মহান ব্যক্তির ছিল এই ভূমিকা।

কিন্তু সময় এগিয়ে চলল। কাদিয়ানীরাও নিজেদের নিয়োজিত রাখল বিসংবাদ, অরাজকতা সৃষ্টিতে, বিতর্কানুষ্ঠানে, অবিশ্বাস ও সংশয়ের বীজ বপনে, অনিষ্ট চিন্তায় ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবায়।

তাদের সদর দফতর ছিল ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামে। বৃটিশের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়ায় তারা তাদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ তৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু কখনো তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে, কোন এক সময় বড় ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত হবে এবং এমন কোন তৈরী রাষ্ট্র তাদের কর্তৃত্বে এসে যাবে যার নিরংকুশ ক্ষমতা অর্জিত হবে। কারণ প্রথমত তারা রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়ত, তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য এবং তারা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চাপা পড়ে ছিল।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো এবং কাদিয়ানীরা, নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা কল্পনাও করতে পারত না, একবিন্দু রক্তপাত ছাড়াই তা পেয়ে গেল অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ক্ষমতার ওপর ঐ প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের পাকিস্তান নামের নতুন রাষ্ট্রে অর্জিত হয়েছিল। মীর্জা গোলাম আহমদ ও তার সাথীরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিল, মুসলমানদের যারাই এ নতুন ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারা কাফের। তাদের পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া জায়েয হবে না।

মোটকথা, তাদের সাথে কাফেরদের মত ব্যবহার করা উচিত। মীর্জা গোলাম আহমদের পুত্র মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ তার গ্রন্থ "আয়নায়ে সাদাকাত"-এ লেখে ঃ

সমস্ত মুসলমান যারা প্রতিশ্রুত মসীহ'র হাতে বায়আতে অংশ নেয়নি, যদিও তারা প্রতিশ্রুত মসীহ'র নাম না শুনে থাকে, তবু তারা কাফের এবং ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫।

মীর্জা বশীরুদ্দীন আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলে ঃ যেহেতু আমরা মীর্জা গোলাম আহমদকে নবী মানি এবং আহমদীরা তাকে নবী মানে না, সুতরাং কুরআনে কারীমের শিক্ষা অনুযায়ী যে কোন একজন নবীর অস্বীকার কুফরীর আলোকে অআহমদীগণ কাফের।[১]

সে এক বক্তৃতায় মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে মীর্জা আহমদের এ উক্তিটি বর্ণনা করেঃ

"আল্লাহ তাআলার সত্তা, রাসূলে কারীম (সা.), কুরআন, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়েই তাদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য আছে।"[২]

পক্ষপাতিত্বের সীমা এত দূর গড়ায় যে, যখন পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ইন্তেকাল হয়, তখন নিজস্ব আক্বীদার কারণে জাফরুল্লাহ খান তাঁর নামাযে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেনি। এ ছিল সে সমস্ত কারণ, যা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আকণ্ঠ ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা দেখলেন, ইসলামী প্রাসাদের অভ্যন্তর ঘুণে ছেয়ে যাচ্ছে এবং এটা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَايَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনের কোন ক্রটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেক গুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" (সূরা আল ইমরান-১১৮)-এর সরাসরি বিরোধী। তখন তারা বললেনঃ এ সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত এবং অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা। এটা হুবহু ঐ দা'বীই ছিল যেটা সর্বপ্রথম ড. ইকবাল উত্থাপন করেন এবং তিনি তাঁর লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে অত্যন্ত কঠোর দৃঢ়তার সাথে এরই প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন,

১. আল-ফযল, ২৬ ও ২৯ শে জুন, ১৯২২ ইং, ২. আল ফযল, ৩০ শে জুন, ১৯৩১।

"শিখরা হিন্দুদের প্রতি যত না বিদ্বেষী, কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামের প্রতি তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশী বিদ্বেষী। কিন্তু বৃটিশ সরকার শিখদেরকে অহিন্দু সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, অথচ তাদের উভয়ের মাঝে অসংখ্য সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বিদ্যমান। তারা পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে, অথচ কাদিয়ানী মতবাদ মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়া কাদিয়ানীদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"

তাদের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমানদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ককে এ বলে নাজায়েয ঘোষণা দিয়েছে, "মুসলমানদের উদাহরণ হচ্ছে নষ্ট দুধের মত, অথচ আমরা হলাম তাজা দুধের মত।"

আফসোস! ইসলামী বিশ্ব এখন পর্যন্ত কাদিয়ানী মতবাদের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয়। ইসলামী জগতে আজ কাদিয়ানী মতবাদ কেবল একটি ধর্মমত অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর নাম নয়, বরং মুসলমানদের জাতীয় সংহতিকে দরহম-বরহম বা তছনছ করে দেয়ার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আনীত ইসলামের বিরুদ্ধে এক ভয়াল বিদ্রোহ। কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামবিদ্বেষী এবং সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী।

কাদিয়ানী মতবাদ চায় আক্বীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-গবেষণা, অনুভূতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার দিগন্তে ইসলামের যে অবস্থান, তা সে পাক। আদম সন্তানের আনুগত্য, ভালবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তির যে বিপুল অংশ ইসলাম লাভ করেছে, তা তার দিকে ঘুরে যাক!

কাদিয়ানী মতবাদ পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে, মীর্জা আহমদ শুধু সাহাবায়ে কেরাম, মুসলিম মিল্লাতের শ্রদ্ধাভাজন আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ, মুজাদ্দিদ ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় জনই নয়, বরং অনেক মহান আম্বিয়া ও রাসূল (আলা নাবিয়্যীনা ওয়া আলাইহিমুস্ সালাম) অপেক্ষা বেশী মর্যাদাশীল ও পবিত্র। কাদিয়ানী মতবাদের দৃষ্টিতে পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান সাহাবায়ে কেরাম ও মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শিষ্যদের মাঝে কোন তফাৎ নেই।

মীর্জা গোলাম আহমদের পদমর্যাদা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর অনুরূপ, বরং এর চেয়েও অনেক বেশী। তার খলীফারা খোলাফায়ে রাশেদীনের সমকক্ষ!

তাদের শহর 'কাদিয়ান' মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে মক্কা মোয়াযযমা ও মাদীনাতুর রাসূলের সমপর্যায়ের। কাদিয়ানের হজ্জ মক্কা মোয়াজ্জমার হজ্জ হতে কোন অংশে কম নয়।

তাদের দ্বিতীয় খলীফা মীর্জা বশীরুদ্দীন মীর্জা গোলাম আহমদ সম্পর্কে লেখেন ঃ

"তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত অনেক নবীকেও ছাড়িয়ে গেছেন।"[১]

তিনি অনেক আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হতে পারে, তিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।[২]

মীর্জার শিষ্যদেরকে নবী করীম (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-গণের সমকক্ষ ঘোষণা করে লেখে, "অতএব, এ দু'দলের মাঝে পার্থক্য করা বা এক দলকে অন্য দল থেকে সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নয়। এ দু'টি দল আসলে একটিই। উভয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু সময়ের। তাঁরা হচ্ছেন প্রথম আবির্ভূত নবীর শিক্ষাপ্রাপ্ত। আর এরা হলো দ্বিতীয় আবির্ভূত নবীর।"[৩]

প্রতিশ্রুত মসীহ মুহাম্মদ ও হুবহু মুহাম্মদ।

'আন্‌ওয়ারে খিলাফত' নামক গ্রন্থে কাদিয়ানীদের খলীফা মীর্জা মাহমুদ আহমদ লেখে, "এবং আমার ঈমান, এ আয়াত 'ইসমুহু আহামাদ' দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহকেই বোঝানো হয়েছে।"[৪]

কাদিয়ানী মতবাদ শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) হতেও তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে।

মীর্জা গোলাম আহমদ তার বইতে বলে, "আমাদের নবী করীম (সা.)-এর রূহানিয়াত পঞ্চম শতাব্দীতে সংক্ষিপ্ত গুণাবলীসহ আবির্ভূত হয়। সে যুগ রূহানিয়াতের উৎকর্ষের শেষ যুগ ছিল না, বরং তার পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্রমবিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল। অতঃপর রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ এ যুগে (গোলাম আহমদের যুগ) পুরোপুরি বিকশিত হয়।[৫]

সে আরো বলে ঃ লাহু খাসাফুল কামারিল মুনীরে ওয়া ইন্নালী–গাযযাল কামারানিল মাশরিকানে আতুনকিরু।

অর্থাৎ তার [নবী করীম (সা.)] জন্য শুধু চন্দ্রগ্রহণের প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছিল আর আমার জন্য প্রকাশিত হয়েছে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের (গ্রহণের) প্রমাণ। এখনও কি তুমি অস্বীকার করবে?[৬]

কাদিয়ানী মতবাদের দৃষ্টিতে মীর্জা আহমদের কবরও জনাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর রওজা মোবারকের মতই মর্যাদাসম্পন্ন।

---

১. হাকীকাতুন নবুওয়াত, পৃষ্ঠা ২৫৭। ২. প্রাগুক্ত, ১৪তম খন্ড, ২৯শে এপ্রিল,, ১৯২৭ সংখ্যা।

৩. প্রাগুক্ত, এ পত্রিকাটিই তার ৫ম খণ্ডে ২৮ শে মে, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত।

৪. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ডে ৫৫তম সংখ্যা। ৫. "খোত্ববায়ে এলহামিয়া" পৃষ্ঠা ১৭৭। ৬. এজাযে আহমদী, পৃষ্ঠা ৭১।

উদাহরণস্বরূপ কাদিয়ানীদের প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আল-ফযল'-এর একটি নিবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। নিবন্ধে বলা হয় : এ পরিপ্রেক্ষিতে মদীনা মুনাওয়ারার সবুজ গম্বুজের পূর্ণ রশ্মি শ্বেত গম্বুজের ওপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। যে কেউ বিশ্বনবীর (সা.) রওযা মোবারক যিয়ারতের দোয়া এখানে হাসিল করতে পারেন। কতই না দুর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে আহমদিয়াতের হজ্জে আকবরের এ পুণ্য হতে বঞ্চিত হলো!"[১] এভাবে কাদিয়ানীরা এ বিশ্বাসও পোষণ করে, তাদের কাদিয়ান শহরটি ইসলামের তিনটি পবিত্রতম স্থানের একটি।

কাদিয়ানীদের খলীফা মীর্জা মাহমুদ আহমদ লেখে : আল্লাহ্ পাক এ তিনটি স্থানকে (মক্কা, মদীনা ও কাদিয়ান) সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর নূরের বহিঃপ্রকাশের (তাজাল্লী) জন্য নির্বাচিত করেছেন।"[২] অতঃপর কাদিয়ানী মতবাদ আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বালাদে হারাম (সম্মানিত শহর বা মক্কা) ও মাসজিদে আক্সা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতকে কাদিয়ান শহরের সাথে সম্পৃক্ত করে। মীর্জা গোলাম আহমদের বক্তব্য হচ্ছে, "ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনান" (এবং যে কেউ এতে প্রবেশ করবে শান্তিতে থাকবে) কুরআনের এ আয়াত তার মসজিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলা হয়েছে।[৩]

যমীনে কাদিয়ান আব মুহতারাম হ্যায়

হুজমে খালকছে আরযে হারাম হ্যায়

অর্থাৎ কাদিয়ানের ভূমি এখন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জায়গা। এটা জনগণের ভীড়ের কারণে হারাম শরীফের (মক্কা শরীফ) মতো পবিত্র।

সুবহানাল্লাযী আসরা ...

অর্থাৎ তিনিই সেই মহিমান্বিত সত্তা যিনি তাঁর প্রিয়তম বান্দাকে রাতের বেলা নৈশ পরিভ্রমণে নিয়ে গেলেন অতি পবিত্র মসজিদ (মক্কা) থেকে দূরবর্তী মসজিদে (বাইতুল মোকাদ্দাস, জেরুজালেম) যার চারদিক আমার রহমতে পরিপূর্ণ। এই আয়াতে উল্লিখিত 'মাসজিদে আক্সা' দ্বারা কাদিয়ানের মসজিদকেই বোঝানো হয়েছে।[৪]

---

১. আল ফযল, দশম খণ্ড, ৪৮তম সংখ্যা, ১৮ ই ডিসেম্বর, ১৯২২।

২. আল-ফযল, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৫।

৩. "বারাহীনে আহমদিয়্যাহ"র টীকার সংক্ষিপ্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৮ দুররে ছামীন, ৫২ পৃষ্ঠায় বলা হয়।

৪. প্রাগুক্ত, ২০তম খণ্ড, ২১ শে আগস্ট, ১৯৩২ সংখ্যা।

যখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াল, কাদিয়ান শহর আল্লাহর পবিত্র শহরের সমকক্ষ, বরং তার চেয়ে কিছু বেশী, তখন অবশ্যই তার উদ্দেশ্যে সফর করা হজ্জ সমতুল্য হবে অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী মর্যাদাশীল হবে। সুতরাং মীর্জা মাহমুদ আহমদ জুমার খুতবায় বলে, "এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আরেকটি যিল্লী (ছায়া) হজ্জের অনুমোদন করেছেন যাতে তিনি যে জাতিকে দিয়ে ইসলামের উন্নতির কাজ নিতে চান... এবং ভারতের দরিদ্র মুসলমানরা এতে অংশ নিতে পারে।"[১]

কাদিয়ানী মতবাদের অন্য এক নেতৃস্থানীয় লোক আরেকটু আগে বেড়ে বলে ঃ যেভাবে আহমদী মতবাদ অর্থাৎ হযরত মীর্জা সাহেবকে বাদ দিলে ইসলামের যেটুকু বাকি থাকে, তা হচ্ছে শুষ্ক ইসলাম। অনুরূপভাবে এ ছায়া হজ্জ ছাড়া মক্কার হজ্জও শুষ্ক থেকে যায়, যেহেতু আজকাল মক্কার হজ্জের উদ্দেশ্য আর পূর্ণ হচ্ছে না।"[২]

তাদের এ ধরনের বক্তব্যে আন্দাজ করুন, কাদিয়ানী মতবাদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ধর্মে পরিণত হওয়ার জন্য কেমন তৎপর ও আশান্বিত!

তাদের নিজস্ব একজন নবী হবে। সাহাবা ও খলীফা হবে। পবিত্র স্থান থাকবে। তার নিজস্ব ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব থাকবে। নিজস্ব সাহিত্য ও প্রচারপত্র থাকবে।

ইসলামের অমর ও চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারিত্ব, ইসলামের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামের প্রথম ঝর্ণাধারা, উৎস, ইসলামের পবিত্র স্থান ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রসমূহ (অর্থাৎ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু) থেকে তারা স্বীয় অনুসারীদের সম্পর্ক ছিন্ন করে যে কোন উপায়েই হোক, উল্লিখিত প্রতিটি জিনিসের বিকল্প হিসেবে নতুন আরেকটি জিনিস তার অনুসারীদের জন্য সরবরাহ করছে। কিন্তু এ মহান বিষয়গুলোর বিকল্প কিভাবে হতে পারে? এসব হতে আল্লাহর পানা কামনা করছি।

আর এভাবেই কিছু লোক নবী আরাবী (সা.)-এর ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্যের স্পৃহা, তাঁর স্মরণের আস্বাদন, তাঁর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ হতে পশ্চাৎগামী হয়ে কাদিয়ানী নবীর ভালবাসা, তার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা ও গুণকীর্তন, তার জীবনী অধ্যয়ন ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ শুরু করে। এ লোকগুলো ইসলামের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস, ঈমান

ও বীরত্বের ইতিহাস এবং মানবিক মর্যাদাবোধের ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে এমন এক ইতিহাসের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, যা সুস্পষ্ট লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ইতিহাস। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী ও স্বৈরাচারী সরকারের হাতের ক্রীড়নকের ইতিহাস। জী হুজুরী, মোসাহেবী ও তোষামোদের ইতিহাস। গুপ্তচরবৃত্তি ও মুনাফেকীর ইতিহাস।

এ লোকগুলো ইসলামের সে সব মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁরা সত্যিকার অর্থে মানবতার গর্ব ও যাঁরা মানব জাতির নয়ন শীতলকারী, যাঁরা পাহাড়সম মর্যাদার অধিকারী ও ইতিহাসের অনন্ত ও ক্ষয়হীন আদর্শের বাহক, সে কীর্তিমান পুরুষদের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এমন সব হীনমন্য, দুশ্চরিত্র ও নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যারা গোলামীর ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না, যারা অন্তর বিক্রির কাজ ছাড়া আর কোন কাজে আসে না।

এসব লোক জীবন্ত ও অনন্ত অক্ষয় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এমন এক কুচক্রী, হীন ও নিস্তেজ অলস (Letarahore) প্রতি ঝুঁকে পড়ে, যার মধ্যে বজ্জাতি, অশ্লীল কথাবার্তা, বিশ্রী গালাগালি, স্ববিরোধী উক্তি, ডাহা মিথ্যা, লম্বা-চওড়া দাবী, হাস্যকর ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীর ফাঁকা বুলি আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই তারা জানে না যার কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি।

এসব লোক সেই পবিত্র শহর যেথায় ওহী নাযিল হয়েছে, যেখানে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছেন, যেখানে মানবতার বিদ্যাপীঠ রয়েছে, যা মানবতার আশ্রয়স্থল এবং যার আকাশ হতে এ ধরার সুবহে সাদিক উদিত হয়, সেই শহর হতে ভক্তির আত্মীয়তা ছিন্ন করে এমন এক শহরকে ভক্তি-শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত করতে চায়, যা হলো গুপ্তচরবৃত্তির আস্তানা এবং মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে মুনাফেকী ও ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানা।

এই হলো কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের স্বরূপ, যা প্রতিটি ভালকে মন্দে পরিণত করে।

কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামী বিশ্ব-বদনের সেই পচা অংশ, যে অংশটি তার অভ্যন্তরীণ শিরা-উপশিরায় নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতা, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের মোসাহেবী ও চামচাগিরি এবং সে সব অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য ও দাসবৃত্তির বিষ ছড়াচ্ছে, যারা আল্লাহর যমীনকে অত্যাচার ও অরাজকতায় পূর্ণ করে রেখেছে এবং দুনিয়ার মুসলমানদেরকে তাদের গোলামীর পিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছে।

এ মতবাদ কালেমার ঐক্য বিধ্বস্ত করে দিয়ে ইসলামী বিশ্বকে চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় নিক্ষেপ করে। ইসলামের আসল ঝর্ণাধারা, তার উৎস ও তার পরীক্ষিত মহান ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ততাকে টলটলায়মান করে দেয়। জাতির

জাঁকজমকপূর্ণ অতীত ইতিহাস, তার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো ও মহান মর্যাদাশালী সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ হতে জাতির সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার ও তাদের অনুসারীদের জন্য পথ পরিষ্কার করে দেয়। তারা ইসলামের অপরাজেয় ক্ষয়হীন শক্তি ও তার বাসন্তী জীবনধারা সম্পর্কে কুধারণার জন্ম দেয়। মুসলমানদেরকে তাদের ভবিষ্যত হতে নিরাশ করে দেয়।

কাদিয়ানী মতবাদ মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা, আন্তর্জাতিক সমস্যাদি ও ইনসাফভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে দূরে সরিয়ে কিছু বাজে বিষয়ের মাঝে জড়িয়ে ফেলে এবং এই মহান জাতিকে সেই ইউরোপিয়ান জাতির গাড়ীর কুলিতে পরিণত করার হীন প্রচেষ্টা চালায়, যার ইঙ্গিতে এদের আবির্ভাব ঘটে আর যাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এরা লালিত-পালিত। আফসোস! কাদিয়ানী মতবাদ মীর্জা গোলাম আহমদের মত মূল্যহীন মানুষের মাথায় নবুওয়তের মুকুট পরিয়ে মানবতাকে ততটুকু অধঃপতনের দিকে নিক্ষেপ করেছে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত যতটুকু সমুন্নত করেছিল।

কাদিয়ানী মতবাদ গোটা মানবতাকে অবমাননা করেছে। মানব সভ্যতার ললাটে কলংকের দাগ এঁকে দিয়েছে। এজন্য এর অস্তিত্ব এমন একটি অন্যায়, যা কখনো ক্ষমা করা যায় না এবং এটা এমন এক ক্ষমাহীন অপরাধ, যা ইতিহাস বিস্মৃত হতে পারে না। কাদিয়ানী সমস্যা কোন একটি রাষ্ট্র বা সরকারের সমস্যা নয়। এটা পুরো মুসলিম বিশ্বের সমস্যা। এটা ইসলামী আক্বীদার প্রশ্ন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইয্যতের প্রশ্ন। মানব সভ্যতার প্রশ্ন।

যদি এ মহান আক্বীদা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি তার সম্মানে আঘাত করা হয়, যদি তার পবিত্রতাকে কলংকিত করা হয়, তাহলে তা হবে মাটির এ গোলাকার পৃথিবীর জন্য চরম অকল্যাণ।

এগুলো হচ্ছে প্রকৃত তথ্য। কিন্তু যারা সত্য হতে দূরে ও কল্পনার রাজ্যে বাস করতে আগ্রহী এবং সত্য সম্পর্কে নিজেদের ধোঁকায় বন্দী রাখতে চায়, তাদের জন্য ও যাদের দৃষ্টিতে ধর্ম ও আক্বীদার কোন মূল্য নেই এবং যারা দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কাছে কোন রসনা ও কলম নেই।

খতমে নবুওয়ত আল্লাহ্ তা'আলার পুরস্কার ও মুসলিম উম্মাহ'র বৈশিষ্ট্য

এই বিশ্বাস যে, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, মুহাম্মাদুর (সা.) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ পয়গম্বর ও খাতামুন্নাবিয়্যীন এবং ইসলাম আল্লাহ্তা'আলার সর্বশেষ পয়গাম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ পুরস্কার এবং অনুগ্রহস্বরূপ যা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর (সা.) জন্য নির্ধারিত করেছেন।

এজন্যই একজন ইয়াহুদী পণ্ডিত হযরত উমর (রা.)–এর সামনে এ বিষয়ে বড় ঈর্ষা ও দুঃখ প্রকাশ করে বললেন ঃ কুরআন শরীফে একটি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। যদি সে আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থে অবতীর্ণ হতো এবং আমাদের সম্পর্কে হতো, তবে আমরা যেদিন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, সেদিনকে জাতীয় আনন্দোৎসবের দিন হিসেবে পালন করতাম। তার উদ্দেশ্য ছিল, সূরায়ে মায়েদার এই আয়াতটি—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম" (সূরা মায়েদা ঃ ৩) যাতে খতমে নবুওয়ত ও নেয়ামত-অবদান পরিপূর্ণ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

হযরত উমর (রা.) এই নেয়ামতের মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও এই ঘোষণার গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি। তিনি শুধু এতটুকু বললেন ঃ আমাদের নতুন কোন আনন্দোৎসবের দিনের প্রয়োজন নেই। এ আয়াতটি এরূপ স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে, যা ইসলামের একটি মর্যাদাসম্পন্ন সম্মেলন (ইজতেমা) ও ইবাদাতের দিন।

এ স্থলে দুইটি ঈদ বা আনন্দোৎসব একত্র হয়েছিল। প্রথমটি হলো আরাফাতের দিন (৯ই যিলহজ্জ)। দ্বিতীয়টি জুমআর দিন।

মানসিক ভারসাম্যহীনতা থেকে হেফাযত

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়া এমন সব আন্দোলন ও দাওয়াতের শিকার হওয়া থেকে এই আক্বীদা বা বিশ্বাস ইসলামকে বাঁচিয়েছে যে সব আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসে সুদীর্ঘ সময়ে ও ইসলামী বিশ্বের বিস্তৃত অঙ্গনে সময়ে সময়ে দানা বেঁধে উঠেছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ও ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্টি হওয়া নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার ও ইসলামের অপব্যাখ্যা দানকারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া থেকে কেবল এ বিশ্বাসের বদৌলতেই ইসলাম রক্ষা পেয়েছে।

খতমে নবুওয়তের এই দুর্গে এ জাতি ঐ দাবীদারদের আক্রমণ ও লুটতরাজ থেকে নিরাপদে ছিল, যারা ইসলামের মৌল কাঠামোকে পরিবর্তন করে নতুন কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছিল। আর মুসলিম জাতি ঐ সকল ষড়যন্ত্র ও ভয়াবহ হামলাকে প্রতিহত করতে পেরেছে যা থেকে পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মত বাঁচতে পারেনি।

এ কারণেই দীর্ঘকাল ধরে উম্মতের ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত ঐক্য ও একতার বন্ধন অটুট রয়েছে। যদি এ আক্বীদা-বিশ্বাস ও এ দুর্গ না থাকত, তাহলে একতাবদ্ধ এ জাতি এমন বহুধাবিভক্ত জাতিতে পরিণত হতো, যেখানে প্রতিটি উম্মতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র (রূহানী মারকায) হতো আলাদা। একাডেমিগত ও সাংস্কৃতিক উৎসধারা হতো আলাদা। প্রতিটির ইতিহাস হতো আলাদা। প্রতিটির পূর্বসূরী ও ধর্মীয় নেতা ও রাহবার হতো আলাদা। ইতিহাস হতো আলাদা। প্রতিটির অতীত হতো আলাদা।

জীবন ও সংস্কৃতির ওপর খতমে নবুওয়তের এহ্সান

আক্বীদায়ে খতমে নবুওয়ত মূলত মানব জাতির জন্য একটি মর্যাদা, আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য। এটি এ কথার ঘোষণা যে, মানব জাতি যৌবনে পদার্পণ করেছে এবং তার মাঝে এ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার আখেরী পয়গাম কবুল করতে পারবে।

এখন মানব সমাজের জন্য কোন নতুন ওহী, কোন নতুন আসমানী পয়গামের প্রয়োজন নেই। এ আক্বীদা দ্বারা মানুষের মাঝে আত্মবিশ্বাসের চেতনা পয়দা হয়েছে। তার এ কথাটি উপলব্ধ হয়, দ্বীন তার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে গেছে। এখন পৃথিবীর আর পেছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এখন প্রয়োজন হলো এ পৃথিবীর নতুন ওহীর জন্য আসমানের দিকে দৃষ্টিপাতের পরিবর্তে আল্লাহ্প্রদত্ত শক্তি দ্বারা ফায়দা হাসিল করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত দ্বীন ও আখলাকের মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে জীবন গঠনের জন্য যমীনের দিকে ও নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

আক্বীদায়ে খতমে নবুওয়ত মানুষকে পেছনের দিকে নেয়ার পরিবর্তে সামনের দিকে নিয়ে যায়। এই আক্বীদা-বিশ্বাস মানুষের মননে নিজের শক্তিকে ব্যয় করার প্রেরণা যোগায়। এ আক্বীদা মানুষকে তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার বাস্তব ক্ষেত্র ও দিক বাতলে দেয়।

যদি খতমে নবুওয়তের আক্বীদা না থাকে, তাহলে মানুষ সর্বদা উৎকণ্ঠা ও আস্থাহীনতার জগতে বাস করবে। সর্বদা যমীনের দিকে তাকানোর পরিবর্তে আসমানের দিকে তাকাবে। সর্বদা সে নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত ও সংশয়-সন্দেহে থাকবে। বারেবারেই তাকে প্রত্যেক নতুন ব্যক্তি এসে এই বলবে, মানবতার পুষ্পকানন ও আদমের সবুজের সমারোহ এতদিন অসম্পূর্ণ ছিল। এখন তা ফুলে-ফলে, পত্র-পল্লবে পরিপূর্ণ হয়েছে। মীর্জার কবিতা ঃ

"রওযায়ে আদম কেহ্ থা উহ্ না মুকাম্মেল আব তাক
মেরে আনেছে হুয়া মুকাম্মাল বজুমলা বরগওয়ার।"

আর সে একথা বুঝতে বাধ্য হবে, এখন পর্যন্ত যেহেতু মানবতার গুলশান অসম্পূর্ণ রইল, সেহেতু ভবিষ্যতের কি বিশ্বাস?

এমনিভাবে সে গুলশানের বারি সিঞ্চন, পরিচর্যা এবং তার ফুল ও ফল দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে নতুন মালির অপেক্ষায় থাকবে, যে গুলিস্তানকে ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ করবে।

নবুওয়তের দাবীদাররা

মীর্জা গোলাম আহমদের চেষ্টা-অপচেষ্টা, তার আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী যৌক্তিক পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল, নবুওয়তের মর্যাদা, সম্মান ও দায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিলীন হয়ে যাবে। তারা নবুওয়তের সিলসিলা জারী থাকার ব্যাপারে কলমের যে শক্তি ব্যয় করেছে, যেভাবে এর প্রচার ও প্রসার করেছে, তারা এলহামের যে গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর ওপর যেভাবে নবুওয়তের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে, এর পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল, নবুওয়ত একটি ছেলেখেলায় রূপান্তরিত হয়ে পড়বে।

যদিও সে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অটুট থাকার কথা বলেছে শুধু নিজের নবুওয়তকে সম্ভাব্যতা ও প্রামাণ্য করার জন্য এবং খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করেছে শুধু নিজের জন্য নতুবা সে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিজেকেই খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষ নবী মনে করে।

মীর্জা গোলাম আহমদ বলে, "এবং এই প্রাসাদে একটি ইটের জায়গা খালি ছিল অর্থাৎ যারা নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবেন এবং সর্বশেষ ইটটি বসিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেবেন। সুতরাং আমিই সেই ইট।"[১]

আল্লামা ইকবালের বলিষ্ঠ ভাষায় : স্বয়ং আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার প্রমাণ উপস্থাপন, যা মধ্যযুগের দার্শনিকদের জন্য শোবার কারণ হতে পারে এই যে, যদি অন্য কোন নবী সৃষ্টি হতে না পারে, তাহলে পয়গাম্বরে ইসলামের আধ্যাত্মিকতা (রূহানিয়াত) অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সে স্বীয় দাবী পয়গাম্বরে ইসলামের রূহানিয়্যাতে নতুন পয়গম্বর সৃষ্টি হওয়ার শক্তি ছিল—এর পক্ষে নিজের নবুওয়তকে পেশ করে থাকে। কিন্তু আপনি যদি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর রূহানিয়্যাত একের অধিক নবী সৃষ্টি করতে কি সক্ষম?

---

১. 'খুতবায়ে এলহামিয়া', পৃষ্ঠা ১১২।

তাহলে এর উত্তর আসবে 'না'-সূচক। এ ধারণা এ কথারই নামান্তর যে, মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী নন। আমিই শেষ নবী।

এ কথা অনুধাবন করার পরিবর্তে খতমে নবুওয়তের ইসলামী ধারণা মানব জাতির ইতিহাসে সাধারণভাবে এবং এশিয়ার ইতিহাসে বিশেষভাবে কী পরিমাণ সাংস্কৃতিক মর্যাদা রাখে।

আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার ধারণা হলো, খতমে নবুওয়তের ধারণা এই অর্থে, 'মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন অনুসারী নবুওয়তের মর্তবা হাসিল করতে পারবে না' আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তকে অসম্পূর্ণ করে দেয়। যখন আমি আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার ধ্যান-ধারণা তার নবুওয়তের দাবীর আলোকে অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনে হয়, সে নিজের দাবীর পক্ষে পয়গাম্বরে ইসলামের সৃজনশীল শক্তিকে শুধু একজন নবী অর্থাৎ আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার জন্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে পয়গাম্বরে ইসলামে আখেরী নবী হওয়াকে অস্বীকার করে ফেলে। এভাবে এ নতুন পয়গাম্বর নিজের আধ্যাত্মিক পূর্বসূরী খতমে নবুওয়তের ওপর নীরবে হস্তক্ষেপ করে বসে।[১]

কিন্তু মানুষের মন এই সূক্ষ্ম দর্শন বুঝতে অক্ষম যে, হুযুর পাক (সা.)-এর নবুওয়ত সৃজনশীল শক্তি একটিমাত্র সত্তার অস্তিত্বের জন্য নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

ইতোপূর্বে এ শক্তি নিজের কাজও করেনি আর এ লোকের [যে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের তের শ' বছর পর এসেছে এবং এরপর জানা নেই, পৃথিবী আর কত হাজার পর্যন্ত চলবে] পরও কোনো কাজ করতে পারবে না। যেমন অন্যদের আলোচনায় স্বয়ং মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লেখে ঃ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেন ঃ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা বোঝেনি এবং এটা বুঝেছে, আল্লাহর ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। এজন্য কাউকে কিছু দিতে পারবেন না। এরূপভাবে এ কথা বলে, আল্লাহভীতিতে যতই বেড়ে যাক, পরহেযগারী ও তাকওয়ায় কয়েকজন নবীকেও অতিক্রম করে ফেলুক এবং আল্লাহর মারেফত-সান্নিধ্য যতটুকুই অর্জন করুক না কেন, আল্লাহ্ তাকে কখনও নবী বানাবেন না।

তাদের এমনটি বোঝা আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদাকে না বোঝার কারণেই হয়েছে নতুবা একজন কেন, আমি তো বলি হাজার হাজার নবী হবে।[২]

---

১. পণ্ডিত নেহেরুর প্রশ্নমালার উত্তর। হরফে ইকবাল, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১।

২. আনওয়ারে খেলাফত, পৃষ্ঠা ৬২।

সুতরাং মীর্জা গোলাম আহমদের পর মানুষের নবুওয়তে দাবী উত্থাপনের ব্যাপক দুঃসাহস হয়ে গেল। আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাস মোটামুটিভাবে যা বিস্তারিত বিবরণসহ সংরক্ষিত রয়েছে আকবর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা নেই, যে খতমে নবুওয়তের অস্বীকার এবং নতুন ধর্ম প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

আকবরও এতো সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্টভাবে নতুন নবুওয়তের দাবী তোলে নি। কিন্তু মীর্জার পর এ দরজা সাধারণভাবে খুলে গেছে। প্রফেসর ইলিয়াস বরনী সাহেব ১৩৫৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৬ ইং পর্যন্ত সাতজন নবুওয়তের দাবীদারের কথা বলেছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই, যদি বেশী গুরুত্ব দিয়ে ঐ নবুওয়তের দাবীদারদের আদম শুমারী করা হয়, তাহলে শুধু পাঞ্জাবেই এর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

নবুওয়তের ঐ দাবীদারদের আধিক্য ও খামখেয়ালীর বিপক্ষে স্বয়ং মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদই প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। একটি ভাষণে সে বলেছে, "দেখুন, আমাদের দলেই কতজন নবুওয়তের দাবীদারের উত্থান হলো। তাদের মাঝে একজন ব্যতীত সকলের ব্যাপারে আমার ধারণা এই, তারা মিথ্যা কথা বলেন না। আসলে প্রথমে তাদের এলহাম হয়েছে এবং আশ্চর্যের কথা নয়, এখনো হচ্ছে, কিন্তু ত্রুটি এই, তারা নিজের এলহাম বুঝতে ভুল করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন, যাদের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানাশোনা আছে এবং আমি সাক্ষ্য দিতে পারি, তাদের মাঝে নিষ্ঠা ছিল, খোদাভীতি ছিল। ভবিষ্যত সম্বন্ধে আল্লাহই জানেন, আমার এ ধারণা কতটুকু যথাযথ। তবে শুরুতে তাদের অবস্থা ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তাদের এলহামের একটি অংশ খোদায়ী এলহাম ছিল। কিন্তু ক্রটি এই হয়ে গেছে, তারা এলহামের রহস্য বুঝতে অক্ষম হয়েছেন এবং হোঁচট খেয়েছেন।"[১]

মুসলমানদের আত্মকলহ

এই নতুন নবুওয়ত দ্বারা ইসলামী জগতে যে তীব্র বিশৃংঙ্খলা, মুসলমানদের যে ভয়াবহ আত্মকলহ এবং উম্মতের ঐক্যে যে দুঃখজনক ফাটল ধরেছে, তা চিন্তা করলেও একজন মুসলমানের গা শিউরে না উঠে পারে না।

ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই যুগে স্বভাবতই মানুষের ভেতর 'আনাল হক্ব' ও 'আনান্নাবিয়্যু' বলার আগ্রহ নেই। কিন্তু মীর্জা গোলাম আহমদের রচনাবলীর প্রতিক্রিয়া ও কাদিয়ানী মুবাল্লিগদের প্রচারণার কারণে যদি আজ

---

১. আল-ফযল, ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৫।

ইসলামী বিশ্বে নবুওয়তের দাবী উত্থাপনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের নবুওয়তের পতাকা ধরে, আর যারা এই পতাকার ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়, নবুওয়তের অনিবার্য ফল হিসেবে তাদের কাফের বলা শুরু হয়ে যায়, তাহলে ইসলামী বিশ্বে কি রকম বিশৃঙ্খলা ও আত্মকলহের সৃষ্টি হতে পারে? আর মুসলিম জাহান কি রকম ধর্মীয় দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে? যে জাতির উম্মতের আবির্ভাব ঘটেছে বর্ণ, গোত্র ও সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছিন্নতাকে নির্মূল করার জন্য, যে জাতির আবির্ভাব ঘটেছে সমগ্র মানব জাতিকে পরস্পরের ভাই ও সহমর্মী বানানোর জন্য সে জাতি কিভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পরস্পর আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে? কিভাবে একে অপরকে কাফের বলতে শুরু করবে?

এই আশংকার কথা অনুভব করেছিলেন মৌলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরীও। অত্যন্ত সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে নিজের একটি নিবন্ধে তিনি একথা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করেন নি, এই ভয়াবহ দরজা মীর্জা গোলাম আহমদই খুলেছে। ইসলামের পুরো ইতিহাসে সেই প্রথম ব্যক্তি, যে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা জারী থাকাকে একটি দাওয়াত ও একটি আন্দোলনের রূপ দিয়ে পেশ করেছে।

মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ধীশক্তিসম্পন্ন লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আল্লাহর দোহাই একটু চিন্তা করুন! মীর্জার এ বিশ্বাস যদি যথার্থ হয় যে, নবী আসতে থাকবেন এবং হাজারো নবী আসবেন (মুহাম্মদ আলী সাহেব এই বিশ্বাসের সূচনাকারী বা লালনকারী নন, তিনি মীর্জা গোলাম আহমদের ভাষ্যকার মাত্র।) যেমন সে স্পষ্টভাবে 'আনিয়ারে খেলাফত' নামক গ্রন্থে লিখে দিয়েছে, তাহলে এ হাজারো গ্রুপ একে অপরকে কাফের আখ্যাদানকারী হবে কিনা এবং ইসলামী ঐক্য কোথায় যাবে?

এ কথাও যদি মেনে নেয়া হয়, সে সব নবী আহমদী জামাতেই হবে, তাহলে আহমদী জামাতের কয়টি টুকরো হবে?

অতীত যুগের রীতিনীতি সম্পর্কে তোমরা এতটুকু অজ্ঞ নও, নবীর আগমনের পর কিভাবে একটি দলের সাথে তার বিরোধ বাঁধে!

তিনি প্রভু যিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে সমগ্র পৃথিবীর জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এখন মীর্জা গোলাম আহমদ কি মুসলমানদেরকে এভাবে শতধাবিভক্ত করে দিতে চায় যে, একে অপরকে কাফের বলতে শুরু করবে? পারস্পরিক ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বিচ্ছিন হয়ে পড়বে?

মনে রেখ! ইসলামকে অপরাপর সকল মতবাদের ওপর বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহলে ইসলামের ওপর এই মহাবিপদের দিন কখনো আসতে পারে না যে, হাজারো নবী স্ব স্ব দল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, হাজার দেড়

ইটের মসজিদ হবে, যার পূজারীরা স্ব স্ব স্থানে ঈমান ও নাজাতের ঠিকাদারী নিয়ে বসে থাকবে এবং অপরাপর মুসলমানদেরকে কাফের ও বেঈমান সাব্যস্ত করতে থাকবে।"[১]

ভুল ও ভয়াবহ সিদ্ধান্ত

মীর্জা গোলাম আহমদের একটি সিদ্ধান্ত ইসলামী ধ্যান-ধারণার জন্য হতাশা ও ইসলামী সমাজের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি স্বতন্ত্র একটি দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সিদ্ধান্তটি হলো ঃ আল্লাহর সাথে কথোপকথনকে সে ধর্মের সত্যতার জন্য শর্ত এবং এবাদত ও মুজাহাদার (সাধনা) স্বাভাবিক পরিণতি মনে করে।

তার মতে যে ধর্মে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের সিলসিলা জারী নেই, সে ধর্ম মৃত ও বাতিল, বরং সেটা শয়তানের ধর্ম এবং তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ধর্মের অনুসারী মুজাহাদা চেষ্টা-সাধনার বলে এই সম্পদ দ্বারা মহিমান্বিত হতে না পারবে, সে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট, চরম বঞ্চিত ও অন্ধ। বারাহীনে আহমদিয়্যার পঞ্চম খণ্ডে সে লেখে, "এমন নবী কি ধরনের সম্মান, কিসের মর্তবা, কিসের প্রভাব, কি ধরনের ঐশ্বরিক শক্তি নিজের অস্তিত্বে রাখেন, যার অনুসারীরা শুধুই চক্ষুহীন-অন্ধ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কথোপকথন ও সম্বোধনের মাধ্যমে তাদের চক্ষু খুলে দেন না।"

এটা কত বড় বাজে ও ভ্রান্ত আক্বীদা যে, শুধু এই কল্পনা করতে হবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর ওয়াহীয়ে ইলাহীর দরজা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত এর কোন আশাও নেই! শুধু কিসসা-কাহিনীর পূজা করো।

সুতরাং এ ধরনের ধর্ম কি কোন ধর্ম হতে পারে যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার কোন খবরই জানা যায় না? যা কিছু আছে শুধু কিসসা-কাহিনী! যদি কেউ তার পথে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করে দেয়, তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সব কিছুর ওপরে তাঁকেই গ্রহণ করে, তবু তিনি ঐ ব্যক্তির সামনে স্বীয় পরিচয়ের দরজা খুলে দেন না এবং কথাবার্তা ও সরাসরি সম্বোধন দ্বারা তাকে মর্যাদাবান করেন না।

আমি আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছিঃ এ যুগে এ ধরনের ধর্মের প্রতি আমার চেয়ে বেশী নিরাসক্ত আর কেউ নেই। আমি এ ধরনের ধর্মের নাম রাখি শয়তানী ধর্ম। এটা রহমানী বা আল্লাহ্প্রদত্ত ধর্ম নয়। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, এমন ধর্ম জাহান্নামের দিকেই নিয়ে যাবে।"[২]

---

১. রদ্দে তাকফীরে আহলে কেবলা, পৃষ্ঠা ৪৯-৫।

২. বারাহীনে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩।

কথোপকথনকে শর্ত নির্ধারণ করার পরিণাম

মীর্জা গোলাম আহমদ আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনকে মা'রেফাত, নাজাত, সততা ও হক্কানিয়্যাতের শর্ত নির্ধারণ করে যে ধর্মকে আল্লাহ্ তা'আলা সহজ ও সকলের জন্য আমলের উপযোগী বানিয়েছেন, সেই ধর্মকে অত্যন্ত কঠিন ও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

.. يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।" [সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫]

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

"এবং তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি।" [সূরা হজ্জ ঃ ৭৮]

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

"আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।" [সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৬]

কিন্তু মা'রেফাত ও নাজাতের জন্য যদি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনকে শর্ত করা হয়, তাহলে এই দ্বীন থেকে অধিক কঠিন কোন বস্তু হতে পারে না। কারণ অনেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই এই কথোপকথন ও এলহামের সাথে সম্পর্কহীন। সে যতই মুজাহাদা-সাধনা করুক না কেন, কথোপকথন ও এলহামের দরজা তার সামনে খুলবে না।

অনেক লোক আছে প্রকৃতিগতভাবে এর সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তাদের ঐ সাধনার (যা আল্লাহর সাথে কথোপকথনের জন্য শর্ত) সুযোগ বা তৌফিক নেই।

ঐ বিশ্বব্যাপী দিগ্বিজয়ী ধর্ম, যার আবির্ভাব ঘটেছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য, যা সবাইকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়—মা'রেফাত, নাজাত, মাগফেরাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার জন্য এত কড়া শর্ত আরোপ করতে পারে না, লক্ষ-কোটি মানুষের মাঝে গুটি কয়েক মাত্র মানুষ যা পূরণ করতে সক্ষম হন।

অপরদিকে কুরআন শরীফে মু'মিনীন ও সফলকাম মানুষদের গুণাবলী দেখা যেতে পারে।

সূরায়ে 'আল-মু'মিনূন'-এর প্রথম রুকু পড়ুন ঃ কাদ আফলাহাল মুমিনূন–

সূরায়ে আল-ফুরকানের সর্বশেষ রুকু পড়ুন ঃ ওয়া ইবাদুর রহমানিল্লাযীনা–

প্রথম সূরার প্রথম আয়াত পুনঃআলিফ-লাম-মীম যালিকাল কিতাব...

আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। [সূরা বাকারা ঃ ১, ২ ও ৩]

এ আয়াতগুলোর কোথাও আল্লাহর সাথে কথোপকথনকে হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য শর্ত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়নি, বরং এর উল্টো 'ঈমান বিলগায়েব বা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাসকে হেদায়াতের জন্য প্রথম শর্ত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

আর ঈমান বিল-গায়েবের অর্থই হলো ঃ নবীর ওপর আস্থা রেখে (যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন ইচ্ছায় আল্লাহর সাথে কথাবার্তার জন্য নির্বাচিত করেছেন) গায়েবী রহস্যাবলীকে যা শুধু জ্ঞান ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না, তা মেনে নেয়া।

যদি মীর্জা গোলাম আহমদের কথা মেনে নেয়া হয়, আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলা মারেফাত ও নাজাতের পূর্বশর্ত, তাহলে ঈমান বিল-গায়েবের প্রয়োজন আর থাকে না এবং এর ওপর কুরআন এত জোর দিল কেন, তাও বোধগম্য হয় না।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (র.)-এর পবিত্র জীবন আমাদের জন্য মডেল হিসেবে রয়েছে। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, তাঁদের মধ্য হতে কয়জন আল্লাহর সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর সম্বোধনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন? হাদীস ও ইতিহাস দ্বারা কয়জনের ব্যাপারে প্রমাণ করা যেতে পারে, আল্লাহর সাথে তাঁদের কথোপকথন হয়েছিল?

ঐ যুগের ইতিহাস ও ঐ মোবারক জামায়াতের প্রকৃতি ও অবস্থা বরং মানবীয় প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি এই দাবী করতে পারে না যে, লক্ষাধিক সদস্যবিশিষ্ট এই পবিত্র জামায়াতের কারো আল্লাহর সাথে কথাবার্তা হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামেরই যখন এই অবস্থা, তাহলে পরবর্তীদের ব্যাপারে আর কি বলা যেতে পারে?

নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অস্বীকারের নেপথ্যে

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের এই গুরুত্ব ও সার্বজনীনতা মূলত পর্দার আড়াল থেকে নবুওয়তের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ এবং একটি গোপন ষড়যন্ত্র।

আল্লাহর সাথে কথাবার্তার এই ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতার পর নবুওয়তের ধারাবাহিকতার যুক্তিসঙ্গত কোন প্রয়োজন বাকি থাকে না।

পবিত্র কুরআন ও সকল ঐশী ধর্ম মানুষের হেদায়াত, মারেফাতে এলাহী অর্জন, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও আল্লাহর ইচ্ছার পরিচয় এবং অদৃশ্য রহস্যের জ্ঞানকে সিলসিলায়ে নবুওয়তের অধীন ও এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

কুরআন হেদায়াপ্রাপ্ত, মুমিনদের ভাষায় বলছে—

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۔

"আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন।"

[সূরা আল-আরাফ ঃ ৪৩]

অন্যত্র আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর (যাত ও সিফাত) ব্যাপারে জাহেলী ও মুশরেকী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔

"পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র, যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গাম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।" [সূরা আস সাফাত ঃ ১৮০-১৮২]

নবী (আ.)-গণকে প্রেরণের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন নির্দেশ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۔

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের আগমনের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" [সূরা আন্ নিসা ঃ ১৬৫]

মীর্জা গোলাম আহমদের ওহীর ধারাবাহিকতা জারী থাকা ও আল্লাহর সাথে কথোপকথনের দর্শনের অনিবার্য পরিণামের ওপর যদি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ও জ্ঞানের আলোকে এই দর্শনের বিশ্লেষণ ও পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন অংশ

পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে এখানে খতমে নবুওয়াতের পরিবর্তে সিলসিলায়ে নবুওয়তকে অস্বীকার করার দৃষ্টিভঙ্গিই পরিলক্ষিত হয় এবং হেদায়াত ও মারেফাতে ইলাহী ও সম্মোহন (Mesmerism) [অস্ট্রিয়ার মিঃ মিসমের (১৭৩৪-৭৮ খ্রীঃ) কর্তৃক আবিষ্কৃত পাণ্ডিত্য বিশেষ, যা দ্বারা অপরের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করা যায় এবং প্রভাবিত ব্যক্তিকে যে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিতে পারে] এবং আত্মা উপস্থিত করার আধুনিক আন্দোলন (Spiritualism) ইত্যাদির ন্যায় একটি আত্মিক সাধনা হয়ে পড়বে।

কথোপকথনের উৎস নির্ধারণ

অতঃপর আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও আল্লাহর সম্বোধনকে পর্যালোচনা করার মাপকাঠি কি? আর এরই বা কি নিশ্চয়তা আছে, মানুষ যা কিছু শুনছে, তা তার ভেতরের কোন আওয়াজ বা তার পারিপার্শ্বিক কোন প্রতিধ্বনি অথবা তার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও সমাজের প্রতিক্রিয়ার ফল নয়? যারা ঐশী ইঙ্গিত ও কথোপকথনের পুরনো সমষ্টি দেখেছেন, তাদের জানা আছে, এর কত বড় অংশ কাল্পনিক কথা ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারার লালন ও প্রসার ঘটায়, যা সৃষ্টি করেছিল পুরাণ (Mythology)।

মিসরের নব্য প্লেটোবাদ (New Platonism)-এর 'আল্লাহর জ্যোতি দেখা' ও 'আল্লাহর সাথে কথোপকথন'-কে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

তাদের ঐ আধ্যাত্মিকতা ও কথোপকথন সে সময়ের দার্শনিক ও পৌরাণিক কাহিনীকারদের বানোয়াট কল্পিত কাহিনী কি বিশ্বাস করেনি? খোদ ইসলামী যুগেও কিছু আহ্‌লে মুকাশাফাহ ও মুকালামাহ বা আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হওয়ার দাবীদার আকলে আউয়ালের সাথে মুসাফাহা করা ও এর সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপার বর্ণনা করে, যা পুরনো প্রক্ষিপ্ত দর্শন, বরং গ্রীক পুরাণের একটি কাল্পনিক ধারণামাত্র।

স্বয়ং মীর্জা গোলাম আহমদের কথোপকথনের একটি বিরাট অংশ তার যুগ, পারিপার্শ্বিকতা ও সমাজের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবান্বিত এবং এই পতনোন্মুখ সমাজের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়, যে সমাজে সে বেড়ে উঠেছিল এবং সেখানে নিজের দাওয়াত নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, বরং একটি বড় অংশ এ ধরনের, যার ব্যাপারে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন পর্যবেক্ষকের মনে হয়, এর উৎস আলিমুল গায়েব আল্লাহ্ তা'আলা নন্, বরং ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী শাসন ব্যবস্থা।

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর স্যার মুহাম্মদ ইকবাল মীর্জা গোলাম আহমদের আন্দোলন, তার কথোপকথন (মুকালামাহ্) ও ইলহামসমূহকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি এই রহস্যকে নিজস্ব যুক্তিপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে সুন্দররূপে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর কতিপয় সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাবে লিখিত এক নিবন্ধে তিনি বলেন ঃ

আমি একথা অবশ্যই বলব, আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা একটি আওয়াজ শুনেছে। কিন্তু এই বিষয়ের একটি বিহিত হওয়া দরকার, এই আওয়াজ কি ঐ মহান প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছিল যাঁর হাতে রয়েছে জীবন ও শক্তি, না মানুষের আত্মিক শূন্যতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে যারা এই আওয়াজের জীব-জগত? তাদের এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা চাই এবং ঐ চিন্তাধারা ও আবেগের ওপরও যা এ আওয়াজ তার শ্রবণকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে।

পাঠকগণ, এ কথা মনে করবেন না, আমি রূপক ভাষা ব্যবহার করছি। অতীত জাতির জীবনেতিহাস বলে, যখন কোন জাতির জীবনে পতন শুরু হয়ে যায়, তখন পতনই ইলহামের উৎসগিরি হয়ে যায় এবং ঐ জাতির কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সূফী, সাধক ও বুদ্ধিজীবীরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় আর মুবাল্লিগদের এমন একটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হয় ধাঁধা লাগানো কথার ঝুলি দিয়ে সংশ্লিষ্ট জাতির জীবনের ঐ অধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা, যা অতিশয় ঘৃণ্য ও অপমানজনক।

এই মুবাল্লিগরা অবচেতনভাবে আশার সুন্দর মোড়কে হতাশাকে গোপন করে ফেলে এবং সুকীর্তির অব্যাহত ক্ষমতাকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। এভাবে এক সময় তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে নস্যাৎ করে ফেলে।

এ সমস্ত লোক ইচ্ছাশক্তির ওপর সামান্য চিন্তা করুন যাদের এলহামের ভিত্তি ব্যাপারে এই পথনির্দেশ করা হয়ে থাকে, নিজেদের রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতাকে দৃঢ় মনে করে।

সুতরাং আমার ধারণায় ঐ সব অভিনেতা, যারা আহমদিয়্যাতের নাটকে অংশ নিয়েছে, পতন ও বিপর্যয়ের হাতে কাঠের পুতুল হয়ে রয়েছিল মাত্র।[১]

১. হরফে ইকবাল, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮।

ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াতের পরিণতি

[মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী কলকাতার মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের বিরাট সমাবেশে ১৯৭২ সালের ২৩শে মে এ ভাষণ দেন। এ সমাবেশে ছাত্রবৃন্দ ছাড়াও শিক্ষকমণ্ডলী ও শহরের শিক্ষিত মুসলমানরাও বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রীটের আমজাদিয়া হলে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লেখক পরে ভাষণটি সম্পাদনা করে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন।]

মানুষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়

বন্ধুগণ! আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। তন্মধ্যে একটি নেয়ামত হচ্ছে, মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। পথে চলতে গিয়ে ঠোকর লাগলে সে ঝুঁকে পড়ে দেখে পায়ে কিসের ঠোকর লাগল? তারপর পথের সেই পাথরটিকে সরিয়ে দেয় বা সেটিকে এড়িয়ে চলে এবং কোন পথ এ ধরনের পাথরে পরিপূর্ণ অথবা অত্যধিক টেরা-বাঁকা হলে অন্য পরিষ্কার ও সোজা পথ অবলম্বন করে। যে যখন মারাত্মক ধরনের কোনো ভুল করে বসে অথবা কোনো ব্যাপারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় তখন তার কারণ অনুসন্ধান করে এ ব্যর্থতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে। সে সব ভুলের জন্য তাকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হলো ভবিষ্যতে এমন সব ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করে। কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণের এ প্রকৃতিগত যোগ্যতা মানুষের জন্য আল্লাহর দান। সাধারণ জীব-জানোয়ারের মধ্যে এ যোগ্যতা অনুপস্থিত। এরই কারণে মানুষ পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে এবং মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিপুল উন্নতি লাভে সক্ষম হয়েছে।

ভুল না করা মানুষের জন্য প্রশংসার কথা নয়, ভুল মানুষের প্রকৃতি ও মজ্জাগত। হযরত আদম (আ.) থেকে এটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। নিজের ভুল স্বীকার করা, সেজন্য লজ্জিত হওয়া, তার ক্ষতিপূরণ করা, তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা মানুষের জন্য প্রশংসনীয়। কোনো কোনো সময় নিজের ভুল ও পদস্খলনের জন্য সে এমন লজ্জা অনুভব করে এবং এত বেশি অনুতপ্ত হয়, তার ফলে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে যায়। তখন সে এমন স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে ভুল করে তওবা করা ছাড়া কয়েক বছরেও পৌঁছতে পারত না। তার এই উন্নতি দেখে নিষ্কলংক চরিত্র ফেরেশতাদেরও হিংসা হয়। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-ও ভুল করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন নি, বরং এমন ভাষায়

এ ভুলের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং এজন্য লজ্জা প্রকাশ করেছিলেন যার ফলে আল্লাহ্‌র রহমতের সমুদ্রে তুফান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি প্রেমের এমন উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন যেখানে সম্ভবত পদস্খলনের পূর্বে আরোহণ করতে সক্ষম হন নি। তিনি বলেন ঃ

وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর জুলুম করেছি। আর যদি তুমি আমাদেরকে মাফ না কর এবং আমাদের প্রতি করুণা না কর তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' [সূরা আরাফ ঃ ২৩]

এই তওবা ও অনুতাপের ফলে তিনি উন্নতি লাভ করেন। কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর ঘোষণাবাণী শুনিয়েছে ঃ

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى - ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى -

"আর আদম নিজের প্রতিপালকের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করল। কাজেই সে পথভ্রষ্ট হলো। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে পুরস্কৃত করলেন, মেহেরবনী সহকারে তার প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে সোজা পথ দেখালেন।'

[সূরা তাহা ঃ ১২১,১২২]

অন্যদিকে শয়তানের ব্যাপারটি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নিজের ভুল ও নাফরমানীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রইল এবং নিজের কাজের নির্ভুলতা ও বৈধতার জন্যে যুক্তি পেশ করল ঃ

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

"সে বলল ঃ আমি তার চাইতে উত্তম। আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।" [সূরা আরাফ ঃ ১২]

ভুলের কারণে বহুতর সাফল্য

মানুষের উন্নতি, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার ও ক্রমোন্নতিতে ভুলের অংশ সম্ভবত নির্ভুল পদক্ষেপ ও সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার চাইতে কম নয়, বরং মানুষের অনেক বিজয় ও সাফল্য ঐসব ভুলের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মানুষের

নির্ভুল সিদ্ধান্ত ও যথার্থ কর্মধারার মাধ্যমে যেমন সে বহুতর সাফল্য অর্জন করেছে তেমনি অনেক ভুলের মাধ্যমে সে এক নবতর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এ দাবীর সমর্থনে ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। সিনাই উপদ্বীপে হযরত মুসা (আ.) নিরাপদে পৌঁছে যাওয়া ও ফেরাউনের সেনাবাহিনীর লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হওয়া হযরত মুসা (আ.) রাতের অন্ধকারে পথ ভুলে যাওয়ার ফল ছিল। নতুন জগতের (আমেরিকা) আবিষ্কার ছিল কলম্বাসের ভুল ও বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি। ভারতবর্ষের সন্ধানে বের হয়ে ভুলক্রমে তিনি আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছলেন। ইতিহাসের পাতায় এমনি আরো বহু দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ভুলের অনুভূতি না থাকা নির্মল স্বভাবসম্পন্ন মানুষের নীতি নয়

নিজের ভুল উপলব্ধি না করা, নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতাকে কাজে না লাগানো, ভুল ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান না করা, একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকা ও একই গর্তে থেকে বার বার দংশিত হওয়া কোনো সুস্থ ও বিবেকবান ব্যক্তির লক্ষণ নয়, বিশেষ করে মুমিনের জন্য এ অবস্থা কোনোক্রমেই শোভনীয় নয়। কারণ আল্লাহ্ তাকে ঈমানী প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং তার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্য সব চাইতে বেশি আহ্বান জানিয়েছেন। কুরআন মজীদ মুনাফিকদের দুর্বলতার বর্ণনা প্রসংগে বলেছে, তারা ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা থেকে মোটেই উপকৃত হয় না এবং বছরে কয়েকবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয় ঃ

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

"তারা কি দেখে না, তারা প্রতি বছর একবার দু'বার পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়'? কিন্তু এরপরও তারা তওবা করে না কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।" [সূরা তওবা ঃ ১২৬]

মুমিনের এই যোগ্যতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেই একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين -

"মুমিনকে একই গর্ত থেকে দু'বার দংশন করা যায় না।"

ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াত

মাত্র কিছু দিন আগের ঘটনা। একটি প্রাচীন মুসলিম দেশ, যেখানে মুসলমানরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ, যে দেশ ওলামা, মাশায়েখ, মাদ্রাসা ও খানকাহে পরিপূর্ণ ছিল, যে দেশের নগর-বন্দর, গ্রাম, গঞ্জ, মসজিদ ও আল্লাহর গৃহে ভরা

ছিল, যার জন্য শত শত বছর ধরে আওলিয়ায়ে কেরাম চোখের পানি ও কলিজার খুন প্রবাহিত করেন, যে দেশের মাটি তাঁদের অশ্রু সিঞ্চনে সিক্ত এবং যে দেশের আকাশ-বাতাস তাঁদের মধ্যরাত্রির ক্রন্দনে উত্তপ্ত, সেখানে জাতি, অঞ্চল, ভাষা ও সংস্কৃতির দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডব শুরু হলো। দেখতে দেখতে শত শত বছরের পরিশ্রমকে ব্যর্থ ও অর্থহীন করে দিল। মুসলমান নিঃসংকোচে মুসলমান হত্যা করল। নিরপরাধ মানুষকে সাপ ও বিছার মতো নির্বিবাদে হত্যা করা হলো। তাদের প্রতি একটু দয়া প্রদর্শিত হলো না। যারা ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জন্য ওদেশের কোথাও আর আশ্রয়স্থল ছিল না। কোনো অন্তরের অন্তস্থলে তাদের জন্য এক বিন্দু করুণাও ছিল না। কোনো চোখে তাদের জন্য এক ফোঁটা অশ্রু ছিল না। বনে-জঙ্গলে পশু, পাখি শিকার ও পুকুর-খাল-বিল নদীতে মাছ শিকারের ন্যায় মানুষ শিকার করা হচ্ছিল। মেয়েদের ইজ্জত আবরু সংরক্ষিত ছিল না। বৃদ্ধদের বার্ধক্যের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হলো না। নিরপরাধ শিশুদের চীৎকার ও কান্নাকাটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হলো না। নিজের ভাইয়ের জন্য ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট, নির্দয়তা ও হৃদয়হীনতার চরমতম নজীর প্রদর্শন করা হলো। ভাষা-পূজা তাওহীদ বিশ্বাসের ওপর, জাতি ও বংশ পূজা ইসলামী ঐক্যের ওপর এবং জাহেলী গর্ব, অহংকার ও বিদ্বেষ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ওপর এমনভাবে বিজয় লাভ করল যা ইসলামের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো অংশে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ইসলাম ও মুসলমান ইতিপূর্বে কখনো কোথাও এমনভাবে পরস্পরের হাতে লাঞ্ছিত হয়নি। বলা বাহুল্য ইসলাম সর্বাবস্থায় জুলুম, নির্যাতন, হত্যা এবং গোত্রীয়, ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার জাহেলিয়াতের শত্রু–বাঙ্গালী বা বিহারী, আরব বা তুর্কী যে কেউ এর ধারক হোক না কেন। ইসলাম ভ্রাতৃহত্যা ও মুসলমানের রক্তপাতকে কুফরীর সমার্থক এবং সব চাইতে বড় গোনাহর কাজ গণ্য করে।

রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, "দেখো, আমার পরে তোমরা সুস্পষ্ট কাফের হয়ে মরো না, তোমরা একজন অন্যজনের গলা কাটতে থেক না।" অথচ মুসলমানরা মহানবীর (সা.)-এর মহাবাণী সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

সভ্যতার হাতে গড়া আর একটি মূর্তি

মানুষ যখন থেকে দুনিয়ায় বসতি স্থাপন করেছে তখন থেকে দুনিয়ায় বিভিন্ন ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ ধারার প্রচলন হয়েছে। মানুষ হামেশা এদের ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করেছে। এদের কারণে জীবনের আনন্দ ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তাঁর এ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

"হে লোকেরা, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশি ভয় করে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাশালী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছু জানেন এবং সব কিছু সম্পর্কে সচেতন।" [সূরা হুজরাত ঃ ১৩]

অন্যত্র বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ـ

"আর আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণসমূহ পৃথক হওয়া তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্যই জ্ঞানী বিচক্ষণ লোকদের জন্য এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে।' [সূরা রুম ঃ ২২]

কিন্তু মানব জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সেখানে এ ধরনের সঙ্গিন ও বিষাদময় ঘটনাবলী ও হাস্যকর নাটকের প্রচুর সমাগম পরিলিক্ষত হলেও ভাষা ও সংস্কৃতির খাতিরে সংঘটিত কোনো যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না। আরবরা তাদের বাকশক্তি ও ভাষাগত বিদ্বেষের জন্য বিখ্যাত, এমন কি তারা নিজেদের ছাড়া বাকি দুনিয়ার সমস্ত লোককে 'আজমী' অর্থাৎ বোবা বলত। এতদ্সত্ত্বেও আরবরা আজমীদের সাথে ভাষার ভিত্তিতে যুদ্ধ করেছে, ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা লিখিত নেই। ইসলাম এ বিদ্বেষকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছিল। এর নাম দিয়েছিল 'জাহেলী হামীয়াত' বা জাহেলী গর্ব ও মর্যাদাবোধ। এর প্রতি কঠোর ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। একে জাহেলিয়াতের ঘৃণ্য স্মারক, কুফরী ও মূর্তি পূজার সংগ্রাম এবং আল্লাহর ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামান্তর ঘোষণা করেছিল। এর পতাকাতলে মৃত্যুবরণ করাকে হারাম মৃত্যু বা জাহেলী ও অনৈসলামী মৃত্যু গণ্য করেছিল। কিন্তু জাহেলীয়াতের ইতিহাসেও ভাষার ভিত্তিতে এমন কোনো যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এটি আসলে ইউরোপ ও তার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের দান। ইউরোপের এ জাতীয়তাবাদই ভাষা ও সংস্কৃতিকে এ 'পবিত্র' আবরণ দান করেছে এবং একে এমন একটি মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে যার জন্য মানুষের বলিদান করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ভাষাগত বিদ্বেষ ও এজন্য প্রাণ উৎসর্গ কারার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। মানব জাতি ভাষার একটি নতুন 'ক্রুসেড' বা জাহেলিয়াতের (Paganism) সম্মুখীন হয়েছে। মানব জাতি ইতিপূর্বে কখনো এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। ইউরোপের এ প্রপাগান্ডা গভীর চিন্তা ও দূরদৃষ্টি সহকারে তৈরি করা হয়েছিল। যেসব মুসলিম জাতি অত্যন্ত নির্ভুল আকিদা, সুস্থ প্রকৃতি এবং দ্বীনী ও ঈমানী প্রেরণার অধিকারী ছিল এবং যাদের নিকট থেকে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যেত, বরং যাদের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তারা নিজেদের দীন ইসলাম ও সুস্থ প্রকৃতির কারণে কমপক্ষে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় এই ভাষা-পূজা থেকে বহুদূর অবস্থান করবে, তাদের মধ্যে এ প্রপগান্ডা বিস্তার লাভ করে, অথচ এই ভাষা-পূজা আল্লাহর থেকেও কোনো সনদ ও দলিল-প্রমাণের অধিকারী নয় এবং আল্লাহর তুলাদণ্ডে এটি একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সরিষার দানার সমান মূল্যবানও নয়।

কিন্তু হঠাৎ মুসলিম জাহান এবং ইসলাম ও ইসলামী ঐক্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সম্মুখে একটি তুমি পরিস্থিতি দেখা দিল এবং একটি মুসলিম দেশের অন্তস্তল থেকে ভাষার ফিতনা আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হয়। এই বিপর্যয় সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ বা শয়তানের মুণ্ডপাত ও তাকে লাঞ্ছিত করার প্রেরণা কার্যকর ছিল না। ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করা এবং সুকৃতির প্রসার ও দুষ্কৃতির বিলোপ সাধন এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এসব কিছুই এজন্য সংঘটিত হল, ঐ জাতির বিরাট অংশ ফিরিংগী যাদুকর ও জাতীয়তাবাদের চরমপন্থী পূজারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল এবং একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গিয়েছিল।

ইসলামের সুনাম ভীষণভাবে আহত

এই ব্যাপক নরহত্যা, মুসলমানের রক্ত পানির মতো প্রবাহিত করা ও ধন-প্রাণনাশের জন্য যত অশ্রু ঝরানো হোক না কেন, তা অনেক কম বিবেচিত হবে। কিন্তু এই ঘটনাবলীর সব চাইতে লজ্জাকর দিক হচ্ছে এই, এর ফলে ইসলাম-বিরোধীরা ইসলামের ব্যর্থতার সপক্ষে একটি প্রমাণ লাভ করেছে এবং তারা এর থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, ইসলামের মধ্যে সেতু বন্ধনের ও বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে (যাদের ভাষা, বর্ণ ও বংশ বিভিন্ন) ঐক্যবদ্ধ ও একীভূত করার যোগ্যতা নেই। উপরন্তু ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র (State) প্রতিষ্ঠার ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই। এটি

একটি পরোক্ষ ক্ষতি হলেও অন্যান্য সমস্ত ক্ষতিই এর কাছে ম্লান। আপনারা ভারতের বিরাট ব্যবসার কেন্দ্রে বাস করেন, আপনারা জানেন, ব্যবসায়ীর নিকট লাভ-লোকসান, বাজারের ওঠানামা ও ব্যবসায়িক জোয়ার-ভাটার কোনো গুরুত্ব নেই। তার আসল পুঁজি হচ্ছে তার সুনাম ও তার প্রতি আস্থা। এ কারণে কোনো ফার্মের ট্রেডমার্ক অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তা খরিদ করা হয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইসলামের সুনামকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইসলাম প্রচারকারীদের ও তাকে দুনিয়ার সব চাইতে বড় ঐক্যবদ্ধকারী শক্তি (Uniting force) হিসেবে পেশকারীদের জন্য একটি বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে এবং একদিক দিয়ে যে অতীত ইতিহাসের ওপর প্রত্যেক মুসলমান গর্ব করে তার সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছে। আমাদের অতীত ইতিহাসে বলা হয়েছে, ইসলাম আরব-আজম, সাদা-কালো, কোরেইশী-হাবশী, এশীয়-আফ্রিকী, আমীর-ফকির, বাদশা-গোলাম, মাহমুদ ও আয়াজকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিকট এ ইতিহাস সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে সমগ্র বিশ্ব সর্বদা ইসলামের এই সাফল্যের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কিন্তু এখন আমরা কোন্ মুখে একথা বলব, ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এমন ঐক্য ও প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি করে যার ফলে তারা ভাষা-বর্ণ-গোত্রের বিভিন্নতা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং এক দেহ ও মিল্লাতে পরিণত হয়? এটিই হচ্ছে এই বিপর্যয়ের সব চাইতে দুঃখজনক ও শোকাবহ দিক। এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করার মতো শব্দ ও ভাষা আমাদের নেই এবং এজন্য রক্তাশ্রু প্রবাহিত করাও যথেষ্ট নয়।

রোগের বীজ

স্বীকার করি, রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের হাত সাফাই কতিপয় বির্পযয় সৃষ্টিকারী ও আল্লাহদ্রোহী দলের রাজনৈতিক খেলা। কারণে এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে। সরলপ্রাণ জনসাধারণ এর শিকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র জাতির ও দেশবাসীর এত সহজে ঐ সব রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের স্বার্থোদ্ধারের গুটিতে পরিণত হওয়া, এই বন্যায় খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাওয়া এবং তাওহীদ ও শির্ক, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, গড়া ও ভাঙ্গা, বুদ্ধি ও ভাবাবেগের মধ্যে পার্থক্য না করা নিছক একটি আকস্মিক ব্যাপার নয় এবং নিছক নেতৃবৃন্দের বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা, জনতার সরলতা ও অজ্ঞতার ফলশ্রুতি নয়। কোনো দেশের কোনো যুগে কোনো আন্দোলন ততক্ষণ সফলকাম হতে পারে না যতক্ষণ জাতির মধ্যে তাকে গ্রহণ করার যোগ্যতা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত না হয় এবং জাতির মন-মস্তিষ্কে তার ভিত্তি প্রথম থেকে প্রস্তুত না থাকে। যদি জাতি এ আন্দোলনের জন্য প্রথম থেকে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে এ তুফান উঠে মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, বন্যা আসে এবং

চলে যায়। হিস্টিরিয়ারও প্রভাবও হয় সাময়িক এবং তা বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু ঐ অবস্থার ও ঘটনাবলীর এতদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকা ও ঐগুলোর ব্যাপকতা ও সাধারণ্যে প্রসার এ কথাই প্রমাণ করে, দেশে পূর্ব থেকেই এই রোগের বীজ বিদ্যামান ছিল এবং এ জাতির ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন কিছু গলদ রয়ে গিয়েছিল যার ফলে আমাদের আজ এই দুর্দিনের মুখ দেখতে হলো।

যথার্থ চেতনার অভাব

আমাদের মতে এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এ জাতির মধ্যে যথার্থ দ্বীনী চেতনার অভাব। মনের সাথে সাথে মস্তিষ্কেরও মুমিন হওয়া প্রয়োজন। কেবল ইসলামের প্রতি ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। এই প্রসংগে ইসলামবিরোধী দর্শন ও দাওয়াতসমূহের প্রতি ঘৃণাও অপরিহার্য, বরং কুরআন মজীদে বহু স্থানে তাগুত (আল্লাহদ্রোহী শক্তি), শয়তান ও জাহেলিয়াতের আহ্বায়কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অসন্তোষকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ م بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط لَا انْفِصَامَ لَهَا ـ

"অতঃপর যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে এমন একটি মজবুত সহায় অবলম্বন করল যা কখনো ছিন্ন হবে না।" [সূরা বাকারা ঃ ২৫৬]

ইসলামের প্রথম কালেমায় এ অস্বীকৃতিকে স্বীকৃতির পূর্বে স্থান দেয়া হয়েছে এবং 'ইল্লাল্লাহ'-এর আগে 'লা-ইলাহা' বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমানের মধ্যে কুফরী ও কুফরীর নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ভীতি সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে না এবং সে ঈমানের সত্যিকার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "তিনটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। এক. আল্লাহ ও রাসূলকে সে দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে বেশি ভালবাসবে। দুই. কোনো মানুষকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। তিন. যখন আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে নাজাত দান করেছেন তখন কুফরীর দিকে ফিরে যাবার ধারণা হতেই তার মনে এমন ঘৃণা ও ভীতি সৃষ্টি হবে, যেমন আগুনে নিক্ষেপ করার ধারণা থেকে হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

জাহেলিয়াতের যথার্থ পরিচয় জানা অপরিহার্য

মুসলমানের ইসলামের বিরোধিতা করার ও শক্রর ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া থেকে এতই সন্ত্রস্ত থাকা উচিত, স্বপ্নেও এ ধরনের কোনো ঘটনা দেখলে তার চীৎকার, তওবা ও এস্তেগফার করা উচিত। জাহেলিয়াতের প্রতি কেবল আবেগময় ঘৃণাই যথেষ্ট নয়, মুসলমানের জন্য জাহেলিয়াতের যথার্থ পরিচয় লাভ করাও প্রয়োজন। জাহেলিয়াতের ব্যাপারে যেন সে কখনো প্রতারিত না হয়। জাহেলিয়াত যদি কাবার গেলাফ গায়ে জড়িয়ে ও কুরআন মজীদ হাতে নিয়ে উপস্থিত হয় তবুও যেন সে 'লা হাওলা' পড়ে, তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। যে কোনো পোশাকেই জাহেলিয়াত তার সম্মুখে আসুক না কেন, সে যেন তাকে চিনতে পারে। জাহেলিয়াতকে চেনবার মতো অন্তর্দৃষ্টি মুসলমানের থাকতে হবে।

শয়তানের কৌশল ও আক্রমণ পদ্ধতি

শয়তানের কৌশল ও যুদ্ধনীতি হচ্ছে, সে মুসলমানের মধ্যে যেদিক থেকে দুর্বলতা দেখে সেদিক থেকে আক্রমণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিটি শ্রেণীর ওপর একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালায় না এবং একই অস্ত্র ব্যবহার করে না। দ্বীনদার ও আবেদদেরকে সাধারণ লোকের পর্যায়ের ফাসেকী ও দুষ্কৃতির জন্য উৎসাহিত করে না। কারণ এতে তার সাফল্যের আশা নেই। শয়তান তাদের মধ্যে রিয়া প্রদর্শনেচ্ছা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, সম্মান-প্রতিপত্তির মোহ ও হিংসার ন্যায় বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। জাতির শির উঁচু করা, ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব লাভ করা, অন্যের পরিবর্তে নিজেদের দেশের উপায়-উপকরণসমূহ নিজেরা ব্যবহার করা, নিজেদের ওপর নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধিশালী করা, যে কোনো মূল্যে নিজের দেশকে উন্নত করা.............. এ ধরনের সুদৃশ্য ও মনোমুগ্ধকর উদ্দেশে এবং হৃদয়গ্রাহী ও মধুর স্বপ্নের বেড়াজালে বিরাট জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি আটকে পড়েন এবং অনেক সময় বড় বড় দ্বীনদার ব্যক্তিও এগুলোর মোহে অন্ধ হয়ে যান।

প্রতারণার জালে আরব জাতি ও তার শাস্তি

শয়তান আরবদেরকে এই সুখ-স্বপ্নই দেখিয়েছিল। তাদেরকে বলেছিল, কুরআন মজীদ তোমাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর নবী তোমাদের মধ্যে আগমন করেছেন, কাবাঘর ও সারা দুনিয়ার কেবলা তোমাদের দেশেই অবস্থিত, হারেম শরীফ ও আল্লাহর নবীর শেষ বিশ্রাম স্থান তোমাদের মাটিতেই রচিত হয়েছে, তোমরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামে গভীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য যেমনভাবে বুঝতে পার তেমনটি দুনিয়ার আর কোন জাতিই কি বুঝতে পারে? এতদ্সত্ত্বেও

খেলাফতের কেন্দ্র থাকবে তোমাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সমুদ্রের ওপারে কনস্ট্যান্টিনোপলে আর সেখানে থেকে তুর্কী জাতি তোমাদের ওপর শাসন চালাবে? অথচ এই তুর্কীদের ভাষা আরবী নয় এবং বংশও আরবী নয়!

এ যুক্তি অনেক আরবীদের মনে গেঁথে বসল। তাদের অনেকের মনে ছিল ক্ষমতা লাভের স্পৃহা। তারা দীর্ঘ দিন থেকে আরব সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিল। উপরন্তু তুর্কীদের বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ। তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রাধান্যের অনুভূতি ও শাসকসুলভ দৃষ্টিভংগীর কারণে অত্যন্ত বিরক্ত। কাজেই তারা তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তারা বৃটিশ জুয়াড়ীদের স্বার্থোদ্ধারের ক্রীড়নকে পরিণত হলো। মক্কা শরীফে মুসলিম জাহানের কেন্দ্রস্থলে বসে এবং সিরিয়া ও ইরাকের আরবরা নিজেদের দেশে বসে মিত্রশক্তির সাথে সহযোগিতা করল। তাদের পরিকল্পনাকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যাপারে হলো সহযোগী। তুর্কীরা পরাজিত হলো। উসমানী খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটল। মুসলিম মিল্লাত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। পাশ্চাত্য শক্তিদের এখন আর কোনো ভয় ছিল না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো অঙ্গুলি সঞ্চালনকারীও ছিল না। এর ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমি (National Home) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আরবদের বুকের ওপর খোঁটার মতো গেড়ে বসল। বায়তুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের করতলগত হলো। আরবরা যে জাহেলী বিদ্বেষের শিকার হয়েছিল এগুলো হলো তারই ফলশ্রুতি। এর ফলে তারা দু'দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

কুরআন ও হাদীসে জাহেলী গোত্র-প্রীতির নিন্দা

কোরআন ও হাদীসের একজন সাধারণ ছাত্রও একথা জানে, বংশ, গোত্র, রক্তধারা, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ভিত্তিতে কারুর প্রতি অন্ধ সমর্থন ও দল গঠন এবং এগুলোর ভিত্তিতে ভালোবাসা ও ঘৃণা করা, সম্পর্ক গড়া ও সম্পর্ক ভাঙা, যুদ্ধ ও সন্ধি করা জাহেলী গোত্র-প্রীতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসে এর নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ -

"যখন কাফেররা নিজেদের মনে জিদ ও অহংকার করল এবং জিদ ও অহংকারও ছিল জাহেলিয়াতের।" [সূরা আল-ফাতাহ ঃ ২৬]

উপরন্তু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোনো গোত্র-প্রীতির দিকে আহ্বান করে সে মুসলিম দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি কোনো কওম-প্রীতির জন্য মৃত্যুবরণ করে সেও মুসলিম দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ)

একবার একজন মুহাজির ও একজন আনসার নিজের নিজের দলের দোহাই দেয় এবং মুহাজির 'ইয়া আলমুহাজিরিন', (হে মুহাজিররা) আর আনসার 'ইয়া আলআনসার' (হে আনসাররা)-এর স্লোগান দেয়। রসূলুল্লাহ (সা.) একথা শুনে তাদেরকে বললেন, "এই জাহেলী আহ্বানগুলো পরিহার করো। এগুলো নোংরা ও দুর্গন্ধময়।" (বুখারী)

রসূলল্লাহ (সা.) এই জাহেলী সম্পর্কসমূহকে, এগুলোর নামে আহ্বান জানানো ও এগুলোর দোহাই দেয়াকে এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, যারা এগুলোকে কাজে লাগায় তিনি সর্বপ্রকারে তাদের হিম্মতহারা করার, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তিনি কখনো কোনো মহাশত্রুর জন্যও কঠোর ও কর্কশ শব্দ ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না, তবুও এই জাহেলিয়াতের আহ্বায়কদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ভাষা প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকোচ করার ও ইশারা-ইংগিতের আশ্রয় নিতেও নিষেধ করেছেন। (দ্রষ্টব্য ঃ মিশকাত ২য় খণ্ড, আল ফাসলুস সানি, বাবুল মুফাখিরাতে ওয়াল আসাবিয়্যাহ)

ভাষা আল্লাহর রহমত না আজাব?

আসলে ভাষার বিভিন্নতা একটি আল্লাহ্প্রদত্ত ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার, বরং কুরআন মজীদে একে আল্লাহ্র একটি দান ও ইলাহী শক্তির একটি নিশানীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ -

"এবং আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণসমূহের বিভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।" [সূরা আর রূম-২২]

কিন্তু যখন এই ভাষার ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তার পবিত্রতা বর্ণনা করা আরম্ভ হয়, তাকে পূজা করা হয় এবং তার সম্মুখে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করা হয় তখন তা রহমতের পরিবর্তে আজাব এবং গড়ার মাধ্যম হবার পরিবর্তে ধ্বংসের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়। তখন তার বেদীমূলে এমনভাবে

মানুষের বলিদান করা হয় যেমন এক সময় দেবতার বেদীমূলে মানুষকে পশুর ন্যায় বলিদান করা হতো। ভাষার সৃষ্টি হয়েছে ভাঙা মনকে জোড়া লাগাবার জন্য। ভাষার ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত একটি শব্দ মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবে, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার পুষ্প বর্ষণ করবে, অনাত্মীয়দের আত্মীয়, দূরকে নিকট এবং শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা, অনল বর্ষণ করা, ভাইকে ভাই থেকে আলাদা করা, ঘৃণার বিষ বাষ্পে বাতাস বিষাক্ত করা তার কাজ নয়। ভাষার সাহায্যে যদি এসব কাজ করা হয়ে থাকে, তাহলে এর চাইতে বোবা ও বাকশক্তিহীন হওয়া হাজার গুণ ভালো। এ অবস্থায় মানুষ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, দুনিয়ার সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষ যদি বোবা হয়ে জন্মগ্রহণ করত এবং ইশারা-ইংগিতে আলাপ করত, তাহলে সম্ভবত তা মানবতার জন্য উত্তম ফলদায়ক হতো। তাহলে আর নিজের নিজের ভাষার অহংকার ও প্রেমে মত্ত হয়ে তারা নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করত না, মূক নারী ও নিরপরাধ-নিষ্কলংক শিশুদেরকে রক্তসাগরে স্নান করাত না এবং নিজেদের দেশকে অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করত না।

ভাষার চাইতে মানুষের দাম বেশি

মানুষের জন্য ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, ভাষার জন্য মানুষ সৃষ্টি হয়নি। ভাষা ও সাহিত্যের সমগ্র সম্পদ, হাজার হাজার মূল্যবান সাহিত্য, হাজার হাজার কবিতা গ্রন্থ ও অলংকার সাহিত্যের বিশাল সমুদ্রের চাইতে একটি মানুষের প্রাণের দাম অনেক বেশি। ভাষা জন্ম নিয়েছে, আবার মরে গেছে। ভাষা কখনো সংকুচিত হয়েছে, আবার সম্প্রসারিত হয়েছে। ভাষার চেহারার অনেক পরিবর্তন অনেক রূপান্তর হয়েছে। কিন্তু মানুষ চিরকাল মানুষই আছে এবং হামেশা মানুষই থাকবে।

দ্বীনী কর্ম ও চেতনার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা

আমাদের একথা স্বীকার করা উচিত, আমরা দ্বীনী প্রেরণার ও ইবাদতের রুচি ও দ্বীনী তথ্য-জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য যত অধিক চেষ্টা করেছি, দ্বীনের যথার্থ চেতনা লাভ ও এই চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ততটা চেষ্টা করিনি। এর ফলে বহু মুসলিম দেশ দ্বীনী কর্ম ও চেতনার মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য দেখা যাচ্ছে না। এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে অত্যন্ত দ্বীনদার, আবেদ ও তাহাজ্জুদ গুজার কিন্তু তার দ্বীনী চেতনা একেবারে কাঁচা, আনকোড়া ও শিশু পর্যায়ের। অনেক সময় দেখা যাবে, সে দ্বীনের মৌলিক চাহিদা সম্পর্কেও অজ্ঞ। সে এমন সব বড় ভুল করে বসবে যা কোনো সচেতন মুসলমানের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের কোনো পার্থক্যই বুঝবে না এবং অতি সহজেই কোনো জাহেলী দাওয়াত ও প্রতারকের প্রতারণার শিকারে পরিণত হবে আর সেই

প্রতারক তাকে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য ও ইসলামের শিকড় কাটার কাজে ব্যবহার করবে। সে অত্যন্ত সরল প্রাণে ও সদুদ্দেশে এই কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং তার এই কার্য দ্বীনের চাহিদা ও দাবীসমূহের মধ্যে সে কোনো প্রকার বিরোধ ও বৈপরীত্যও অনুভব করবে না। ইসলামের ইতিহাসে এর অসংখ্য নজীর পাওয়া যাবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এরই প্রকৃত নমুনা। দ্বীনী প্রেরণার দিক দিয়ে যেমন বাংলার মুসলমান হিন্দুস্থানের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি সুনামের অধিকারী ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা দ্বীনের ব্যাপারে নরম দিল ও আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করার মতো কোমল হৃদয়ের অধিকারী করেছিলেন, যারা দ্বীন ও দ্বীনী ঐতিহ্যসমূহের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করত, যারা দ্বীনী সভা-সমিতি ও ওয়াজ-নসীহতের মজলিসে বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হতো এবং পতংগের ন্যায় সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা বহু স্থানে রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের দুষ্ট বুদ্ধির শিকারে পরিণত হয়েছে, রক্তের হোলি খেলায় শরীক হয়ে গেছে এবং কমপক্ষে একটি সচেতন জাতিকে যে পর্যায়ের সাহসিকতা সহকারে ফিতনার মুকাবিলা করা উচিত সে পর্যায়ের সাহসিকতা সহকারে ঐ ফিতনার মুকাবিলা করতে পারেনি।

সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণাংগ প্রশিক্ষণ

সাহাবাগণের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের পূর্ণাংগ ও ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত দান করেছিলেন। একদিকে তাঁদের মধ্যে কর্মের এমন প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়েছিল যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল, অন্যদিকে তাদের মধ্যে এমন একটি চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার ফলে তাঁরা সব সময় ভুল ও নির্ভুল, জুলুম ও ইনসাফ এবং জাহেলিয়াত ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন। তাঁদের মন-মস্তিষ্ককে এমন সুস্থ, সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল যার ফলে কোনো বিকৃত ও টেরা-বাঁকা জিনিস তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারত না। কোনো সোজা নলের মধ্যে যেমন কোনো বাঁকা জিনিস প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি তাঁদের ভারসাম্যপূর্ণ মন-মস্তিষ্কও কোনো বাঁকা জিনিস গ্রহণ করত না।

আমি এর একটি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকি। আপনারা জানেন, রসূলুল্লাহর (সা.)-এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক কি ছিল এবং কেমন ছিল? এক কথায় বলা যায়, তওহীদের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করে একজন মানুষের প্রতি একজন মানুষের যে পর্যায়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মানসিক সম্পর্ক হতে পারে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক ঠিক ছিল সেই

পর্যায়ের। আল্লাহর পরে তাঁরা তাঁকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সত্তা মনে করতেন। তাঁরা জানতেন, তাঁর পবিত্র মুখনিসৃত যে কোনো বাণীর উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র অহী, তাঁর হেদায়েত। তিনি প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী নিজের মন থেকে কথা বলতেন না। তাঁদের ঈমান ছিল ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّاوَحْىٌ يُّوْحٰى -

"আর না তিনি প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী মুখ থেকে কোনো কথা বলেন। এ (কুরআন) তো আল্লাহ্র হুকুম (তাঁর দিকে) পাঠানো হয়েছে।" [আন-নাজম ঃ ৩, ৪]

এ বৈশিষ্ট্য সম্মুখে রেখে এবার শুনুন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণের মজলিসে বললেন, তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো জালেম অবস্থায়, মুজলুম অবস্থাও।"

ওপরে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি সাহাবাগণের যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার দাবী অনুযায়ী সাহাবাগণের বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর কথা মেনে নেয়া ও তাকে কার্যকরী করা উচিত ছিল। এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দেবার ও আরবী ভাষাভাষী হবার পরও তাঁদের পক্ষে আরো কিছু জিজ্ঞেস করার ও এর ব্যাখ্যা চাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এতদিন তাঁদের যে পর্যায়ের তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল, রসূল (সা.)-এর পবিত্র মুখে তাঁরা জুলুমের যে নিন্দা শুনে আসছিলেন এবং জালেমের সহযোগিতা না করার জন্য তাঁদের যেভাবে নির্দেশ দিয়ে আসা হচ্ছিল, তার ও আজকের এ নির্দেশের মধ্যে তাঁরা সুস্পষ্ট বিরোধ ও বৈপরীত্য দেখতে পেলেন। তাঁরা নীরব থাকতে পারলেন না। আদবের সাথে আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! মজলুম অবস্থায় তো সাহায্য করা যায় কিন্তু জালেম অবস্থায় কেমন করে সাহায্য করা যেতে পারে?" রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের এ প্রশ্নে কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করলেন না এবং তাঁদেরকে ধমকও দিলেন না, বরং তিনি হাসি মুখে নিজের এ ফরমানের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, জালেমকেও সাহায্য করা যেতে পারে এবং করা উচিত কিন্তু এর পদ্ধতি কি? জালেমের সাহায্য হচ্ছে এই, তার হাত টেনে ধরো, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখো। (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁর এ ব্যাখ্যার পর বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল।

স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য জায়েজ নয়

এই চেতনার আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। রসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা.) নামক জনৈক সাহাবীর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি বাহিনী পাঠালেন। সীরাত ও ইতিহাসের পরিভাষায় এ ধরনের বাহিনীকে বলা হয় 'সারীয়া' বা ক্ষুদ্র বাহিনী। রসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহর (রা.) সাথীদের নিজের আমীরের পূর্ণ আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। একবার আমীর কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশটি পালন করতে সাথীরা একটু বিলম্ব করলেন। আমীর রাগান্বিত হলেন। সাথীদের কাঠ জমা করার হুকুম দিলেন। কাঠ জমা হয়ে গেলে তাতে আগুন লাগালেন। একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হলো। তিনি সাথীদের ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিলেন। সাথীরা অস্বীকার করলেন। তিনি সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা.) কি তোমাদের আমার আনুগত্য করার হুকুম দেননি? সাথীরা বললেন ঃ অবশ্যি দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, এই আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং রসূলুল্লাহর (সা.) নেতৃত্বে গ্রহণ করেছি, এখন আমরা এর মধ্যে কেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি? ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। অতঃপর এ বাহিনীটি মদীনায় ফিরে এলেন বাহিনীর আমীর রসূলুল্লাহর (সা.) আদালতে এ মামলাটি পেশ করলেন এবং নিজের সাথীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাথীদের কর্মের প্রতি সমর্থন জানালেন এবং বললেন ঃ যদি তারা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে আর কোনোদিন সেখান থেকে বের হতে পারত না। তিনি বললেন, "সৎ কর্মের ক্ষেত্রেই আনুগত্য বৈধ।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি উম্মতকে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নীতি দান করেছেন। প্রতি যুগে এ নীতি মুসলিম উম্মতকে পথ দেখিয়ে আসছে। এ নীতিই প্রতিটি সংকটময় পরিস্থিতিতে জালেম ও একনায়ক (Dictator) বাদশাহদের অন্ধ আনুগত্য ও ভ্রান্ত পথে পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের শর্তহীন সহযোগিতা থেকে মুসলিম জাতিকে বিরত রেখেছে। এ নীতিটি হচ্ছে, কোনো সৃষ্টির এমন আনুগত্য জায়েজ নয় যার ফলে স্রষ্টার (আল্লাহ) নাফরমানী হয় এবং তাঁর কোনো নির্দেশ ভঙ্গ হয়।" (সহীহ হাদীস ঃ মুসনাদে আহমদ ও মুসতাদরাকে হাকেম)

ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রতিটি বিরাট বিরাট সংকটময় পরিস্থিতিতে মুসলমানরা নিজেদের মস্তিষ্কের ভারসাম্য ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার শক্তি বজায় রেখেছেন এবং তারা প্রতিটি ফিতনার অগ্নিকুণ্ডের ইন্ধন হতে রাজি হননি। তাদের মধ্যে এমন সব বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ, সংস্কারক ও আলেমের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা সমাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে অস্বীকার করেছেন এবং বাতাসের

গতিমুখে চলতে রাজি হননি। কারবালার ময়দান থেকে যে ঘটনার উন্মেষ এবং কোন না কোন আকারে বর্তমানেও যার চেহারা দেখা যেতে পারে সে সব 'লা-তা আতা লিমাখলুকিনফী মায়াসীয়াতিল খালেক' (স্রষ্টার নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য জায়েজ নয়)–এই স্বর্ণোজ্জ্বল নীতিরই ফলশ্রুতি।

আঘাতের উপশম

প্রিয় যুবক বন্ধুগণ। আঘাত অত্যন্ত গভীর। কিন্তু এমন কোন আঘাত নেই যার উপশম হয় না এবং যার নিরাময় সম্ভব নয়। এজন্য শর্ত হচ্ছে বুদ্ধি খাটানোর ও দৃঢ় সংকল্প করার। হারানো ধন খুঁজে পাওয়ার এবং পথ হারিয়ে বিপথে পরিচালিত কাফেলাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্রতী হন। মুখের ভাষা থেকে যদি বিষ ছড়ানো হয়ে থাকে তাহলে বিষ নষ্টকারী মহৌষধও ছড়ানো যেতে পারে, বরং এ কাজটি প্রথমটির চাইতে অধিক সহজ ও বাস্তবসম্মত। কারণ ভাষা মানুষের মনকে জোড়া লাগাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ভাঙার জন্য নয়। ভাষা সৃষ্টির মূলে এটিই আল্লাহর হুকুম এবং এটিই বাস্তবসম্মত।

ভাষার ইসলামী প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া বিপজ্জনক

কোনো ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী চিন্তা-ধারণা, ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও পরিভাষাসমূহের সাথে পরিচিত না থাকা এবং দ্বীনী ইলমের ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয়-বিবেকের সাথে ভাষার নিকটতম সম্পর্ক বিদ্যমান। যে ভাষার ওপর অনৈসলামী চিন্তা ও অনৈসলামী সাহিত্যের আধিপত্য, যে ভাষার ওপর অনৈসলামী ছাপ সুস্পষ্ট, যে ভাষা-ভাষীদের চিন্তা-পদ্ধতি ও মনের কথা প্রকাশ করার পদ্ধতি ভিন্নতর, যে ভাষার উপমা, রূপক, প্রবাদ প্রভৃতি কোনো মুশরেকী সভ্যতার সংস্কৃতি বা দর্শন থেকে গৃহীত এবং তার মনীষীবর্গ, সাহিত্যিক ও কবি, তার সংস্কারক, আহ্বায়ক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ সে ভাষাভাষীদের জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ বিবেচিত হয়। উপরন্তু যে পরিবেশে ইসলাম উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ করেছে সে সম্পর্কেও যারা অজ্ঞ থাকে, তারা হামেশা চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাদের জাহেলী গোত্রপ্রীতিকে হামেশা জাগ্রত করা হবে। জাতি-পূজা ও ভাষা-পূজার একটি শ্লোগানই তাদেরকে পাগল করে দেবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা এরই নমুনা দেখেছি। এখন এই বিপদের গতিরোধ করা আপনাদের কর্তব্য : আপনারা ঐ ভাষা শিখুন এবং খুব ভালো করে শিখুন। ঐ ভাষা ও সাহিত্যকে কেবল ইসলামী চিন্তা দর্শনে ভরে তুললে হবে না, বরং তার প্রাণ ও বিবেককেও মুসলমান বানাতে হবে। তার প্রকৃতিকে ইসলামী বানাতে হবে। যে সব ব্যক্তি ও মনীষী তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখে এবং মুশরেকী চিন্তা ও

দর্শনের নিকটবর্তী করে, তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও চিন্তাগত প্রাধান্য খতম করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের মধ্যে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য করার, ইসলামকে ভালোবাসার ও জাহেলিয়াতকে ঘৃণা এবং ভাষা, জাতি ও দেশের দোহাই দিয়ে যেন তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে আলাদা করা সম্ভব না হয়।

নতুন যুগের উন্মেষ হবে

আল্লাহ্‌র সাহায্যে আপনারা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হলে আমাদের আগের ভুল, যার ফলে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর উদ্ভব হলো, একটি বিরাট সাফল্যের সূচনা করবে। মুসলিম মিল্লাতের একটি মূল্যবান অংশ, যার মধ্যে হাজার হাজার আলেম ও শত শত ওলী জন্ম নিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আজো ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও দ্বীনের জন্য গর্ব ও মর্যাদাবোধ পরিলক্ষিত হয় এবং যাঁদের পূর্বপুরুষরা নিকট অতীতে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বীর মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের (র.) নেতৃত্বে ইসলামের জন্য এমন সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে জিহাদ করেছেন যে, উইলিয়াম হান্টারের ন্যায় সমালোচকরাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন, তাঁরা আবার নতুনভাবে শক্তিশালী হতে সক্ষম হবেন। একটি নব যুগের সূচনা হবে।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ - بِنَصْرِ اللّٰهِ ط يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

"আর সেদিন মুমিনরা খুশী হবে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, তিনি যাকে চান তাকে সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও করুণাময়।" [সূরা আর রূম ঃ ৪-৫]

অবক্ষয়ের উৎস

পাপের প্রবণতা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে

[মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী লক্ষ্ণৌ শহরের গঙ্গ প্রসাদ মেমোরিয়াল হলে ১৯৫৪ ইং সনের ৯ জানুয়ারী এই ভাষণ দেন। শহরের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গসহ হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত মহলের একটি মিশ্র সভা ভাষণটির শ্রোতা ছিল।]

ইতিহাস পাঠ

আপনাদের অধিকাংশই ইতিহাস পাঠ করে থাকবেন। মানুষ আজকের নতুন কোন প্রাণী নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের বিচরণ রয়েছে। তার কোটি বছরের ইতিহাস রয়েছে সংরক্ষিত। সে ইতিহাসের প্রবাহ পানির প্রবাহের মত সমান্তরাল নয়। তাতে রয়েছে ভীষণ উত্থান-পতন। সেই ইতিহাসের কোথাও মানুষকে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরূপে দেখা যায়, কোথাও অতি নীচু। কখনো মনে হয়, এ তো মানুষের ইতিহাস নয়, এ যেন রক্তচোষা হিংস্র জন্তুর ইতিহাস! মনে হয় এ ইতিহাস যার-তার, সকলের হতে পারে, কিন্তু মানুষের নয়। এ ইতিহাস অধ্যয়নে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে; আমাদের মাঝে এমন সব মানুষও অতিক্রান্ত হয়েছেন! আপনারা ও আমরা কেমন মানুষ, এ সিদ্ধান্ত তো নেবে অনাগত প্রজন্মের লোকেরা। কিন্তু এ অনুমান আমরা করতে পারি মানুষের অতীতের রেকর্ড কেমন ছিল। সে সবের মাঝে এমন কিছু সময় ও পর্বও পরিলক্ষিত হয় যে, যদি সম্ভব হতো তাহলে ইতিহাস থেকে আমরা সে সব পৃষ্ঠা উপড়ে ফেলতাম। সেগুলো এমন রেকর্ড যে, আমরা শিশুদের হাতেও তা তুলে দিতে প্রস্তুত নই। আমার দায়িত্ব সেই ক্রান্তিকালের কাহিনী শোনানো নয়, বরং ইতিহাসে এ রকম যে সব অনাকাঙ্ক্ষিত পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মাঝে যাবতীয় অমঙ্গল ও অবক্ষয়ের শিকড় কী ছিল সেই আমোঘ বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

সমাজ ও সংস্কৃতির পচন

সাধারণত কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা কতিপয় ব্যক্তিও কখনো একা এক ব্যক্তিকেই সম্পূর্ণ সমাজের ও (Society) অবক্ষয়ের জন্য মানুষ দায়ী করে থাকে। মানুষ মনে করে, এই অসাধু গোষ্ঠী কিংবা এই বিভ্রান্ত ব্যক্তি জীবনের গতিকে এক ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্যে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণার সাথে আমি অভিন্ন মত পোষণ করতে পারছি না। ইতিহাস অধ্যয়নের ওপর ভিত্তি করে আমি বলছি, একটি নষ্ট মাছ সম্পূর্ণ পুকুর পচিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু একজন

মানুষ সমগ্র সমাজের অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে না। বাস্তবতা হচ্ছে ভালো সমাজে মন্দ লোকের অবকাশ থাকতে পারে না। সেখানে তার নিষ্কৃতি সম্ভব হয় না। হা-হুতাশ করে সে মারা যায়। তেমনি যে সমাজ ও সংস্কৃতি মন্দের উৎসাহ যোগায় না, সে সেই মন্দ লোকটিকেও স্বাগত (Welcome) জানাতে প্রস্তুত থাকে না। অসততা ও অবক্ষয় সেখানে তড়পাতে থাকে; তার শ্বাস ফুরিয়ে যেতে থাকে এবং এক সময় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

প্রতিটি যুগেই ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ মানুষ ছিল। কিন্তু সকল মন্দের জন্য মন্দ লোকদের দায়ী করা এবং সকল মন্দ কর্মের দায় তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। কিছু মন্দ লোকের প্রকাশ হলেও এর অর্থ এরূপ করা যায় না সম্পূর্ণ জীবনাচারের লাগাম তাদের হাতেই ছিল, তারা যেভাবে ইচ্ছা জীবন ও যিন্দেগীর গতি সেভাবেই ঘুরিয়ে দিত, বরং বিষয়টি হলো, খোদ সে সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির মাঝেই অবক্ষয় এসে গিয়েছিল। সেকালের আত্মা (Conscience) পচে গিয়েছিল। তার ভেতরে অন্ধকার ও অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। রিপুর তাড়না পূরণের প্রবৃত্তি চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল জঘন্যভাবে, স্বার্থবাদী ও আত্মপূজারী হয়ে গিয়েছিল সমাজ। যে হৃদয়ে পচন ধরে যায়, যে মন পাপী হয়ে ওঠে, অপরাধ থেকে তাকে আপনি কোনভাবেই ফেরাতে পারবেন না। আপনি তাকে বেড়ি দিয়ে আটকিয়ে রাখলেও পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন না।

স্বার্থপর মানুষ

প্রতি যুগেই এমন কিছু মানুষ ছিল যারা বিশ্বাস করত, শুধু আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজনই মানুষ আর অন্য সব মানুষ হলো আমাদের ভৃত্য-নফর। এমন কিছু মানুষও আছে, যারা কোটি মানুষকে বেঁচে থাকতে দেখে বটে, কিন্তু নিজেদের সীমাবদ্ধ একটি গোষ্ঠীকেই শুধু মানুষ গণ্য করে। মনে করে, সমগ্র পৃথিবীতে শুধু তাদের পরিবারের দশ-এগার কিংবা বিশ-পঁচিশজন মাত্র প্রকৃত মানুষ বসবাস করে।

সর্বকালেই এমন কিছু মানুষের সন্ধান মেলে, যারা নিজের সমস্যা ও নিজের আত্মীয়-স্বজন ও সংশ্লিষ্টদের দেখার ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী হয়। অন্যদের দেখার বিষয়ে তাদের চোখ বুজে আসে। কেউ কেউ আবার দু'রকম চোখের অধিকারী হয়। এক চোখে তারা নিজেদের দেখে। অন্য চোখে দেখে সমস্ত পৃথিবীটাকে। এদের কারণেই কোথাও মানুষ চোখে পড়ে না। আমার ধারণা, এদের কাছে সেই চোখই রয়েছে, যে চোখে এরা আপন শিশুকে আকাশের সাথে গল্প করতে দেখে, নিজের সামান্য তুচ্ছ জিনিসকে এরা পর্বত মনে করে আর অন্যের পাহাড়কেও মনে করে বিন্দু।

সংশোধনের বিচিত্র প্রস্তাব ও অভিজ্ঞতা

দুনিয়ার বিভিন্ন মানুষ যার যার ধারণা ও উপলব্ধি অনুযায়ী জীবন-শুদ্ধির পন্থা চিন্তা করেছে এবং তা কার্যকর করা শুরু করেছে।

কেউ বলেছে, সকল অবক্ষয় ও মন্দের মূল হচ্ছে মানুষের অভাব। পেট ভরে মানুষ খাবার খেতে পারছে না, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাধি। তারা এই বিষয়টিকে নিজেদের মিশন বানিয়ে নিয়েছে। ফলে পাপ আরো বেড়েছে। প্রথমে মানুষ ছিল দুর্বল। পাপও সে তুলনায় ছিল কমজোর। তারা যখন রক্তের ইনজেকশন দিয়েছে এবং জীবনী শক্তি (Vitality) বৃদ্ধি করেছে, তখন তাদের পাপও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। হৃদয় বদলায় নি , আত্মা বদলায় নি, বদলায় নি চেতনা। কিন্তু শক্তি বেড়ে গেছে, চেতনাহীনতা জন্ম নিয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, পূর্বে ছেঁড়া পোশাকে পাপ হতো, এখন উজ্জ্বল ঝলমলে পোশাকে পাপ হচ্ছে। পূর্বে শক্তিহীন ও প্রজ্ঞাহীন হাতে পাপ হতো, এখন শক্তিধর ও প্রজ্ঞাবান হাতে পাপ হচ্ছে।

কেউ বলেছে, শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। মূর্খতা ও নিরক্ষরতাই অনিষ্টের শিকড় ও সকল মন্দের মূল কারণ। জ্ঞান বেড়েছে, মানুষ নতুন নতুন প্রজ্ঞা অর্জন করেছে এবং শিখেছে নতুন নতুন ভাষা। কিন্তু যাদের আত্মা নষ্ট, মস্তিষ্ক বক্র এবং হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল পাপ, তারা বিনাশ ও ধ্বংসের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে জ্ঞানকে। সহজ কথা হলো, কামারের যোগ্যতা যদি চোরের অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সেই চোর তালা ভাঙতে শিখবে। এখন যদি কারো মাঝে আল্লাহভীতি ও মানবিক সহানুভূতি প্রবল না থাকে, অবিচার ও অত্যাচার তার স্বভাব হয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞান তার হাতে অত্যাচার, দাঙ্গা ও বিপর্যয়ের উপকরণ তুলে দেবে। তাকে শেখাবে চুরি আর পাপের নতুন নতুন কলা-কৌশল।

কোন কোন লোক সংগঠনকে সংশোধনের উপায় মনে করেছে এবং তার সকল শক্তি ব্যয় করেছে মানুষকে সংগঠিত করার পেছনে। ফল হলো উচ্ছন্নে-যাওয়া ব্যক্তিদের একটি বিভ্রান্ত সংঘ সংগঠিত হলো। যে কর্ম এতদিন পর্যন্ত অসংগঠিতভাবে হচ্ছিল, এখন তা শুরু হলো সুসংগঠিতভাবে। এখন ষড়যন্ত্র ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনা ঘটতে লাগল। মানুষ চরিত্র সংশোধন, হৃদয় ও আত্মশুদ্ধির দিকে তো দৃষ্টি দেয়নি। ভালো-মন্দ লোকদের সংগঠিত করারই কর্ম মনে করেছে। ফল হয়েছে, চরিত্রহীনতার শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। আমি বলব ডাকাত, চোর, সন্ত্রাসী ও চরিত্রহীনদের নিয়ে যদি বিপর্যয়ের সংগঠন না হতো তাহলে ভালই হতো।

কেউ বলেছে, ভাষার বিভিন্নতা অধিক সংকট ও বিপর্যয়ের মূল কারণ। ভাষা এক ও সম্মিলিত হওয়া উচিত। ভাষার অভিন্নতা হলো দেশের উন্নতি, জাতির অগ্রসরতা ও মানবতার সেবা। কিন্তু মানুষের চেতনার যদি পরিবর্তন না হয়, হৃদয়ের চাহিদা ও মনের প্রবণতাগুলো যদি না বদলায়, তাহলে ভাষার পরিবর্তন কিংবা বচন অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় কি বিশেষ কোন্ উপকার হবে? কল্পনা করুন, যদি পৃথিবীর সকল চোর-অপরাধী অভিন্ন বচনে কথা বলে এবং একটি ভাষা বেছে নেয়, তাহলে পৃথিবীর কি লাভ হবে তাতে? এতে কি চৌর্যবৃত্তি আর অপরাধের দ্বার রুদ্ধ হবে? আমি কিন্তু মনে করি, চুরি ও অপরাধ কম হওয়ার স্থলে এ পরিস্থিতিতে তা আরো বেড়ে যাবে, এমন কি অপরাধী চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এতে আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে।

কেউ বলেছে, সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ও মানবতার মহত্তম সেবা হলো সংস্কৃতি এক করে ফেলা। কিন্তু আপনাদের কি জানা নেই, এখানে সংস্কৃতির তেমন কোন লড়াই নেই? এখানে লড়াই হলো অহমিকার। পঞ্চাশের দশকের ভারতের অবস্থাকে আপেক্ষিক বিশ্লেষণে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এই কথাটি বলেছেন–অনুবাদক 'আমি ছাড়া কেউ কিছু না' এই ধ্বংসাত্মক অহংবোধ এখানে ঠোকাঠুকি করছে। আমাদের অনেক পথনির্দেশক নেতৃবর্গ ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বলতে শুরু করেছেন, যদি সমস্ত পৃথিবীর কালচার এক হয়ে যায়, তাহলে মানবতার তরী কূলের সন্ধান পাবে। যদি সমগ্র দেশের কালচার ও সংস্কৃতি এক হয়ে যায়, তাহলে এই দেশের অধিবাসীরা শান্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধুগণ! সংস্কৃতির ঐক্য উপকারী কিছু নয়, উপকারী হচ্ছে হৃদয়ের ঐক্য। কবি ভুল বলেন নি–

'উত্তম মনের ঐক্য, ভাষার ঐক্যের চেয়ে।'

যদি মানুষ এক মনের না হয়, তবে ভাষার অভিন্নতা ও সংস্কৃতির ঐক্যে কোন লাভ নেই। যেসব লোকজন গোড়া থেকেই এক ভাষাভাষী এবং যাদের সংস্কৃতি এক ও সম্মিলিত, তাদের মাঝে কী এমন ভালোবাসা ও ঐক্য বিদ্যমান? তারা কি একে অপরের প্রতি অবিচার করে না? তাদের একজন অন্যজনের সঙ্গে কি প্রতারণা করে না? তাদের মাঝে কেউ কি অপরের তুলনায় ব্যর্থ ও বিচলিত নয়? এক কালচার, এক সংস্কৃতি ও একই ভাষার মানুষ কি পরস্পর লড়াই করছে না?

কেউ কেউ বলছে, পোশাক এক হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু যদি কোন মহারথীর অভ্যাস হয়ে যায় অন্যের কলার চেপে ধরার কিংবা পকেট কাটার, সে কি পোশাকের সম্মান করবে? সে কি শুধু এই কারণে তার ইচ্ছা পূরণ করা থেকে

বিরত থাকবে যে, তার মতো পোশাক অন্যের গায়েও ঝুলছে। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যদি হৃদয়ে না থাকে, তবে পোশাকের প্রতি সম্মান আসবে কিভাবে? পোশাকের মূল্য ও মর্যাদা তো মানুষের কারণেই!

হৃদয়ের পরিবর্তনে জীবনের পরিবর্তন

মানুষ ও মানবতার যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের সমাধান পোশাকের অভিন্নতা নয়, নয় ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলন, নয় রাষ্ট্র ও দেশের ঐক্য, নয় জ্ঞান ও সম্পদ, নয় সংস্কৃতি ও সংগঠন, নয় উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য। এই সবের মাঝে কোন একটাও এমন শক্তি নয় যা পৃথিবী পাল্টে দিতে পারে। হৃদয়ের জগত যতক্ষণ পর্যন্ত না বদলায়, বাইরের দুনিয়াও ততক্ষণ পর্যন্ত বদলাতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হৃদয়ের মুঠোর ভেতর। জীবনের সকল অবক্ষয় ও ধ্বংস হৃদয়ের পচন থেকেই শুরু হয়েছে। লোকে বলে, মাছ মাথা থেকে পচতে শুরু করে। আমি বলি, মানুষের পচন হৃদয় থেকে শুরু হয়। এখান থেকেই অবক্ষয় ও পচনের সূচনা হয় এবং সম্পূর্ণ যিন্দেগীতে তা ছড়িয়ে পড়ে।

স্বভাব পাল্টে দিয়েছেন আম্বিয়া (আ.)-গণ

আম্বিয়া (আ.)-গণ এখান থেকেই তাঁদের কাজ শুরু করতেন। তাঁরা খুব ভালো করেই বুঝতেন. এসব কিছুই মূলত হৃদয়ের অপূর্ণতা। মানুষের মনের ভেতর পচন ধরেছে। মনের ভেতরে চুরি, জুলুম ও প্রতারণার প্রতি উৎসাহ ও স্পৃহা জন্ম নিয়েছে। তার ভেতরে রিপুর আধিপত্য রয়েছে, যা সর্বদা তাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে আর সে শিশুর মতো তার ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করছে। আম্বিয়া (আ.)-গণ বলেন, সকল মন্দের শিকড় হলো মানুষের পাপ তার মাঝে মন্দ কাজের প্রেরণা ও অকল্যাণের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ হলো, তার আত্মশুদ্ধি ঘটানো হোক এবং হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা হোক।

মানুষকে তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকতে দেখতেন। সেই দৃশ্য দেখে তাঁদের মন যে পরিমাণ ব্যথিত হতো, পৃথিবীতে অন্য কারুর মনে ততোটা ব্যথা হতো না। খানা-পিনা করা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু তাঁরা বাস্তবতাকে ভালোবাসতেন। তাঁরা সেটাকেই মূল সমস্যারূপে চিহ্নিত করে তার পিছু লেগে যেতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন এটা অবক্ষয়ের ফল, মূল কারণ নয়। তাঁরা জানতেন, যদি লোকজনের উদর পূর্তির উপায় বের করে দেয়া হয় এবং অতিরিক্ত খাদ্য-খাবার ক্ষুধার্তদের হাতে তুলে দেয়া হয়, তবে তা একটি সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যবস্থা হয়েই থাকবে। তাই তাঁরা এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন যে, একজন মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের ক্ষুধার চিত্র দেখাই যেন সম্ভব না হয়, বরং নিজ গৃহ থেকে খাদ্য নিয়ে লোকজনের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করেন।

পক্ষান্তরে মানুষ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, খাদ্য কুক্ষিগত ও একই স্থানে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। মনে রাখবেন, যদি চেতনার পরিবর্তন না হয়, অথচ খাদ্য বণ্টন ও রসদের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তবে তারপরও মানুষের এমন কৌশল জানা আছে যে, অন্যের ঝুলির দানা নিজের ঝুলিতে চলে আসবে এবং চারদিক থেকে সম্পদ একত্র হয়ে নিজেদের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। আপনারা সম্ভবত আলিফ লায়লার গল্প পড়ে থাকবেন। সওদাগর সিন্দাবাদ এক সফরে একবার এক স্থানে এসে দেখেন, জাহাজের কাপ্তান ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির। সিন্দাবাদ কারণ জিজ্ঞাসা করলে জাহাজের কাপ্তান তাকে বলল, আমরা ভুলে এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি, যার খুব নিকটেই চুম্বকের একটি পাহাড় রয়েছে। এখন থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের জাহাজ তার নিকটে পৌঁছে যাবে। চুম্বক লোহা আকর্ষণ করে। যখন সেই পাহাড় আকর্ষণ করবে, তখন জাহাজের সকল পেরেক ও কাঠের ভেতর গেঁথে থাকা লোহার কব্জাগুলো খুলে চলে যাবে সেই পাহাড়ে। জাহাজের বন্ধন তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের জাহাজ ডুবে যাওয়া থেকে তখন আর বাঁচতে পারবে না। ঘটনা এমনই ঘটল। চুম্বক লোহা আকর্ষণ করতে শুরু করল এবং জাহাজে মজুদ সকল লৌহজাত দ্রব্য ছিটকে খুলে গিয়ে চুম্বকের পাহাড়ের সাথে গিয়ে মিলে গেল। ফলে দেখতে দেখতে জাহাজ ডুবে গেল। ভাগ্যবান সিন্দাবাদ একটি কাঠের সাহায্যে কোনভাবে এক দ্বীপে আশ্রয় নিলেন এবং তার জীবন রক্ষা পেল।

এই গল্প মিথ্যা কিংবা সত্য যা-ই হোক, তা এখানে মুখ্য নয়। আপনাদেরকে আমার শোনানোর দায়িত্ব এটুকুই, আমাদের সমাজেও চুম্বকধর্মী পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী বিদ্যমান। আপনিও তাদের (magnate) বলে থাকেন। তারা এমন ষড়যন্ত্র করে রাখে যে, সম্পদ এক হয়ে তাদের ঘরে জমা হয়ে যায়। তারা এমন অর্থনৈতিক জাল বিস্তার করে আছে যে, লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সব কিছু তাদের থলিতে তুলে দেয় এবং নিজেদের জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয়তাগুলো তাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে পুনরায় দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। আম্বিয়া (আ.)-গণ হৃদয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দিতেন। তাঁরা মানুষের ভেতরে এমন পরিবর্তন সাধন করতেন যে, তারা অন্য মানুষের ক্ষুধার্ত মুখ দেখতেই পারত না। মানুষের অন্তরজগতে তাঁরা সৃষ্টি করতেন আত্মত্যাগের উদ্দীপনা, বিলীন হওয়ার প্রেরণা ও যথার্থ সহানুভূতির অঙ্কুর। অন্যের জীবন নিজের জীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে হতো মানুষের কাছে। নিজের জীবন বিলীন করেও তখন তারা অন্যের জীবন রক্ষা করতে এগিয়ে আসত। নিজের শিশুদের ভুখা রেখে অন্যের পেট ভরে দিতে উদ্বুদ্ধ হতো। নিজেকে হুমকির মুখোমুখি করে অন্যকে হুমকিমুক্ত করতে ভালোবাসত।

ত্যাগের দু'টি ঘটনা

আমার এই কথাগুলো শুনে আপনারা অবাক হবেন না। এগুলো ইতিহাসের ঘটনা। আমাদের ও আপনাদের এই পৃথিবীতেই এমন হয়েছে। ইতিহাসে এমন সব ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যা ফিল্ম কিংবা পর্দায় প্রদর্শিত অসংখ্য কল্প-কাহিনী থেকে অনেক বেশী অবাক করা ও বিস্ময়কর!

মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আগমনের অল্পকাল পরের ঘটনা। এক মুসলমান তাঁর এক আহত ভাইয়ের সন্ধানে পানি নিয়ে বের হয়েছেন এ উদ্দেশে, পানির প্রয়োজন হলে তখন আমি তার সেবা করতে পারব। আঘাতপ্রাপ্ত ও আহতদের মাঝে তিনি তার ভাইকে পেলেন, অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত ও প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির। তিনি পেয়ালা ভরা পানি তার সামনে এগিয়ে দিলে আহত ভাই অন্য এক আহত ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, আগে তাকে পানি পান করাও। ঘটনার পরিসমাপ্তি যদি এখানে ঘটত, তাহলে মানবতার মহত্ত্বের জন্য তা যথেষ্ট হতো এবং তা ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনায় পরিণত হতো। কিন্তু ঘটনা এখানে শেষ হতে পারেনি। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তির সামনের পানি ভর্তি পেয়ালা ধরা হলে তিনিও আরেকজনের দিকে ইশারা করলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক আঘাতপ্রাপ্ত, আহত ব্যক্তি তাঁর পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির দিকে ইশারা করতে থাকলেন। অবশেষে চক্র শেষ হয়ে পেয়ালা যখন প্রথমজনের কাছে ফিরে এল, তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লোকান্তরে চলে গেছেন। দ্বিতীয়জনের কাছে পৌছতে তিনিও নীরব হয়ে গেছেন। এই ধারায় একের পর এক সেখানকার সকল আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের তাঁদের এক অমূল্য পদচিহ্ন রেখে গেছেন। আজ যখন ভাই ভাইয়ের পেট কাটছে, এক মানুষ অন্য মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিচ্ছে রুটির টুকরা, তখন এই ঘটনা অত্যুজ্জ্বল আলোকের এক আদর্শমণ্ডিত মিনার!

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে একবার কয়েকজন মেহমান এলেন। তাঁর কাছে খাবার কিছুই ছিল না। তিনি ঘোষণা দিলেন, কে নিজের বাড়ীতে এদের নিয়ে যেতে চাও? সাহাবী আবু তালহা আনসারী (রা.) নিজেকে পেশ করলেন এবং মেহমানদের নিয়ে গেলেন। বাড়িতে খাবার ছিল কম। বাড়ির ভেতরে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হলো, বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে এবং মেহমানদের সামনে সব খাবার রেখে বাতি নিভিয়ে দেয়া হবে। পরে তাই হলো। মেহমানগণ পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। অন্যদিকে আবু তালহা (রা.) হাত নেড়ে-চেড়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠে পড়লেন। অন্ধকারে মেহমানগণ জানতেই পারলেন না, মেযবান খাবারে শরীক না হয়ে শূন্য হাত মুখ পর্যন্ত শুধু আনা-নেয়া করেছেন।

মানবতার বৃক্ষ সতেজ হবে ভেতর থেকে

মানুষের অন্তর্জগতে পরিবর্তন সাধন করতেন আম্বিয়াগণ। তাঁরা ব্যবস্থা পাল্টানোর চেষ্টা ততটা করতেন না, যতটা করতেন চেতনা বদলানোর কোশেশ। বিধি-ব্যবস্থা তো চেতনারই অনুগত হয়! যদি হৃদয় না বদলায়, চেতনা না পাল্টায়, তাহলে কিছুই পাল্টায় না। মানুষ বলে দুনিয়া খারাপ, সময় খারাপ। আমি বলি, এগুলো কিছুই নয়, বরং খারাপ হলো মানুষ। মাটির অবস্থার ভেতরে কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? বাতাসের প্রভাব কি বদলে গেছে? সূর্য কি উত্তাপ ও আলো বিকিরণ বর্জন করেছে? আকাশের অবস্থার কি পরিবর্তন এসেছে? কোন্ বস্তুটির স্বভাবে (Nature) পরিবর্তন হয়েছে?

মাটি তো একই রকমভাবে স্বর্ণ উদ্‌গিরণ করছে; তা ভেদ করে উৎপন্ন করছে শস্যের ভাণ্ডার, ফলমূলের স্তূপ। কিন্তু বণ্টনকারী পাপী হয়ে গেছে। এই অত্যাচারীরা যখন নিজেদের প্রয়োজনীয়তার তালিকা তৈরি করে, তখন কাগজের স্তূপও তাদের যথেষ্ট হয় না। অন্যদিকে যখন অন্য লোকজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবে, তখন যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা সে তালিকা সংকুচিত করার ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়। এই প্রবণতা যতদিন না পাল্টাবে, মানবতা ততদিন আর্তনাদ করতে থাকবে। আম্বিয়াগণ হৃদয়রাজ্যে ইঞ্জেকশান দিয়েছেন, লোকেরা বহিরাবরণ টিপটপ করছে এবং তাতেই সকল সামর্থ্য ব্যয় করছে। আম্বিয়াগণ অন্দর রাজ্য নিয়ে ভেবেছেন, ভেতরে অস্ত্রোপাচার করেছেন।

আজ সমগ্র পৃথিবীতেই ভেতর থেকে মানবতার বৃক্ষ শুকিয়ে যাচ্ছে। তার উদর ফাঁপিয়ে তুলছে ঘুণ ও উই পোকা। কিন্তু কালের চিকিৎসকরা ওপর দিয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে পানি। বৃক্ষের অন্তরের সতেজতা ও তার বর্ধনশক্তি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ প্রায় মৃত সেই বৃক্ষের পাতাগুলোকে সবুজ-সতেজ রাখার জন্য বায়ু (Gases) প্রবাহিত করা হচ্ছে, পানি ছিটানো হচ্ছে, যাতে শুকিয়ে যাওয়া গাছ-পাতা শ্যামল হয়ে ওঠে। আম্বিয়াগণ এই ব্যর্থ চেষ্টার পরিবর্তে মানুষকে মানুষ বানানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মানুষের হৃদয়ে তাঁরা ঈমানী ইঞ্জেকশান দিয়ে গেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, হে আত্মভোলা মানুষ! আপন স্রষ্টাকে জেনো এবং ঘুমে-জাগরণে, চলতে-ফিরতে তাঁকে পর্যবেক্ষকরূপে গ্রহণ করো যাঁর তন্দ্রা বা নিদ্রাও আসে না।

মানবতার যথার্থ পথনির্দেশক

মানুষের হৃদয় ও আত্মা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার ঝর্ণা না ছুটবে, মনের ভেতরে না জন্মাবে আত্মত্যাগের প্রেরণা, মানবতার সংশোধন ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব। তাই তাঁরা এমনি মানবিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন যে,

তার ফলে অন্য ভাইয়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা এবং কষ্ট বরণ করার স্পৃহা জেগে ওঠে। নিছক আইনের সাহায্যে তাঁরা মানুষের চিকিৎসা করেন নি, বরং মানুষের ভেতরে প্রকৃত মানবতা ও মানবতার প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা এমন জাতি সৃষ্টি করেছেন, যে জাতি মানবতার প্রদর্শনী (Demonstration) করে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, আমরা ভুঁড়ি, উদর আর মাথার দাস নই। তারা পরিস্থিতি ও কর্মের ভাষায় ঘোষণা করেছে, পেট, আবেগ, সম্পদ, শাসক ও আত্মীয়-পরিজনের পূজারী তারা নয়। এমন জাতির উদ্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, মানবতার সংশোধন ও উত্তরণ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়।

যদি কোন দেশে এমন জাতির জন্ম হয় যারা নিজেদের ভুলে গিয়ে সকলের কল্যাণ করবে তাহলে তার দ্বারা সম্ভব হবে মানবতার সংশোধন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানবতার অনেক বড় বড় কল্যাণকামীই অতিবাহিত হয়েছেন কিন্তু কোন না কোন ধাপে এসে আপনি দেখবেন, তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে ফেলেছেন। জাতির এমন বহু সেবক অতিবাহিত হয়েছেন, যারা জাতিশুদ্ধির কাজ করেছেন বড়ই দুঃসময়ে, জেল খেটেছেন; কিন্তু অবশেষে কারাগার থেকে বের হয়ে এসে শাসকের মসনদে আরোহণ করেছেন। সেটা তাদের প্রাপ্য ছিল হয়তো। সেজন্য তাদের ধন্যবাদ।

আম্বিয়াগণের যিন্দেগী

কিন্তু আল্লাহর আম্বিয়াগণ আত্মত্যাগ করেছেন স্বার্থহীনভাবে। পৃথিবীর শান্তির স্বার্থে তাঁরা আপন আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা এক শত ভাগ অন্যের উপকারের জন্যে কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন, নিজেদের লাভ এক ভাগও ওঠান নি। তাঁদের সাহাবী-সহচররা যে পথে চলেছেন, পৃথিবী উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তাঁদের লাগিয়ে যাওয়া বাগানের ফল পৃথিবী আজও ভোগ করছে; সে বাগান তাঁরা সজীব করে তুলেছেন নিজেদের তপ্ত খুন সিঞ্চিত করে। তাঁরা অন্যের ঘর আলোকিত করেছেন প্রদীপের সাহায্যে, কিন্তু মৃত্যুর সময় পর্যন্ত নিজেদের ঘরগুলো ছিল আলোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুহাম্মদ (সা.)-এর দিয়ে যাওয়া আলোয় গরীবের ঝুপড়ি আর শাহী প্রাসাদ একইভাবে ঝকমক করেছে, কিন্তু ওফাতের প্রাক্কালে তাঁর ঘরের বাতি চেয়ে-আনা তেলের বিনিময়ে জ্বলেছে, অথচ তখন মদীনার হাজার হাজার ঘরে তাঁরই হাতে প্রজ্জ্বলিত বাতির অনির্বাণ শিখা জ্বলছিল। তিনি বলতেন ঃ

"আমরা আম্বিয়াগণ কারুর উত্তরাধিকারী হই না, আমাদেরও কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই, তা গরীবের হক।"

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আরেকটি ঘোষণা হলো ঃ যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং কিছু রেখে গিয়ে থাকে, তা তার উত্তরাধিকারীদের ধন্য করুক! আমরা তা থেকে এক পয়সাও নেব না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেছে, তা আমাদের দায়িত্বে থাকবে।

দুনিয়ার কোন শাসক বা নেতা কি এই আদর্শ রেখে গেছেন? তাঁর জীবন হলো মানবতার উজ্জ্বল কীর্তি। তিনি পৃথিবীর সামনে এমন আদর্শ তুলে ধরেছেন যাতে আত্মোৎসর্গ, প্রেম ও অন্যের বেদনায় ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে কোথাও একরত্তি পরিমাণও আত্মস্বার্থের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। আরবের একমাত্র বাদশাহ তিনি ছিলেন, যাঁর সাম্রাজ্য ছিল মানুষের হৃদয়রাজ্যে বিস্তৃত। কিন্তু দুনিয়া থেকে আস্তিন বাঁচিয়ে নির্ভোগ তিনি চলে গেলেন। তিনিই শুধু নন, যিনি যতো তাঁর নিকটবর্তী ছিলেন, তিনি ততো ঝুঁকির নিকটবর্তী ও লাভ থেকে দূরে ছিলেন। নিজের গৃহিণীদের ঘোষণা করে বলে দিয়েছেন, যদি দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ চাও, তবে যৎসামান্য কিছু দিয়ে আমি তোমাদেরকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে রেখে আসব। সেখানে তোমরা ফিরে যাও এবং সুখ-শান্তির জীবন কাটাও। আমার কাছ থেকে বিচ্ছেদ বরণ করে নাও। আমার সাথে থাকতে হলে দুঃখ-সংকট বরদাশ্ত করতে হবে। এই ছিল সেই আদর্শের উপহার। এর প্রতিই আল্লাহর পুরস্কার অবতারিত হয়।

আমরা চাই পুনরায় এই যিন্দেগী ব্যাপকতা লাভ করুক! মানবতার স্বার্থহীন সেবা ও উদ্দেশ্যমুক্ত ভালোবাসার প্রচলন হোক! আবারো অন্যের কল্যাণে নিজের ক্ষতি গ্রহণ করে নেয়া হোক এবং পুনরায় এমন জাতির জন্ম হোক, বিপজ্জনক মুহূর্তে যারা এগিয়ে আসে এবং লাভের সময় পিছিয়ে থাকে।

চাহিদা পূরণ শান্তির পথ নয়

আজ দুনিয়ার সকল ক্ষমতা ও প্রশাসন এই এক বৃত্তের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে, জাতি-গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহকে সার্বিকভাবে তুষ্ট রাখা হোক এবং চাহিদা মাত্রই পূরণ করা হোক! কিন্তু জ্ঞানী বন্ধুরা! সংশোধন ও পরিমার্জনের পথ এটা নয়। এখানে একজন মাত্র মানুষের চাহিদাও পূরণ করা দুষ্কর। চাহিদার অবস্থা হলো এই, তা অসীম ও অশেষ, অথচ দুনিয়াটা সীমিত, সংক্ষিপ্ত এবং কোটি মানুষের জন্যে সম্মিলিত। ইতিহাসের জগতটা যদি দেখা হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীর মাত্র একজন মানুষেরও মুখে চাওয়া চাহিদা পূর্ণ করার অবকাশ নেই। এখানে কোন আবদারকারীর আবদারই পূরণ হতে পারে না। এখানে প্রবৃত্তি তোষণে আগ্রহীরা ডেকে ডেকে বলে ঃ

পাপের সমুদ্র পানি শূন্যতায় শুকিয়ে গেল,
আমার আঁচলের কোণটাও তো এখনো ভিজল না!

আজ পৃথিবীর বড় বড় নেতা একথা বলছেন, মানবিক চাহিদা সবই বৈধ ও স্বাভাবিক। সব চাহিদা পূরণ হওয়া উচিত। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে এটাই কার্যকর হচ্ছে।

মৌলিক ক্রুটি এটিই। চাহিদা ও প্রবৃত্তি মেটানো ও পূরণ দ্বারা মানবতার উত্তরণ হতে পারে না। চাহিদা পূরণ দ্বারা চাহিদা কমে যাবে না এবং হৃদয়ে প্রশান্তি জন্মাবে না। এটাতো সমুদ্রের পানি। এর সাহায্যে পিপাসা যতই মেটানো হবে, পিপাসা ততই তীব্র হতে থাকবে। আজ সমগ্র পৃথিবীর প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি এই দর্শনকে অবলম্বন করেই কাজ করছে। মানুষের শুদ্ধ-অশুদ্ধ চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হোক। জাতি, শ্রেণী, জনতা ও ব্যক্তিরা চাইবে, তা-ই দেয়া হোক। এতে শান্তি আসবে। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ফলাফল হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ সব দিকেই আগুন লেগে গেছে। আত্মার আগুন কিছুতেই নেভে না। প্রবৃত্তির একটি সলতে জ্বলে চলেছে। সকল জাতি তাতে ইন্ধন ও বাতাস দিয়ে যাচ্ছে। সেই সলতের দাউ দাউ অগ্নিশিখা আজ আকাশের সাথে কথা বলছে। জাতি ও রাষ্ট্রের দিকেও তা এগিয়ে আসছে। আজ 'দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' আয়াতের এই মর্মের দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ এ আগুনের অভিযোগ ওঠাচ্ছে। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, এ আগুন কে জ্বেলেছে? কে তাতে তেল ছিটিয়েছে? কে যুগিয়েছে ইন্ধন? পূরণের পথের এটাই পরিসমাপ্তি ও গন্তব্য।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা জাতির সকল প্রবৃত্তি ও দাবী পূরণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং সাথে সাথে তাদের বিনোদন ও প্রসন্নতার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করাও দরকারী ভাবেন, তারা নিজেদের সন্তানদের সাথে কিন্তু এই আচরণ করেন না। সন্তানের বহু ভুল ও ক্ষতিকর চাহিদা তারা অপূর্ণ মনে করেন এবং সাথে সাথে তাদের বিনোদন ও প্রসন্নতার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করাও দরকারী ভাবেন, তারা নিজেদের সন্তানদের সাথে কিন্তু এই আচরণ করেন না। সন্তানের বহু ভুল ও ক্ষতিকর চাহিদা তারা অপূর্ণ রাখেন। শিশুরা যদি আগুন নিয়ে খেলতে চায়, তাহলে তাদের খেলতে হয় না। কিন্তু জাতির সকল চাহিদা ও দাবী পূরণে তারা প্রস্তুত। তাহলে এরা যা করছেন, তাতে কি অনুমিত হয় না, নিজের দেশবাসী বা সাধারণ মানুষের সাথে আপন সন্তানতুল্য সহানুভূতি এদের নেই? এই লোকেরাই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির ওপর শাসন চালান, তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য এবং জনগণের বায় লাভের স্বার্থে সকল শুদ্ধ-অশুদ্ধ চাহিদা পূর্ণ করা অপরিহার্য মনে করেন। আজ কোন দেশেই এমন কোন দল নেই এবং কোন ব্যক্তির মাঝেও এই চারিত্রিক সৎ সাহস নেই যে, তারা বিনোদন ও বিলাসিতার সমালোচনা করবেন; খেল-তামাশার

ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও ফিল্মায়নের সীমাতিরিক্ত উৎসাহ ও স্পৃহার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। আজ এমন কোন রাষ্ট্র নেই যে রাষ্ট্র এই বিষয়গুলোর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে এবং জাতি ও দেশবাসীর অসন্তুষ্টি বরণ করে নেবে।

চাহিদার মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি ও সঠিক চেতনার জাগরণ

আল্লাহর আম্বিয়াগণের পথ উপরিউক্ত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বৈধ-অবৈধ চাহিদা পূরণের পরিবর্তে চাহিদার ওপর মাত্রা লাগিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা চাহিদার গতি পাল্টিয়ে দিয়েছেন এবং শুধু বৈধ চাহিদাগুলোকে পূরণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। জীবন্ত ও জাগ্রত অন্তর তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। এতে জীবনে ভারসাম্য ও হৃদয়ে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তোমাদের বিদ্যালয়, পরীক্ষাগার, গবেষণাক্ষেত্র (Laboratories), তোমাদের বিজ্ঞান পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে। বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ এ সবের অবদান। কিন্তু এগুলো মানুষকে পবিত্র একটি হৃদয় উপহার দিতে পারেনি। তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের হাত খুলে দিয়েছে। শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে হাতিয়ার। কিন্তু তাদের যথার্থ প্রশিক্ষণ হয়নি। আজ সেই অশিক্ষিত শিশুর দল আমোদ-প্রমোদ করে সেই হাতিয়ারগুলোর স্বাধীন ব্যবহার করে চলেছে।

আল্লাহর আম্বিয়াগণের চাহিদার ওপর প্রহরী বসিয়েছেন। চাহিদার মাঝে পরিমাপ ও ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন। রিপুতাড়িত চাহিদার পরিবর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এক মহান চাহিদার জন্ম দিয়েছেন। মানবিক সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বস্তু আবিষ্কার করেন নি। কিন্তু এমন মানসিকতা তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, যা দ্বারা আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের তৈরিকৃত বস্তু ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। তাঁরা হৃদয় দিয়েছেন, বিশ্বাস দিয়েছেন। আজ পৃথিবীর কাছে সব কিছু আছে, বিশ্বাস নেই। আজ পৃথিবীর শিল্প-কারখানা সব কিছু উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু একীন ও বিশ্বাস অর্জিত হয় আম্বিয়াগণের কারখানা থেকে। পৃথিবী আল্লাহভীরু লোকশূন্য। মানবতার স্বার্থহীন সেবা কে করবে? অথচ আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির বিশ্বাস মানবতার নিঃস্বার্থ সেবায় উৎসাহিত করে। মানবতার এমন সেবকরা সকল শ্লোগান, রাষ্ট্র শাসনের মোহ, রাজনৈতিক চাল ও রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া থেকে বিমুখ ও প্রতিক্রিয়াহীন থেকে নিঃস্বার্থ সেবা করে যান। আজ এমন সেবকের প্রয়োজন, যাদের কাছে কিছুই নেই, তারপরও কিছু নিতে চায় না, বরং চায় আরো দিতে।

শেষ আহ্বান

আমরা মানুষের মাঝে এই আবেগ সৃষ্টি করতে চাই এবং বাস্তবতার তৃষ্ণা জাগাতে চাই, জীবন শুধু খানাপিনার নাম নয়। মানুষের জীবন নিছক বস্তুকেন্দ্রিক অথবা জান্তব জীবনের নাম নয়। আমরা এক নতুন স্বাদ ও রুচি নিয়ে এসেছি। আজকের বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে এ কথা নতুন। অবশ্য এক অর্থে এ কথা নতুন নয়। পৃথিবীর সকল আম্বিয়া এই পয়গাম নিয়েই এসেছেন এবং সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার সাথে মুহাম্মদ (সা.) চূড়ান্ত পর্যায়ে একথা বলে গেছেন। এই বাস্তবতা আজ চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বলার উপযোগী। মানুষ পেটের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। প্রকৃত জীবন শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে। মানবতার পুঁজি লুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা একটি ডাক দিতে এসেছি, সত্যের ডাক, হকের ডাক। সাম্প্রতিক দুনিয়া এ ডাকের সাথে অপরিচিত। কিন্তু আমরা পৃথিবী থেকে নিরাশ নই। মানুষের কাছে এখনও হৃদয় আছে। সে হৃদয় মৃত নয়। তার ওপর ধুলোবালির আস্তর পড়েছে। ধুলোবালি ঝেড়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে নিলে এখনো অবকাশ আছে, এখনো সম্ভাবনা আছে যে তা হক গ্রহণ করে নেবে এবং তার ভেতর ঈমানী অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠবে।

কর্মীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য

[নিম্নোক্ত ভাষণটি মাওলানা সাহেব আমেরিকার মুসলিম ছাত্র সংগঠন (এম. এস. এ.)-এর ৩ দিনব্যাপী পঞ্চদশ বার্ষিক কনভেনশন-এর উদ্বোধনী দিনে দিয়েছেন। 'ইসলামী পুনর্জাগরণ কার্যক্রম ও পারস্পরিক হৃদ্যতা' শীর্ষক বিষয়ে তিনি এ বক্তব্য রাখেন। উক্ত কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের ইসলামী স্কলার, বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবেত্তা ও বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন। জনাব মমতাজ আহমদ ভাষণটির ইংরেজী তরজমা পেশ করেন।]

শৈল্পিক মেহনত কার্যকর নয়

নতুন করে ইসলামী জাগরণে মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও হৃদ্যতা বিষয়ে আজ আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। বেঁধে দেয়া বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে প্রয়াসী হব; তবে একথা ঠিক, আমি একজন বাস্তববাদী মুসলিম। ইসলামের ইতিহাসের ওপর সামান্য শিক্ষা অধমের আছে। আজকের আলোচনায় তাই স্থান পাবে উক্ত বিষয় আর আমার ক্ষুদ্র ইতিহাসগত অভিজ্ঞতা।

সুধীমণ্ডলি! আমি বিশ্বাস করি দাওয়াত কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা ভিন্ন কোন কারণে হয় না। আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্ঞানে এমন কোন উপাদান খুঁজে পাচ্ছি না, যা আটার খামিরের মত মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়া যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য, শিল্পগত মেহনত মানবের পারস্পরিক হৃদ্যতা বজায় রাখতে যুৎসই হাতিয়ার নয়। ভালবাসা-সম্প্রীতির গতিধারার সূতিকাগার হচ্ছে আত্মা, যা উপলব্ধি করতে হয়। দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। জগতে এমন কোন মাধ্যম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদ্দারা ভাঙ্গা হৃদয়, যার মাঝে কোন আকর্ষণ নেই, তাতে একটা অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে। এমনিভাবে যাদের মাঝে কোন বাস্তবতা নেই, নেই অনুভূতির আধিক্য, এদের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করার মত কোন মাধ্যম খুঁজে পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। কাগজের এক পৃষ্ঠাকে অপর পৃষ্ঠা দ্বারা ঢেকে দেয়া যায় কিন্তু মানবের আত্মগত ব্যাপারটি ভিন্ন রকমের, স্বতন্ত্র ধাঁচের। এটি একটি অত্যন্ত নাযুক ব্যাপার, সুকঠিন প্রয়াস। কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ -

"তুমি দুনিয়ার যাবতীয় মালমাত্তা ব্যয় করলেও তাদের প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না।" [সূরা আনফাল ঃ ৬৩]

তোমাদের কাছে যত ধনভাণ্ডার আছে, মাধ্যম আছে, তার সবটুকু ব্যয় করলেও তাদের মনে প্রীতির সঞ্চার করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ঐক্যের সূত্রে তাদেরকে গ্রথিত না করলে, মনে প্রীতির সঞ্চার না করলে, জাগতিক কোন শক্তি তাদের মনে সৌহার্দ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে পারত না।

ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব মিলন

আপনারা জানেন, মক্কা মুকাররম থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় যখন হিজরত শুরু হয়, তখন মুহাজির আনসারদের মাঝে মানবতা বা মনুষ্যত্ববোধ আর আরবী ভাষা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক ছিল না। দীর্ঘ আলোচনার দিকে না গিয়ে শুধু এতটুকু বলতে চাই, আনসারদের বংশ আর মুহাজিরদের বংশীয় সম্পর্ক ছিল হেজাযের আদনান গোত্রের সাথে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মাঝে একটা ঐক্যের সূচনা হয়েছিল। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۔

"আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।" [আল ইমরান ঃ ১০৩]

সেই ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কের বিকাশ তখন ঘটেছে, যখন মুহাজিররা মদীনায় পৌঁছেছে। আনসাররা শুধু নিজেদের ঘরেই তাদের জায়গা দেননি, বরং মনেই জায়গা করে দিয়েছিলেন। বসিয়েছিলেন চোখের ওপর। আনসারী মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলতেন, এটা আমার ঘর, এখন থেকে অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আপনার। যে অংশ আপনার পছন্দ হয় বেছে নিন। এভাবে তারা শস্যক্ষেত্র, ভূমিসম্পদ ও অন্যান্য সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশীদারিত্ব দেয়ায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি অনেক আনসারী এ কথা পর্যন্ত বলেছিলেন, আমার দু' স্ত্রী আছে। আমি একজনকে তালাক দিই, আপনি তাকে শাদী করে নিন। মুহাজিররা তাদের উত্তরে কি বলেছিলেন? তাঁরা আত্মসম্ভ্রমবোধের পরিচয় দিয়ে আনসারদের বলছিলেন, আমাদেরকে তোমাদের বাজারের পথ দেখিয়ে দাও, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

এই সম্প্রীতি শিল্পগত কোন মেহনতের বদলে হয়নি। মানব জীবন গঠনে একটা প্রশ্ন সর্বযুগে থেকে গিয়েছে যে, কর্মীদের নিয়ম-নীতি-আচার কেমনটি হবে? যেমনটি দুধ ও চিনির মিশ্রণ ঘটলে হয়। চিনি-দুধের মাঝে আমিত্ব

এমনভাবে বিলুপ্ত করে দেয়, যাতে দ্বিতীয়বার খুঁজে বের করা যাবে না। এভাবেই কর্মীদেরকেও একে অপরের মাঝে সংমিশ্রিত থাকতে হবে, যাতে একাকিত্ব ঘুচে যায়। আরেকটু বলতে গেলে, আমিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়!

কয়েকটি উদাহরণ

উপরিউক্ত ব্যাপারে এখন দু'একটি উদাহরণ পেশ করছি। অতঃপর মূল আলোচনায় ফিরে যাব। প্রথম উদাহরণটি সীরাতুন্নবী (সা.) থেকে দিচ্ছি। এর চেয়ে অতি উত্তম উদাহরণ আর হতে পারে না।

বদরের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের কিছু লোক গ্রেফতার হয়েছিল। তন্মধ্যে আবু আজীজ বিন উমায়ের নাম্নী এক ব্যক্তি ছিল। তার আপন ভাই মুছআব ইবনে উমায়ের (রা.) বদরের একজন ঝাণ্ডাবাহী সৈনিক ছিলেন। তিনি প্রথমেই মদীনায় এসেছিলেন। আবু আজীজ বিন উমায়ের-এর মশ্‌ক যখন বাঁধা হচ্ছিল, তখন মুছআব (রা.) গ্রেফতারকারীকে লক্ষ্য করে বলেন, খুবই শক্ত করে বাঁধ। এর দ্বারা অনেক টাকা-পয়সা উসূল হবে।

আবু আজীজঃ ভাই সাহেব! আমি মনে করছিলাম, আমার ব্যাপারে আপনি কোন ভাল কথা বলবেন, আমার জন্য সুপারিশ করবেন, এ আমার আপন ভাই! একটু খেয়াল করে তাকে বাঁধন দিও। ঢিলেঢালা করে বাঁধ। হায়রে আমার মায়ের উদরের সন্তান, পাপের কলিজার টুকরা! আপনি উল্টা সিধা বলা শুরু করছেন, বলছেন আরো শক্ত করে বাঁধতে, যাতে ফিদায়া অতিরিক্ত উসূল করা যায়।

হযরত মুছআব (রা.) এমন একটি উত্তর দিয়েছিলেন, যা স্বজনপ্রীতিহীন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি বলছিলেন, তুমি আমার ভাই নও। আমার ভাই তো সে, যে তোমায় শক্ত করে বাঁধবে।

একত্ববাদী বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা

একত্ববাদী আকীদা আর নিঃস্বার্থ ভালবাসা এমন বিপ্লবের সৃষ্টি করছিল মুছআব (রা.)-এর মনে যে, তিনি আপন ভাইয়ের দরদ ও স্বার্থ ভুলে গিয়ে বলছিলেন ঃ এখন তুমি আমার ভাই নও। আমার ভাই ঐ ব্যক্তি যে তোমার বাহু শক্ত করে বাঁধবে। তিনি এক নতুন আত্মীয়তার জন্ম দিলেন। সেটা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও এক বিশাল মুবারক, উপকারী ও নন্দিত সম্পর্ক।

দ্বিতীয় একটি উদাহরণ পেশ করছি, একটি মশহুর ঘটনা। ইয়ারমুক রণাঙ্গনের এক সাহাবী আবু জুহাইম বিন হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ আমি চাচাত ভাইয়ের তালাশে ময়দানে ঘোরাফেরা করছিলাম। যুদ্ধে যারা জখমী হয়,

তাদের খুব পিপাসা লাগে। আমি মশক ভরে পানি নিয়েছিলাম। কি জানি! যদি সে আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পানি চায়, তখন যাতে পানি পান করাতে পারি। অকস্মাৎ আমি ভাইয়ের কাছে গেলাম, দেখলাম তার জান-কান্দানী শুরু হয়েছে, ঠোঁটে মৃত্যুফেনা গিজগিজ করছে। চেহারা সাদা হয়ে গেছে। আমি পানি পেয়ালা তার মুখে ধরতেই পাশের কেউ ক্ষীণ কণ্ঠে পানি বলে কাকুতি করে ওঠে। আমার ঐ ভাই বললেনঃ তুমি পানি নিয়ে ওকে দাও, ওই পানির হকদার। ওর পানির প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী। দ্বিতীয় জনের কাছে এসে তার মুখে পানি ধরতেই পূর্ববৎ তৃতীয় আরেক জনের পানি বলা চিৎকার কর্ণগোচর হলো। সে বলল, ওর কাছে পানি নিয়ে যাও। ঐ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা দিচ্ছেন, ইসলামের ইতিহাসে আত্মত্যাগের এক কালজয়ী স্বাক্ষর হচ্ছে এই উপাদান। আমি এভাবে পর্যায়ক্রমে যার কাছেই পানি নিয়ে যাই, সে পাশের চিৎকার করে পানি আকুতিকারীর কাছে নিয়ে যেতে বলেন। এভাবে আমি আমার ঐ চাচাত ভাইয়ের কাছে ফিরে এসে দেখি তিনি শাহাদাতের শিরীন শরাব পান করেছেন। দ্বিতীয় জনের কাছে গিয়ে দেখলাম তাঁর অবস্থাও পূর্বাপর সাথীদের ন্যায়। আমার পানির পেয়ালা ভর্তিই রয়ে গেল। আল্লাহ্‌র বান্দার কারো ভাগ্যে পানি হলো না।

এ ঘটনা কল্পনাপ্রসূত নয়। বাস্তবিকই এমনটিই ঘটেছিল।

তৃতীয় ঘটনা

এ ঘটনাটি পূর্বাপর দু'টি ঘটনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটি জীবন্ত ঘটনা। দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী, সে এখনও নীরব ভাষায় বলে চলছে এসব যশোগাথা উপাখ্যান। সেই ইয়ারমুকেরই একটি ঘটনা। হযরত ওমর (রা.) মুসলিম সেনাবাহিনী প্রধান খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে তাঁর পদ হতে অব্যাহতি দেয়াকে ভাল মনে করে আবু উবায়দা (রা.)-কে সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন। হযরত ওমর (রা.) এই প্রথম ইতিজা কায়েম করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সকল সৈন্যের নযর সেনাপতির দিকে, তাঁকে বিজয়ের মূল শক্তি মনে করা হয়। সম্ভবত এ দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সৈন্যদর থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তিনি খালেদ (রা.)-কে অব্যাহতি দিলেন, যাতে সৈনিকরা মনে করতে পারে, যেখানে খালেদ সেখানেই বিজয়, বিজয় আর খালেদ দু'টি পরস্পর বস্তুতে পরিণত, এমনটি নয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ছেড়ে বান্দার ওপর ভরসা এসে যায় এবং তাই তাঁকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে তিনি ফরমান জারী করলেন ঃ খালেদের পাগড়ি মাথা থেকে খুলে গলায় ধারণ করানো হোক (একা পদ থেকে অব্যাহতির লক্ষণ) সৈনিকরা যেন জানতে পারে, খালেদ (রা.) এখন সেনাপতি নেই। হযরত খালেদকে এ পয়গাম শোনানো হলে তিনি বললেন, ... (মেনে নিলাম, আত্মসমর্পণ করলাম)। খলীফার হুকুম আমার নয়নমণি

সমতুল্য। আমার যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধকর্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। আমি যদি শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশে লড়াই করে থাকি, তবে এখনও লড়ব। আর যদি ওমর (রা.)-এর জন্য লড়াই করে থাকলে তা' ছাড়তে হবে। কেননা ওমর (রা.) আমার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। বঞ্চিত করেছেন আমাকে একটি মহান পদমর্যাদা থেকে। ইতিহাস কালের সাক্ষী, হযরত খালিদ (রা.) তরবারি নিয়ে আগের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে লড়াই করতে থাকেন। মহান পদ হারানোর পর একজন সাধারণ সৈন্যের কাতারে এসে প্রাণপণ যুদ্ধ করার দৃষ্টান্ত খালিদ বুঝি প্রথম পেশ করলেন! অধুনা গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাই একজন সামান্য অফিসারকে পদচ্যুত করলে আন্দোলন শুরু হয় আর অফিসারটি কাজ হতে ইস্তফানামা দিয়ে বিদায় নেয়।

নিঃস্বার্থ ভালবাসা

একত্ববাদ মানুষকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা শেখায়। নিখাদ ভালবাসা, মায়া-মমতা মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করলে মানুষকে করে তোলে এক অনন্য গুণের অধিকারী। নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও সম্প্রীতি যে জাতির মধ্যে প্রতিফলিত, ঐ জাতির উন্নয়ন অগ্রগতি কে ঠেকায়? তারা এমনও উপমা পেশ করেন, যা ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

হিজরী ১৩শ শতাব্দীর দাওয়াতের অনুপম দু'টি দৃষ্টান্ত

আমি আপনাদের সম্মুখে খোলাফায়ে রাশেদীন ও হুজুর (সা.)-এর জীবদ্দশার চারটি ঘটনা পেশ করছি যদ্দারা প্রতীয়মান হয়েছে, একত্ববাদে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ নিখাদ প্রীতি দ্বীনদার একজন মুসলমানদের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন আনে এবং আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, একতার প্লাটফরমে কি করে একটি জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এটাই ছিল ইসলামের চিরন্তন আলো, যার কিরণ ইনসায়িনাতে গ্রথিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

......لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ
وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ -

"কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" [সূরা হুজুরাত ঃ ৭]

কিন্তু সেই সোনালী যুগের পর যেখানে নবুওয়াতির ছোঁয়া ছিল না, সে যুগেও আত্মত্যাগের এই অমর স্বাক্ষর কেউ রেখেছেন কি? এ অন্ধ বিশ্বাস আর কুপ্রবৃত্তি লালনের যুগ। বিংশ শতাব্দীর চরম যুগ সন্ধিক্ষণে এমন দু'চারজন কি খুঁজে পাওয়া যাবে? করা যাবে কি তাদের পদাংক অনুসরণ? আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, ঈমান-আক্বীদাকে মযবুত করে ধরতে পারলে নিঃস্বার্থ ভালবাসা-প্রীতি পরিপক্ব হলে এমনও মরুব্বী ও সংস্কারক এ যুগে মিলবে, যাঁরা ইসলামের ইতিহাসের ঘটিত সেই লোমহর্ষক আত্মত্যাগের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। আমি এক্ষণে আপনাদের সম্মুখে মোজাহেদে আযম সাইয়েদ আহমদ শহীদ (শাহাদত ঃ ২৪শে জিলহজ্জ ১২৪৬ হিঃ ৬ই মে ১৮৩১)-এর আত্মত্যাগী কাফেলার সহযাত্রীদের জিহাদের শুধু দু'টি ঘটনা তুলে ধরছি। বেশী দিনের কথা নয়, এই তো সেদিন যখন ইংরেজ বেনিয়ারা সবেমাত্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অনৈসলামী সংস্কৃতি ও জড়বাদের অশুভ ছায়া ইসলামী সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল।

সাইয়েদ আহমদ শহীদের সেনানিবাসের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন জনাব মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব লক্ষ্মৌবী। তিনি প্রত্যহ কুরআন তেলওয়াত করতে করতে সৈন্যদের মাঝে আটা বিতরণ করতেন, অনেক সময় ২০/২৫ লোকের আটা একজনের কাছে বিতরণ করতেন, অথচ গণনা করতেন না। কিন্তু আটার ভাণ্ডারে কখনও ঘাটতি দেখা দিত না।

একদিন তিনি আটা বিতরণ করছিলেন, এমন সময় মীর ইমাম আলী আজীমাবাদী নামে এক নতুন সেপাহী এসে আটার ভাগ চাইলেন। তিনি অত্যন্ত মোটাকায় ও শক্তিশালী ছিলেন। আটার বিতরণের নিয়ম ছিল–যে আগে আসবে আগে পাবে, পরে আসলে পরে। মৌলভী সাহেব তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমার পালা এলে পাবে, অতএব, তাড়াহুড়া করো না। এরপর সে তাড়াহুড়া করতে লাগল, শেষ পর্যন্ত মৌলভীকে ধাক্কা দিল। মৌলভী মাটিতে শুয়ে পড়লেন। এদিকে কান্দাহারী নামে এক ব্যক্তি আটা নিচ্ছিল। তার কাছে ব্যাপারটি অসৌজন্যমূলক মনে হওয়ায় মীর ইমাম আলীকে মারতে সংকল্প করল। মৌলভী সাহেব কান্দাহারীকে বললেন, না। তোমরা ওকে মেরো না। ও তো আমাদের ভাই, ধাক্কা দিয়েছে আমাকে, এতে তোমাদের মাথা ঘামানোর কি দরকার আছে? সকলে লজ্জিত হয়ে চুপ করল। মৌলভী সাহেব তাকে আটা দিলেন এবং সে চলে গেল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সাইয়েদ সাহেবের কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বলল। রাত্রে মৌলভী সাহেব সাইয়েদ সাহেবের কাছে গেলে তিনি বললেন, মীর ইমাম আলী তোমার সাথে আজ কি করেছে? তিনি বললেন, তিনি এসে আমার কাছে আটা

চাইলেন। পাস যদিও তার ছিল না তবুও ব্যস্ততাবশে জলদি নিতে চাইলে আমার সাথে ধাক্কা লাগে। ব্যস! এতটুকু ঘটনা। সাইয়্যেদ সাহেব শুনে চুপ রইলেন। কেউ গিয়ে মীর ইমাম আলীর ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বলল। মীর সাহেব কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে ঠিক ঐ সময়ই সাইয়্যেদ সাহেবের সামনে মৌলভীর কাছে মাফ চাইলেন এবং মুছাফাহা করলেন।

এর চেয়েও একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (র.)-এর এক লোহোরী খাদেম যিনি তাঁর কিসাসে এনায়েতুল্লাহকে মাফ করে দিয়েছিলেন। কিসাস মাফ করে তিনি এক নতুন ইতিহাস কায়েম করলেন। আমি এ ঘটনা "সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ" পুস্তকে বর্ণনা করেছি ঃ একদা এক খাদেম লাহোরী নামে ব্যক্তি যিনি অতিশয় সাদামাটা গোছের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁর ও শায়খ এনায়েতুল্লাহর ঘোড়ার ঘাস কাটার যৌথ দায়িত্ব ছিল। শায়খ এনায়েতুল্লাহ কোন কারণে তার ওপর নারাজ হন। স্মর্তব্য যে, শায়খ ছিলেন সাইয়্যেদ সাহেবের একজন প্রিয়জন ও কাছের লোক। রাগের আতিশয্যে তিনি লোহোরীকে এমন এক ঘুসি মারলেন, যাতে টাল সামলাতে না পেরে তিনি মাটিতে শুয়ে পড়ে কাতরাতে থাকেন। সাইয়্যেদ জানতে পেরে শায়খকে তিরস্কার করলেন। অতঃপর বললেন, তুমি কি মনে করছ আমি সাইয়্যেদ সাহেবের নিকটতম ব্যক্তি, থাকি তার পালঙ্কের কাছে। তোমার কি জানা নেই আমরা এখানে আল্লাহকে রাজী-খুশি করানোর জন্য এসেছি? তুমি কিভাবে এই নিকৃষ্ট কাজটি করলে? তুমি কি মনে কর লাহোরী শহরের একজন নিচু শ্রেণীর সহিস? এ বুঝেই তার গায়ে হাত দিয়েছ? জেনে রাখো! লাহোরী আর তুমি ও অপরাপর সকল মুজাহিদ আমার দৃষ্টিতে সমান। কারো ওপর কারো প্রাধান্য নেই।

এরপর তিনি হাফেজ ছাবের থানুভী ও শরফুদ্দীন বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করে বললেন, এ দু'জনকে কাজী হেব্বানের কাছে নিয়ে যাও। এনায়েতুল্লাহর পদমর্যাদা আছে বলে সে যেন এক পেশে বিচার না করে। শরীয়া চুলচেরা বিশ্লেষণে যেন বিচার করেন।

পরের দিন যথাসময়ে হাফেজ ছাবের শরফুদ্দীন লাহোরী ও এনায়েতুল্লাহকে নিয়ে কাজীর দরবারে হাজির হন। তিনি এনায়েতকে সামনে বসালেন এবং যার পর নাই তিরস্কার করলেন। বললেন, তুমি অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছ। এরপর লাহোরীকে ডেকে বললেন, তুমি অমায়িক প্রকৃতির লোক, তোমরা ঘরদোর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মানসে বের হয়েছ। দুনিয়ার যিন্দেগী তো স্বপ্নের মত এক সময় বিলীন হয়ে যাবে। তবে একথা হচ্ছে, এনায়েতুল্লাহ তোমার ভাই। কু-প্রবৃত্তির বশে সে তোমায় মেরে বসেছে। এখন তুমি তাকে মাফ করে দিলে খুব

ভাল কথা। তুমি আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে। আর বদলা নিলে কিছু পাবে না। মোট কথা, মাফ করার মধ্যে সওয়াব নিহিত। মাফ করে দেয়া আল্লাহর রাসূলের নীতি। আবার প্রতিশোধ নেয়া তাঁর নীতি। তবে মাফ করা উত্তম।

একথা শুনে লাহোরী বললেন, আমি যদি তাকে মাফ করে দেই, তাহলে সওয়াব পাব তো? মাফ করে দিলে কোন গোনাহ নেই তো? তিনি বললেন, না! গোনাহ নেই। দু'টোই আল্লাহর রাসূলের বিধান, যেটা মন চায় করতে পার। লাহোরী বললেন, আমি আমার হক্ব চাই। কাজী সাহেব বললেন, তোমার হক্ব হলো তুমিও এনায়েতুল্লার ঐ জায়গায় মারবে, যেখানে সে তোমায় মেরেছে। অতঃপর এনায়েতুল্লাহকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। মারো! তোমার প্রাপ্য আদায় করে নাও!

আমার কি প্রাপ্য এই যে, আমি তাকে প্রচণ্ড ঘুসি দেব, যেমনটি যে আমায় দিয়েছে? কাজী সাহেব বললেন, জি হ্যাঁ।

উপস্থিত জনতা ধারণা করে নিয়েছিলেন, লাহোরী এই বুঝি এনায়েতুল্লাহকে ঘুসি লাগায়! লাহোরী সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সকলে সাক্ষী! কাজী সাহেব আমায় অধিকার দিয়েছেন, আমি তার বদলা নিতে পারি। কিন্তু আমি নিছক আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য তাকে মাফ করে দিলাম। এরপর এনায়েতুল্লাকে বুকে টেনে নিয়ে মুসাফাহা করেন। উপস্থিত জনতা হতবাক হয়ে যায়! সকলেই লাহোরীকে বাহ্বা দিতে থাকে। বলে, তুমি ক্ষমার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কায়েম করলে!

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠন

রাসূলের মহাব্বত ছাড়া এ ক্ষমা সম্ভবপর নয়। নিছক আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী মুতালা করা ছাড়া এ ধরনের উদারতা, ক্ষমা ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। এখানে যে ভাষণ দেয়া হলো এবং প্রবন্ধ পাঠ করা হলো, আমি তা স্বীকার করছি, অবশ্য প্রতিদান নিলে মনে করতে হবে রাসূলের মহাব্বত পয়দা হয়নি। মুহাব্বত পয়দা করার জন্য সীরাতে রাসূলের গবেষণা করতে হবে। ঐ গবেষণা রূহের খাদ্য হয়ে যাবে। পথের দিশা হবে। আমাদের কাছে কুরআন ও সীরাতের মত অতি উত্তম পাথেয় আর কিছু নেই।

আপনারা আমার যে সম্মান ও ইজ্জত করলেন, এর প্রতিদানস্বরূপ আমি আমার অভিজ্ঞতার নির্যাস আপনাদের সম্মুখে পেশ করব। আজ ইসলাম আমাদের এক পরম সম্পদ, ইসলামের কথায় কুরআন ও সীরাত পরিপূর্ণ, আত্মসঞ্জীবনী ও বিপ্লবাত্মক এই দ্বীন ও তার অলৌকিক ক্ষমতা সত্যিই এক অন্য শক্তি আমরা যা নিয়ে গৌরববোধ করতে পারি। আমাদের কাছে শক্তির যে প্রস্রবণ রয়েছে, তা

আমাদের আত্মাকে কাবু করতে পারে, আমিত্বকে বিলুপ্ত করতে পারে, দূর হয় কু-প্রবৃত্তি এবং যদ্দ্বারা দিল ও অন্তর পরিষ্কার হয়, জমিনের অন্ধকার গলি দিয়ে আমরা আলোকোজ্জ্বল রাজপথে পৌঁছতে পারি, তাগুতের বিরুদ্ধে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় রুখে দাঁড়াতে পারি, সেই শক্তির উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তথা আল-কুরআন। কুরআন মজীদ আজও আপন শক্তিতে উজ্জ্বল, উপচে পড়ছে তার স ীবনী পানি। আমি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে লক্ষ্য করে আরজ করতে চাই, সর্বপ্রথম যে জিনিষের সাথে আমাদের মহাব্বত রাখতে হবে, সীরাতে নব্বী। আজও তা নয়া বিপ্লবের জোয়ার বইয়ে দিতে পারে। সীরাতুন্নবী পর্যালোচনা করুন আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে, এক অধ্যায়। সমাজ জীবনের আমরা যেখানেই সীরাতকে বিদায় দিয়েছি, সেখান থেকেই আমাদের পতন শুরু হয়েছে। তাই সীরাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে আমাদের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে।

কু-প্রবৃত্তি একটি ব্যাধি

তারীখে ইসলামের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হচ্ছে কু-প্রবৃত্তির পূজা। শত্রুর শত্রুতা আমাদের কখনো পরাজিত করতে পারেনি। আমাদের পরাজয় ত্বরান্বিত হয়েছে একমাত্র আত্মকলহের কারণে, অহেতুক মতপার্থক্যের কারণে আমাদের সেই আজিমুশ্বান সালতানাত হাতাছাড়া হয়ে গেছে, ফকীর হয়েছি আমরা ঐ একই কারণে। এক্ষণে আমি একটি উদাহরণ পেশ করছি। স্পেন থেকে মুসলিম জাতির নাম-নিশানা মুছে গেছে একমাত্র গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহের কারণে। এ কথা আমি কস্মিনকালেও বিশ্বাস করি না শুধু খ্রীস্টবাদী ক্রুসেডাররা আমাদেরকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করেছে। মুসলিম শক্তির প্রদীপটির তেল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তখন। এর মূলে দায়ী ছিল উত্তর আরবীয়, হেজাযীয়, ইয়ামানী আরবদের গৃহযুদ্ধ ও অহেতুক আত্মকলহ ও মতপার্থক্য। ইকবালের ভাষায় স্পেনের বড় বড় মসজিদে দেখা গেছে অনেক দিন, কিন্তু চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আজান দেয়ার কণ্ঠ। মুসলিম বিতাড়িত প্রতিটি রাষ্ট্রেরই উপাখ্যান একই ধরনের, বিশেষ করে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মোগল সম্রাটের পতনের মূলে দায়ী ঐ আত্মকলহ।

ইসলামী চেতনাকে জীবনের লক্ষ্য বানাও

আত্মার রোগ শুধু নসিহত কিংবা প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে উপশম করা যাবে না। কোন বস্তুকে পরাজিত করতে হলে অপর বস্তুটি শক্তিশালী হতে হয়। যেমন আগুন নেভাতে হলে পানি ঢালতে হয়। কোন জিনিষকে গরম করতে হলে আগুনের দরকার হয়। আত্মার চেয়ে নসিহত ও প্রবন্ধ শক্তিশালী নয়, তাই তা দ্বারা আত্মার রোগ নিবারণ সম্ভব নয়। ঐ রোগ শরীরে থাকাকালীন আমাদের পারস্পরিক

মহাব্বত ও সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না। সর্ববিধ চেতনার ওপর ইসলামকে প্রাধান্য না দিলে পরিস্থিতি বদলাবে না, বরং পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে।

জড়বাদ নয়—রাসূলের (সা.) আদর্শই মুক্তির পথ

আমি ইউরোপের বিভিন্ন সফরে প্রায়শই বলে আসছি, আজ আপনাদের সামনে এক বিরাট পরীক্ষা! রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাদের আঁচল ধরে থাকবেন, তিনি আল্লাহর কাছে কিয়ামত দিবসে এই মামলা করবেন, আমি তোমাদেরকে এক বিশাল ময়দানে রেখে এসেছিলাম, তোমরা এখানেই ইসলামের আলো ছড়াতে পারতে, দিগ্বিজয়ীদেরকে বিজিত করতে পারতে, কিন্তু তোমরা আত্মকলহ, গৃহযুদ্ধ ক্ষমতা দখলের রেষারেষিতে লিপ্ত ছিলে। বল! তোমরা সেদিন কি জবাব দেবে?

ইসলামের সাথেই এ দেশের ভাগ্য জড়িত

[১৬ই মার্চ ১৯৮৪ শুক্রবার ঢাকা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে প্রদত্ত খোৎবা]

হামদ ও সালাতের পর।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ـ واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ـ وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ط كذلك يبين الله لكم ايته لعلكم تهتدون ـ

"তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে আর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারিত করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছ। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পার।" [আল-ইমরান ঃ ১০৩]

প্রিয় ভাই সকল! আল্লাহ্ পাকের হাজার শোকর, তিনি এক জায়গায় একত্রে এতো অধিক সংখ্যক মুসলমানের মুখ দর্শনের সৌভাগ্য দান করেছেন।

এমন এক সময় ছিল যখন একজন মুসলমানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য চোখ তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকত। দুনিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা এতো অল্প ছিল যে, হাতের আঙ্গুলে তা গণা যেত। আর আজ আল্লাহ্‌র রহমতে পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা শত কোটিও ছাড়িয়ে গেছে। এই মোবারক মুহূর্তে দুনিয়ার কত লক্ষ মসজিদে আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দাগণ আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হতে উপস্থিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

আমাদের প্রত্যেকের এ অনুভূতি থাকা উচিত, আল্লাহ্ আমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন! বস্তুত কালেমার সৌভাগ্য, ঈমান ও তাওহীদের সৌভাগ্যই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধন-দৌলত হাসি মুখে লুটিয়ে

দেয়া যেতে পারে এ সৌভাগ্য লাভের মোকাবেলায়। ঈমান ও তাওহীদের মূল্য এমনই যে, কোন মুসলমানকে যদি বলা হয়, তোমাকে দশ দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হবে যদি তুমি কালেমার বিশ্বাস প্রত্যাহার করে নাও, তবে সেই মুহূর্তে তার মুখ থেকে বুক ফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসবে, হে দ্বীন দুনিয়ার মালিক, কি অপরাধ করেছি, শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি আমার ঈমানের ওপর পড়ল?

তুরস্কের অভিশাপ কামাল আতাতুর্কের সময় আরবীতে আযান দেয়ার ব্যাপারে সরকারী বিধি-নিষেধ জারী হয়েছিল। বাধ্যতামূলকভাবে তুর্কী ভাষায় আযান দিতে হতো, তুর্কী মুসলমানগণ আরবী ভাষায় আযান শোনার জন্য ছটফট করছিল। তুর্কীরা আমাকে জানিয়েছে সরকারী বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের পর প্রথম যখন আরবী ভাষায় আযান দেয়া হলো, মসজিদের মিনারে যখন ধ্বনিত হলো الله اكبر- আরবী আযানের সেই সুমধুর সুর মূর্ছনায় গোটা তুর্কী জাতি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে, রাস্তায় নেমে এসে তারা উল্লাসে নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল। হাজার হাজার দুম্বা এই খুশীতে জবাই করে ফেলেছিল। মৃত্যুর পূর্বে মদীনার ভাষায় মদীনার আযান শোনার সৌভাগ্য হলো। এখন আমরা নবীজীর সামনে গিয়ে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারব। রাস্তায় রাস্তায় জনতার ঢল দেখে যে কোন পর্যটকের এ ধারণা হতে পারত, বুঝি বা তুর্কীরা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে! কনস্টান্টিনোপলের বৃহত্তম মসজিদে জামে সুলায়মানীতে আমি সালাত আদায় করেছি, অন্যান্য মসজিদেও আমি গিয়েছি। সালাম ফিরিয়েই তুর্কীরা আরবী ভাষায় যে কথাটি বলে তা

وعلى نعمة الاسلام الحمد لله -

" আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন ; এখন তার প্রশংসা ও শোকর।" আমি বলছি না, আপনারাও তুর্কীদের অনুকরণ শুরু করুন। আলেমগণ কিছুতেই এতে অনুমোদন করবেন না আমাদের। তাই বলা উচিত যা আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তুর্কীদের এই স্বীকৃতজ্ঞ অনুভূতিকেও আমি শ্রদ্ধা না করে পারি না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হও। ইসলামকে নিয়ে গর্ব করতে শেখো। যতদিন তোমরা ইসলামকে দুনিয়ার সকল সম্পদের ওপর প্রাধান্য দেবে, ইসলামের মোকাবিলায় সর্বস্ব বিসর্জন দিতে শিখবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ও তোমাদের দেশের ওপর আসমানের কল্যাণ ধারা বর্ষণ অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمه اخوانا ـ وكنتم على شفاحفرةمن النار فانقذ كم منها ـ

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করোঃ যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছ। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলে, তখন তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন।"

আল্লাহর অনুগ্রহ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করো। তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। একে অন্যের খুনপিয়াসী ছিলে। فالف بين قلوبكم আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। হৃদয়ে ভালোবাসার ফুল ফুটিয়েছেন। افاصبحتم بنعمته اخوانا ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। বল, কোথায় এভাবে বড়-ছোট, আমীর-গরীব, রাষ্ট্রপ্রধান ও সাধারণ নাগরিক এক সাথে এক কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামিল হতে পারে! আল্লাহ্র ঘরে আসার পর মাহমুদ-আয়াযের সকল ব্যবধানই মুছে যায়। এখানে সাদা কালো সবাই ভাই ভাই। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যত বিরোধ লড়াই ছিল ইতিহাসের পাতায় আজ তার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। ভাষা ও বর্ণের দ্বন্দ্ব, গোত্র ও সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, ধনী দরিদ্রের শ্রেণীদ্বন্দ্ব, ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে গোটা-পৃথিবী ছিল দ্বন্দ্বমুখর। মানুষের হাত লাল হতো মানুষেরই খুনে। মানুষের আহাজারি ও আর্তনাদ চাপা পড়ে যেত মানুষের নারকীয় উল্লাস ও অট্টহাসিতে- فاصبحتم بنعمته اخوانا ـ

অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হলে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذ كم منها ـ

জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে তোমরা উপনীত হয়েছিল। আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। যদি আল্লাহর দ্বীন অবতীর্ণ না হতো, যদি নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে প্রেরিত না হতেন, যদি আল্লাহ্র শেষ নবীর শুভাগমন না হতো, তবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে আর কিছুই তো অবশিষ্ট ছিল না। দেখুন, পৃথিবীর কত বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়করা আজ ঈমান ও তাওহীদের মতো সহজবোধ্য ও সাধারণ জ্ঞান (উমববমভ গুণভ্রণ)-টুকু থেকে বঞ্চিত, অথচ আমার আপনার মতো সাধারণ লোককে আল্লাহ্ ঈমানের দৌলত দান করেছেন। কোন

দর্শন, কোন আন্দোলন ও কোন শ্লোগানই যেন এ জাতির সামনে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে না দাঁড়াতে পারে। বোখারী শরীফের হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "কেউ যদি তিনটি বিষয়ের অধিকারী হতে পারে তবে বুঝতে হবে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলই তার কাছে পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। দ্বিতীয়ত কুফরী জীবনে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক মনে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলদেরই উত্তরাধিকার। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

ام كنتم شهداء اذحضر يعقوب الموت ط اذقال لبنيه ماتعبدون من بعدى ط قالوانعبد الهك واله ابائك ابراهيم وإسمعيل واسحق الها واحدا ط ونحن له مسلمين -

"ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন সে তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিল, "আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?" তখন তারা উত্তরে বলল ঃ আপনার, ইব্রাহীমের, ইসমাঈলের ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করবো যিনি এক অদ্বিতীয়।" [বাকারা ঃ ১৩৩]

মৃত্যুর সময় ইয়াকুব তাঁর সন্তানদের ডেকে বৈষয়িক কোন কথা বলেন নি। বলেন নি, অমুক স্থানে আমার অত সম্পদ গচ্ছিত আছে, অমুকের কাছে এত পাওনা আছে, তোমরা তা সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিও। এটা বলা অস্বাভাবিক কিংবা অন্যায় হতো না। তা না করে সন্তানদের ডেকে তিনি বললেনঃ হে প্রাণাধিক পুত্রগণ! আমাকে একটা কথাই শুধু বলো- وماتعبدون من بعدى আমার এ চোখ দু'টো বন্ধ হওয়ার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তোমাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে না পারলে কবরেও আমার শান্তি হবে না। তারা উত্তরে বলল ঃ আব্বাজান! আপনি এতটা পেরেশান কেন? ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক; ইয়াবুব আলাইহিমুস সালামের পবিত্র রক্ত আমাদের শিরায়ও প্রবাহিত, আমরা মরে যাওয়া পছন্দ করব কিন্তু মুহূর্তের জন্য শিরকের পাপ স্পর্শ সহ্য করব না نعبد الهك واله ابائك আমৃত্যু আমরা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষের মাবুদ আল্লাহ্র অনুগত থাকব।

সন্তানদের এ উত্তরে শুনে তবে তিনি আশ্বস্ত হলেন। এ-ই হওয়া উচিত

প্রত্যেক মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। নিজের ও পরিজনদের ঈমানের হিফাজতের জন্য তাকে থাকতে হবে সদাসতর্ক, সদাসন্ত্রস্ত। সন্তান ও পরিজনদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে দিতে হবে যেন তার মৃত্যুর পরও তারা ঈমান ও তাওহীদের প্রতি অবিচল থাকতে পারে, সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। প্রত্যেক মুসলমানকেই নিজের ও পরিজনদের ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা (ঐলটরটর্ভশ) লাভ করা অপরিহার্য। ঈমানের সাথে সাথে শির্‌ক ও কুফরীর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের প্রতিও প্রচণ্ড ঘৃণা ছাড়া ঈমান সর্বদা অরক্ষিত। এজন্য কুফরীর প্রতি ঘৃণা পোষণের কথা ঈমানের আগে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

فم يكفر بالطاغوت ويؤ من بالله ـ

"যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনবে।"

ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করুন। কত বড় দেশ আপনাদেরকে আল্লাহ্ দান করেছেন! এদেশ সম্পর্কে কুদরতের ফয়সালা এই, ইসলামের মাধ্যমেই এদেশ সম্মান ও গৌরব লাভ করবে। কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে। মসজিদে নববীর মিম্বরের প্রতিনিধিত্বকারী আপনাদের এ মসজিদের মিম্বরে বসে বলছি, এদেশের সুখ-শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তা ইসলামের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্ না করুন, যদি এ দেশ কখনো আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যাপারে কৃতঘ্ন প্রমাণিত হয়, ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে কিংবা এ দেশের মানুষ আল্লাহর রজ্জুকে ছেড়ে অন্য কোন রজ্জু আঁকড়ে ধরতে চায় তবে এ দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কোন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও বাইরের কোন সাহায্য ও ছত্রছায়াই এ দেশকে আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

ياايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।" [বাকারা ঃ ২০৮]

মাথাকে মসজিদে গলিয়ে দিয়ে গোটা দেহ বাইরে রেখে দিলে একথা বলা যাবে না, আপনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন। তদ্রূপ আল্লাহ্ পাকেরও দাবী হলো, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। আকীদা ও বিশ্বাস, ইসলামী আহাকাম ও বিধি-বিধান, ইসলামী আইন, সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন, এক কথায় গোটা 'আল ইসলামের' কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। একমাত্র তখনই শুধু আল্লাহর দরবারে আপনার ইসলাম গ্রহণ স্বীকৃতি ও অনুমোদন

লাভ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যখন আল্লাহর নির্দেশ এল, اسلم "হে ইব্‌রাহীম, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করো", তখন সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন ঃ اسلمت لله رب العالمين "রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহরও দরবারে আমি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম।" আপনাকে, আমাকেও ইব্‌রাহীমের মিল্লাতভুক্ত হওয়ার সূত্রে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে একবার আশ্রয় গ্রহণ করে দেখুন, আকাশ থেকে নিয়ামত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা কিভাবে নেমে আসে!

ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم

بركلت من السماء والارض -

"বস্তিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহ নির্দেশ মেনে নিত তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বরকত ও প্রাচুর্যের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিতাম।"

[আরাফ ঃ ৯৬]

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, ইসলামের সাথে এ দেশের ও রাসূলে আরাবী (সা.)-এর সাথে এ জাতির সম্পর্ক চিরঅটুট থাকুক! রিযিক, নিয়ামত, বরকত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা এ জাতির ওপর বর্ষিত হোক! সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা এখানে বিরাজ করুক! ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবসা, সম্প্রীতি, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করুক!

প্রবাসী মুসলমানদের প্রতি আবেদন, উপদেশ ও পরামর্শ

[নিম্নের বক্তৃতাটি ২০ শে জুন, ১৯৭৭ আমেরিকার শিকাগো শহরে মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে প্রদত্ত হয়। সমাবেশে আমেরিকার বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থার সদস্যবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এটি ছিল মাওলানার আমেরিকা সফরকালীন প্রদত্ত সর্বশেষ বক্তৃতা। এমন আশা ছিল না যে, তিনি এত বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত দায়িত্বশীল সাথীদের সাথে আর কথা বলার সুযোগ পাবেন। এজন্য তিনি তাঁর সুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার সারনির্যাস, সদিচ্ছাপূর্ণ পরামর্শ ও সশ্রদ্ধ আবেদন বক্ষ্যমাণ বক্তৃতায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।]

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আজ তিন সপ্তাহ হলো আমি উত্তর আমেরিকা ও কানাডা সফর করছি। এ সময়ে উর্দূ ও আরবীতে আমি ডজনখানেক বক্তৃতা দিয়েছি। বক্তৃতা তো বক্তৃতার মতই হয়। এর ভেতর বাগ্মিতা থাকে, থাকে বিভিন্ন বিষয় ও এর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু আজকের এ মজলিসের ও আজকের বক্তৃতার প্রকৃতি ইতোপূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো থেকে একটু ভিন্ন হবে। আজ আমি বক্তৃতা দেব না। আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। কথাও আবার এমন যেমন একই পরিবারের একজন সদস্য অপর সদস্যের সঙ্গে বলে থাকে। অনেক দিন পর আপনজনের সঙ্গে, প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার পর কেউ যেমন নিজের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, ঠিক তেমনি এই অধিবেশনে কিছু কাজের কথা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমার অনুরোধ, আপনারা এগুলো আপনাদের ডায়েরীতে লিখে নিন কিংবা নোটবুকে টুকে নিন, গেঁথে নিন স্মৃতির পাতায়। আমার এই আলোচনায় যেমন অতিশয়োক্তির আশ্রয় নেব না, তেমনি বিনয়ের আতিশয্যও এতে থাকবে না, থাকবে না কোন প্রকার টীকাভাষ্য।

এ সফরে বিভিন্ন জায়গায় নানা ব্যক্তি ও সংস্থা-সংগঠনের সদস্যদের সাথে মিলিত হবার পর আমার মস্তিষ্কে কয়েকটি কথা গেঁথে গেছে এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, এই সফর যা ..ও.ই. এবং আমার প্রিয় ও একনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা সাধনার ফলে সম্ভব হয়েছে, যারা গত তিন-চার বছর থেকে আমাকে স্মরণ করছিলেন, কথাগুলো এই সফরের পুঁজি ও মূল্যবান উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করছি এবং আপনারাও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমার মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের করেন যা অনেক দিন পর্যন্ত আপনাদের কাজে আসবে এবং আমার সফরও সার্থক হবে। কেননা আমি খুব ভয় পাচ্ছি, আমি এই সফরের হক আদায় করতে পারলাম কিনা। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমি এলাম; তাছাড়া

সফরের ব্যাপারে যেসব জরুরী ইন্তেজাম ও আবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্পন্ন করতে হয় সেসব পেরিয়েই আমাকে আসতে হয়েছে এবং আপনাদেরকেও এজন্য অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে, সব কিছুর পর এক্ষণে তার পুরো ফলটা (র্ণাট্রলর্ফ) কি? ভয় হয়, না জানি আল্লাহর দরবারে এজন্য আমি প্রশ্নের সম্মুখীন হই! হতে পারে এই সফর দ্বারা অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, অনেক গাফলতি হয়েছে। আমি সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারিনি যেই মাপকাঠির ওপর আমার টিকে থাকা দরকার ছিল। হতে পারে আজকের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে সে স্তরের কিছুটা কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ্ করুন কথাগুলো যেন আপনাদের মনেও থাকে! কেননা কথা তো অনেকই হয় আর প্রতিটি বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু কাজের কথাগুলো ভুলিয়ে দেয়া হয়। এও হয় বক্তার বক্তৃতাকালেই শ্রোতাদের মনে প্রশ্ন খুঁজতে লেগে যায় এর ওপর আমরা কি প্রশ্ন করব। আমার অনুরোধ, যতক্ষণ আমি আপনাদের সাথে কথা বলব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের মস্তিষ্ককে প্রশ্ন তৈরির কাজে ছেড়ে দেবেন না।

সবচে' বড় ক্ষতি ঃ প্রথম কথা হলো এই, আপনারা এর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করুন আপনাদের কাছে ইসলামের যে পুঁজি রয়েছে তা যেন খোয়া না যায়। আপনাদের কল্পনায় চেতনায় যদি কিছুটাও এই চিন্তা ঠাঁই পায়, দুনিয়ার যিন্দেগী কত সংক্ষিপ্ত আর আগামী দিনের যিন্দেগী কত দীর্ঘ এবং আখেরাতে কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করতে হবে তাহলে আপনার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাবে, বরং এমনও হতে পারে তীব্র পেরেশানীর দরুন আপনার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। আমরা যদি এই দেশে সব কিছুই করি, কিন্তু আখেরাতের চিন্তা ও আল্লাহর ভয় হারিয়ে বসি তাহলে আমাদের মত দুর্ভাগা আর হবে না কেউ। একজন বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে আমি বলছি, আল্লাহর কসম! নিজেদেরকে এ ধরনের বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করার চেয়ে এও ভাল আমরা পথের ফকীর হিসেবে কড়ির কাঙাল হয়ে জীবন যাপন করি। আমাদের প্রিয় সন্তানদের ধর্মীয় ভবিষ্যতকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবার চেয়ে দীন দরিদ্রের জীবন যাপনও ভাল। সব কিছু পেলাম, বিনিময়ে ঈমানী সম্পদ হারালাম, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছু নেই।

হুযুর (সা.) বলেন, "যার ভেতর তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে তার ঈমান পরিপূর্ণতা পাবে, পূর্ণাঙ্গ হবে। তার ভেতর একটা হলো এই, কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তনের কল্পনাও তাকে এতখানি আতংকিত করবে যেমন কাউকে আতংকিত করে তাকে (হাত-পা বেঁধে) আগুনে নিক্ষেপ করতে গেলে।"

আর আমরা যেন নিম্নোক্ত আয়াতের প্রয়োগস্থলে পরিণত না হই ঃ

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا - الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا-

"বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে, তারা সৎ কাজ করছে।" [সূরা কাহাফ ঃ ১০৩-৪ আয়াত]

এর ভেতরে বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় এটাই, বেচারারা মনে করে আমরা খুব ভাল করছি। আমার ভয় হয় এই আয়াত আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়ে বসে! বহু লোক আছে যারা ভুল করে, অন্যায় করে এবং মনে করে ভুল কাজ করছি। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্যই এই, মানুষ মনেই করে না যে সে ভুল কাজ করছে, অন্যায় কাজ করছে। নিজের কাজে সে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত এই ভেবে সে ভাল কাজ করছে। যেমন, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আমি আমার কোন বন্ধুকে যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার ভাই কোথায় এবং কি করছে? তাহলে সে বলবে, মাশাআল্লাহ্ সে আমেরিকায় মাসে এত হাজার ডলার বেতন পায়। এ ধরনের কথা সেখানে বলা হবে বা বলা হয়। আর এখানে আমরা কি বলি? আমরা বলি, আরে ভাই, আমরা তো এখানে খুব ভাল আছি। হায়দারাবাদ, ইউপি, বিহার, লাহোর, করাচী (ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা)-তে থাকলে কি পেতাম আর কি খেতাম। আমরা এখানে যা পাচ্ছি তা ওখানকার মন্ত্রী-মিনিস্টাররাও পান না।

প্রথমত কথা যা বলতে চাই তা হলো, আপনারা এর থেকে সতর্ক হোন, ভয় করুন এবং সর্বপ্রকার উন্নতি ও প্রাচুর্যের মুকাবিলায় ঈমানের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন যেন এখান থেকে, দুনিয়া থেকে নিরাপদে চলে যেতে পারি, এবং হাশরের ময়দানে ঈমানী হালতে উঠতে পারি। আমিতো বলি, যে ব্যক্তি আমেরিকায় থেকে নিরাপদে ঈমানটা সাথে নিয়ে যাবে এবং হাশরের ময়দানে ঈমানসহ উঠবে তার পুরস্কার ও সওয়াব তার থেকে অনেক বেশি হবে যে আরব ভূখণ্ডে থেকে ঈমানসহ উঠবে। কেননা আমেরিকায় বসবাসকারী লোকটি তার ঈমানের প্রোজ্জ্বল দীপশিখাটির হেফাযত করেছে অন্ধকার তুফানের ভেতর থেকে। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, হুযুর (সা.) বলেন, আমার কিছু ভাই এমন হবে যারা ঈমানের ওপর কায়েম থাকবে এবং দ্বীনের পাবন্দী করবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেন, তোমরা তো আমার সঙ্গী-সাথী। আমার ভাইতো তারা যারা আমাকে দেখেনি। তারা বহু পরে আসবে। আমাকে না দেখে তারা বিশ্বাস করবে।

আমেরিকায় ওলীর দরজা

এটা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়, আপনারা আমেরিকায় ওলীর বেলায়েতের উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা হাসিল করতে পারেন। আল্লাহর নিকট আপনাদের আমল অনেক বেশী প্রিয় হবে। সন্তান যখন কোথাও দূরে চলে যায় তখন মার মন সন্তানের সাথে লেপ্টে থাকে। মা সন্তানের জন্য দোয়া করতে থাকে এই বলে, আমার সন্তান বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়ে আছে। আল্লাহ্! তুমি আমার সন্তানের হেফাযত কর। আপনারা ইসলামের সেই সব সন্তান যারা ইসলামের কেন্দ্রভূমি থেকে বহু দূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কুফুর ও বস্তুবাদের ফাঁদে পড়ে আছেন, আপনাদের ওপর আল্লাহর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আপনারা কখনওই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না।

ঈমানকে সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দিন। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষু অবস্থায় ঈমান লক্ষ গুণে উত্তম সেই সম্পদ ও সাম্রাজ্যের চেয়ে যা ঈমানবর্জিত। মাশাআল্লাহ্। আপনারা সকলেই ধীশক্তিসম্পন্ন ও শিক্ষিত। আপনারা যদি এতটুকু আশংকা বোধ করেন এখানে ঈমান বিপদের সম্মুখীন, তাহলে আপনাদেরকে সমস্ত পরিবার-পরিজন নিয়ে নিজ নিজ দেশে যেখানে আপন দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের নিশ্চয়তা আছে, যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয়, তবুও চলে যাবেন। মনে করবেন আল্লাহর সেই নির্দেশ ঃ

.... فلاتموتن الاوانتم مسلمون

"আর তোমরা মরো না, আল্লাহর অনুগত বান্দা না হয়ে"। [সূরা বাকারা ঃ ১৩২ আয়াত]

সর্বাবস্থায় প্রতিটি আমল করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। আমি আপনাদেরকে দু' মিনিট সময় দিচ্ছি যাতে কথাগুলো আপন হৃদয়মানসে গেঁথে নিতে পারেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি

দ্বিতীয় কথা হলো নিজেদের নিয়তকে সহীহ-শুদ্ধ করতে থাকুন। যে কাজই করুন আল্লাহর রেযামন্দী তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য করুন। এর ভেতরে কোন প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ কিংবা পদমর্যাদা হাসিল অথবা অন্যবিধ উদ্দেশ্য টেনে আনবেন না। দুনিয়ার লাভ তো আপনি, আল্লাহ চাহেত আপনার যোগ্যতা ও পরিশ্রম মুতাবিক পাবেনই, কিন্তু নিয়ত সর্বদাই ঠিক রাখবেন যাতে আমলের সহীহ সওয়াব পেতে পারেন। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে ঃ

"সর্বপ্রকার আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তার আমলের ভেতর থেকে এতটুকুই পাবে যতটুকুর নিয়ত সে করেছে। যদি কোন লোক হিজরত আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্য করে থাকে তবে তার হিজরত আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্যই হবে। আর কারুর হিজরত যদি দুনিয়া লাভ কিংবা কোন মহিলার পাণি গ্রহণের উদ্দেশে হয়ে থাকে তবে তার হিজরত সেজন্যই হবে যে উদ্দেশে সে হিজরত করেছে।" [বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস]

এজন্যই মাঝে-মধ্যে নিজের নিয়ত সহীহ্-শুদ্ধ করে নিন। সকল কাজে নিয়ত হবে আল্লাহর খুশী এবং ইসলাম ও মুসলমানের খেদমত। আল্লাহ্ চাহেত এতে আপনারা জিহাদেরও কখনও কখনও শাহাদতের সওয়াব পাবেন।

আমলের ওজন

আপনারা ঈমান ও ইহতিসাব (আল্লাহর ওয়াদার ওপর একীন এবং তার পুরস্কার ও সওয়াবের লোভে কাজ করা)-এর ওপর আমল করুন যাতে আমল ওজনদার হয়। আল্লাহর নিকট কেবল সেই সব আমলই ওজনদার হয়ে থাকে যা ঈমান ও ইহতিসাবের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। রমযান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি রমযানের রোযা আল্লাহর ওয়াদার ওপর একীনপূর্বক এবং তার সওয়াব লাভের লোভে পালন করবে তার গত জীবনের সমস্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।"

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন ঃ ভাল! কেউ কি বদ নিয়তে রোযা রাখতে পারে? কিন্তু বন্ধুগণ! জেনে নিন, একটা হলো বদ নিয়তি আর আরেকটা হয় বে-নিয়তি। আমি প্রায় বলে থাকি মুসলমান বদ নিয়তের খুব কমই হয়ে থাকে, কিন্তু বেশীর ভাগ তারা বে-নিয়তের শিকার অর্থাৎ তারা কোন আমলের সময়-সুযোগ হলে আদপে তারা চিন্তাই করে না এই আমল তারা আল্লাহর রেযামন্দীর নিয়তে করছে নাকি অভ্যাসবশে কিংবা প্রথাগতভাবে করছে। যন্ত্রের মত মেশিনের মত আমল করলে তেমন কিছু লাভ দর্শে না।

দিলকে শাণিত করুন

তৃতীয় কথা হলো, নিজের ব্যাপারে গাফিল থাকবেন না, বরং আপন আমলের ও নফসের মুহাসাবা করুন, খতিয়ান নিতে থাকুন। নিজেই নিজের পরীক্ষক হোন এবং নিজের কর্মের ভালমন্দ সব খুঁজতে থাকুন। এজন্য আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দেব, বছর-দু'বছর পর আপনারা নিজ নিজ দেশে কিছুদিনের জন্য হলেও অবশ্যই যাবেন, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। ভারত ও পাকিস্তান, বাংলাদেশ, হারামায়ন শরীফ হলে তো আরও ভাল। সেখানে থেকে ভাল হক্কানী ও আল্লাহ্ওয়ালা আলেম-উলামা ও পীর বুযুর্গদের খেদমতে হাযির হোন, যেসব

আলেম-ওলামা ও পীর-বুযুর্গ স্বার্থলেশহীন, যাঁদের সান্নিধ্যে গেলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করুন, তাঁদের সাক্ষাতে মিলিত হোন অথবা কোন দ্বীনী পরিবেশে কিছু সময় অতিবাহিত করুন। যদি শুধু এখানেই থাকেন তাহলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও ঈমানী কায়ফিয়াতের যে পুঁজিটুকু আছে তা কেবল খরচই হতে থাকবে। যেমন কোন ব্যাটারী অব্যাহতভাবে ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় তার শক্তি, সেই অবস্থায় নতুন ব্যাটারী-সেলের প্রয়োজন দেখা দেয়, ঠিক তদ্রূপ আপন দিলের ব্যাটারীকেও নতুন নতুন ব্যাটারী সেল দিতে থাকুন এবং অল্পস্বল্প বিরতির পর দু'বছর-চার বছর পর হলেও নিজের দেশে যান। আমরা দেখেছি, যেসব লোক নিজ নিজ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে বা রেখেছে তাদের ভেতর এমন কিছু পাওয়া যায় যা সেসব লোকের ভেতর পাওয়া যায় না, যারা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি কিংবা একেবারেই ছিন্ন করেছে, তারা জানে না, যে দ্বীনের মাপকাঠি কি, কায়ফিয়াত কি? উদর পূর্তি ছাড়া জীবনের কোন পরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাদের সামনে নেই। নামাযের জায়গায় নামায আর রোযার জায়গায় রোযা রাখা–কোনটার ঘাটতি কোনটা দিয়ে পূরণ হবার নয়। এসব এখানেও করে বটে, কিন্তু তাদের ধারণাই হয় না, এসবের ভেতর কতটা ফাঁক-ফোকর সৃষ্টি হয়ে গেছে, এসব কতখানি ভরাট হয়ে গেছে। আল্লাহর প্রিয় ও মকবুল বান্দাদের অবস্থা কি? তাদের সালাতের অবস্থা কেমন এবং ইবাদত বন্দেগীর অবস্থাই বা কেমন আর তাদের রুচির প্রকৃতিই বা কি?

দ্বীনী পরিবেশকে পাওয়ার-হাউজ মনে করুন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আল্লাহর ফযলে এখনও দ্বীনী পরিবেশ বর্তমান এবং সেখানে এমন সব লোক আছেন যাদের কাছে বসলে আসলেই অন্তরের কালিমা সাফ হয়ে যায়। একথা আমি বলছি বিরাট অভিজ্ঞতা থেকে, হেজাযেও আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যেখানে আমি বরাবর গিয়ে থাকি। সেখানে আমি দেখেছি যেসব খান্দান উপমহাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আর এটাতো পরিষ্কার, হারামায়ন শারীফায়নই ইসলামের আসল মারকায-মূল কেন্দ্র। কিন্তু সেখানেও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পৌঁছুচ্ছে। সম্পদের সেখানে ছড়াছড়ি। সেখানে গিয়ে এই ধারণা জন্মে, আমাদের আর কি? আমরা তো হারাম শরীফের অধিবাসী। কা'বা শরীফের চতুর্দেয়ালের ছায়ায় আছি। যারা উপমহাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, সেখানে আসা-যাওয়া করেন, উর্দু ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যে ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদি, পত্র-পত্রিকা ও দাওয়াতী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ইদানীং বাংলাদেশ থেকেও উলামায়ে হকের আগমন ঘটে তখন তারা আপনাদের এখানেই এসে ওঠেন, আপনারা তাদেরকে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ও নানা সমস্যা সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকেন। তাদের দ্বীনী ও ধর্মীয় হালত ভাল। তারা বেশির ভাগ সময় হারাম শরীফ গিয়ে থাকেন, তারা বেশি বেশি ওমরা করে থাকেন, মদীনায়ে তায়্যিবায় হাযিরা দেবার ও রওযায়ে আকদাস (সা.)-এ যিয়ারতের আগ্রহ এবং সেখানকার প্রতি আদব-সম্মান তাদের ভেতর বেশি দেখতে পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর (তাঁর প্রতি আমার আব্বা-আম্মা কুরবান) পবিত্র ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে গভীর ও হার্দ্য সম্পর্কে তাদের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্বসূরী বুযুর্গদের প্রতি সুধারণা পোষণ

চতুর্থ কথা হলো, আপনারা আমেরিকায় আছেন। আপনাদের পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহও আছে, আগ্রহ আছে জানার প্রতি। ইসলামী সাহিত্য আপনারা পড়ে থাকেন। আমি দেখেছি, এখানে ইংরেজী ও উর্দু সাহিত্যের বেশ ভাল ভাল বই-পুস্তক পঠিত হয় এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের এখানে আগমন ঘটে। এখানে তাদের বক্তৃতা হয়। একটি কথা আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আপনারা আপনাদের পূর্বসূরীদের ও উম্মাহর সেই সব লোক সম্পর্কে, যারা স্ব স্ব গণ্ডিতে দ্বীনের জন্য, মিল্লাতের জন্য কাজ করে গেছেন, কু-ধারণা পোষণ করবেন না। এটা খুব বিপদের কথা, আশংকার কথা। এ ব্যাপারটা আমাদের সেসব ভাইয়ের ভেতর খুব বেশি দেখা দিচ্ছে, অধ্যয়নের ওপর যারা একান্তভাবেই নির্ভরশীল। সমালোচনামূলক বই-পুস্তক ও নিবন্ধ পড়তে গিয়ে তাদের মনে হয় কেউ ইসলামের ওপর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ কোন কাজই করেনি। ঐ সব বই-পুস্তক ও নিবন্ধের প্রভাবে তারা দ্বীনী খেদমত পরিমাপ করবার জন্য একটা ফিতা বানিয়ে নেন যেই ফিতার সাহায্যে তারা প্রত্যেক সংস্কারক তথা মুজাদ্দিদকে মেপে থাকেন, যেমনটি সামরিক বিভাগে ভর্তির জন্য রিক্রুটদেরকে মাপা হয়। এটা ঠিক নয়।

আপনাদের জানা নেই ঐসব আল্লাহর বান্দা কী কঠিন অবস্থার ভেতর কাজ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলছি, যদি কেউ বলেন, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র.) যিনি পীরানে পীর ও বড় পীর সাহেব নামে বিখ্যাত, ইসলামী হুকমাত কায়েম করতে পারেন নি, বসে বসে কেবল ওয়ায করতেন। আব্বাসী খলীফারা ইসলামী নিজাম তথা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে অকেজো ও নিস্ক্রিয় করে রেখেছিল, তারা অন্যায়ভাবে খেলাফত দখল করে রেখেছিল যখন খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়া কায়েম ছিল না, সে সময় শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর জন্য কোন চেষ্টা করেন নি কেন?

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের জানা নেই আল্লাহর এই সিংহ কি কাজ করেছেন। আজ পর্যন্ত আফ্রিকা তাঁর কাছে ঋণী এজন্য, সেখানে ইসলাম তাঁর সূত্রে বিস্তার লাভ করেছে। ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষসহ আরও বহু দেশে তাঁর মাধ্যমে ইসলাম প্রবেশ করেছে এবং বিস্তার লাভ করেছে। কত মৃত ও শুষ্ক অন্তরকে তিনি সঞ্জীবিত করেছেন। আল্লাহ্ মালুম, কত লোককে তিনি কুফর ও শির্ক-এর অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন, এই সব আব্বাসী খলীফারা তো রসূলুল্লাহ (সা.)-রই খান্দানের লোক। এরা কুরআন শরীফ সেভাবেই বোঝে যেভাবে আমরা বুঝি। তারা বংশগতভাবে আরব হাশিমী খান্দানের। তাহলে ব্যাপারটা হলো এরা খিলাফতের হক আদায় করছে না। আসলে তাদের ওপর দুনিয়ার মুহব্বত, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা জেঁকে বসেছে। এরা নফসের গোলাম হয়ে গেছে। তাহলে বোঝা গেল সমস্ত রকম খারাবীর মূল নফসের গোলামী ও দুনিয়ার মুহব্বত আর তিনি এ রোগেরই চিকিৎসা করতেন, আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, আজ পাকিস্তানে খারাবীটা কি? এটা কি মুসলিম দেশ নয় এবং সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান কি মুসলমান নন? তারা ইসলামের নামে এদেশ বানিয়েছিল। এই তো কালই আমাকে পাকিস্তানের এক বন্ধু বললেন, আমার এক বন্ধুর ছেলে লায়ালপুরে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত এক মিছিলে শরীক ছিল। কেউ স্লোগান দেয়, পাকিস্তান কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তখন সে বলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। ঠিক এমনি মুহূর্তে একটি গুলি এসে তার বুকে লাগে এবং সে মরণের মুখে চলে পড়ে (জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময় সাধারণ নির্বাচনের পর এই ঘটনা ঘটেছিল)। এখন বলুন, তরুণটি কোন মুসলমানের হাতে গুলি খেয়েছিল নাকি কোন অমুসলিম অন্য কোন দেশ থেকে এসে তাকে গুলি করেছিল। এই যা কিছু হচ্ছে, কেন হচ্ছে? মুসলমান মুসলমানকে গুলি মারছে কেন? যদি আল্লাহর কোন বান্দা এই অন্যায়-অরাজকতার মূল কারণ হিসেবে দুনিয়াপ্রীতি ও নফ্স পূজাকেই মনে করে থাকেন তাহলে তিনি কি অন্যায়টা করলেন যে সারাটা জীবন আপনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকলেন?

ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সকলেরই অংশ রয়েছে, যারাই কোন না কোনভাবে এর খেদমতে অংশ নিয়েছেন : কোন কোন সময় যে কোন কারণেই হোক, এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়, ব্যস, একটাই কাজ। কেউ যদি ইসলামী হুকুমত কায়েমের সংগ্রামে না নামেন, এর জন্য চেষ্টা না করেন, তাহলে তিনি কোন কাজই করেন নি, তা তিনি হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানীই হন অথবা হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী কিংবা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীই (র.) হন। এ ধরনের ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ইতিহাস সম্পর্কে ভাসা ভাসা অধ্যয়নেরই ফসল। আমি পরিষ্কার বলছি, ইসলাম যে আজও দুনিয়ার বুকে বহাল

তবিয়তে টিকে আছে, তার নিরাপদ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, এতে সকলেরই অংশ রয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফুকাহায়ে ইজমা উম্মাহর বুযুর্গবৃন্দ, ওলীয়াল্লাহ সকলেই এতে অংশীদার।

যদি কেউ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) কি করেছেন, কি করতেন? নামায-রোযার মসলা বাতলিয়েছেন। তাঁর তো ইসলামী খিলাফত ও ইসলামী সালতানাত কায়েম করা দরকার ছিল। সালতানাত ভদ্রে! খিলাফত কায়েম হতো বটে, কিন্তু আপনাদের নামায পড়া কে শেখাতেন? আর সেই খিলাফত কোন্ কাজের যেই খিলাফতে কেউ নামাযের সহীহ্ তরীকা ও নিয়ম-নীতি জানে না?

আল্লাহ্ পাক বলেন, "সেই সব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ার বুকে কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" এ নয়, যাদেরকে আমরা নামায পড়তে শেখাব, তারা হুকুমত কায়েম করবে। তরতীব হলো, হুকুমত হবে এই উদ্দেশে যাতে করে সালাত কায়েমের পরিবেশ অনুকূল হয়, যাতে কেউ ওযর পেশের অবকাশ না পায়। আল্লাহ্ পাক বলেন, "যাতে ফেতনা না থাকে এবং দ্বীন সমগ্রটাই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" আপনাদের দিলে যেন এ ধারণা ঠাঁই না পায়! সকলেই অসম্পূর্ণ। ইসলাম কেউই বোঝেনি। কেউই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম করার চেষ্টা করেনি। মনে রাখবেন সকলেই তার যথাসম্ভব, সাধ্যমত ও সামর্থ্য মুতাবিক দ্বীনের খেদমত ও তার হেফাযতে নিয়োজিত ছিলেন। কেউ ওয়ায করেছেন, কেউ বক্তৃতা দিয়েছেন, কেউবা হাদীস পড়িয়েছেন, কেউ ফতওয়া প্রদান করেছেন, কেউ কিতাবাদি লিখেছেন। সকলেই তার নিজ নিজ জায়গায় ও স্ব স্ব আসনে ইসলামের খেদমত ও মুসলমানদের তরবিয়তের কাজ করেছেন এবং প্রত্যেকেই যে যার পৃথক সীমান্ত আগলে রেখেছেন, সামলে রেখেছেন।

সূফীয়ায়ে কিরামের অবদান

যেসব লোক নিজেদের জায়গায় বসে আল্লাহর নাম শিখিয়েছেন এবং মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাদের কাজকে অবজ্ঞা করবেন না। এ কাজ যারা করেছেন প্রচলিত ভাষায় তাদেরকে সূফিয়ায়ে কিরাম বলা হয়। আপনাদের জানা নেই সূফিয়ায়ে কিরাম কি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা ইসলামী সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে। তারা এমন বুনিয়াদী কাজ করেছেন তা যদি তারা না করতেন তাহলে বস্তুবাদের এই সয়লাব লোকদেরকে খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেত এবং টোপা ফেনার মত মুসলিম উম্মাহ ভাসত। তাদেরই জন্য লোকের স্থিতি ঘটেছিল

এবং খেয়াল-খুশি ও নফস পূজার বাজার গরম হতে পারত না। আর কেউ যদি এর শিকার হয়েও যেত অমনি তার ভেতর এই অনুভূতিও সৃষ্টি হয়ে যেত, আমি ভুল করছি, অন্যায় কাজ করছি। এরপর সে তাদের কাছে যেত, কাঁদত, তওবা-ইস্তিগফার করত অর্থাৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইত। অতঃপর এই সব সূফিয়ায়ে কিরাম তাদের কাজের মানুষ বানাতেন এবং আপন জায়গায় বসিয়ে দিতেন। আমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। আমি তারীখে দাওয়াত ও আযীমত (অনুবাদক কর্তৃক মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" নামে অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই এক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বাকি খণ্ড প্রকাশের পথে) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছি, দোষ ইতিহাস লেখার, ইসলামের ইতিহাসের নয়। ইতিহাস যা লিখিত হয়েছে তা রাজা-রাজাদের দরবার আশ্রিত; সম্রাট ও রাজা-বাদশাহদের দরবারকে ঘিরেই তা আবর্তিত থেকেছে। ফলে এই ইতিহাসে সংস্কার আন্দোলনের পরিপূর্ণ পর্যালোচনা নেই। নইলে এতে কোন শূন্যতা নেই।

ইসলাম ও কুরআন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ধকারের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল না

একথা কখনওই মনে করবেন না, ইসলামকে এখনই কিছু লোক বুঝেছে, এর আগে কেউই পুরো ইসলাম বোঝেই নি। ইসলামের ওপর এ এক বিরাট ইলযাম, অপবাদ। ইসলামের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের ওপর বিরাট বড় কলংক। এ দ্বারা কুরআন শরীফের যিন্দেগী এবং এর সুস্পষ্ট ও উপলব্ধিযোগ্য অনুধাবনযোগ্য হওয়াটাই সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে থাকে। সুস্পষ্ট আরবী কিতাব, সুস্পষ্ট আরবী ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে। এছাড়া যেই কিতাবটি হাজার বারো শ' বছর পর্যন্ত বোঝা যায়নি, বোঝা গেল না, এখন কি নিশ্চয়তা আছে তা যথাযথ ও সহীহ শুদ্ধভাবে বোঝা গেছে? এজন্য আমি এমন সব লেখাকে ক্ষতিকর মনে করি যা মানুষকে এই ধারণা দেয়, হাজার বারো শ' বছর যাবৎ ইসলাম বোঝা যায়নি কিংবা কিছু কিছু ইসলামী হাকীকত বা গূঢ় সত্য এ পর্যন্ত বিলকুল অন্ধকারে আছে। এ কথা মানতে আমি আদৌ প্রস্তুত নই। ইসলামের বুনিয়াদী উসূল বা মূলনীতি, কুরআনের হাকীকত ও দ্বীনের সত্যতা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। কেউ যদি মনে করেন বহুকাল যাবৎ তা বোঝা যায় নি তাহলে এটা তার দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি। একটি কথাও কেউ প্রমাণ করে দিক কুরআন করীমের এই হাকীকত মুসলিম বিশ্ব একেবারেই ভুলে গেছে, বিস্মৃত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.) তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, একটি সুন্নতও এমন নেই যা গোটা আলমে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে উঠে গেছে। যদি পৃথিবীর এই কোণে তা না থাকে তাহলে অন্য কোণে তা পাওয়া যাবে।

আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

সূর্য যেমন বাস্তবে অস্তমিত হয় না, এক স্থানে অস্ত গেলে অন্য জায়গায় তার উদয় ঘটে, ঠিক ইসলামের হাকীকতসমূহও তদ্রূপ। যদি এক স্থানে তা পর্দাবৃত হয় তো অন্য স্থানে তা দীপ্তভাবে প্রকাশিত হয় এবং এজন্য জীবনের বাজি ধরে। একথা যেন কখনও মনে না আসে, হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কেউ ইসলামকে পুরোপুরি বোঝেই নি। মনে হয় ইসলাম যেন কোন জটিল ও গুপ্ত বিষয় বা কোড বাক্য! ত্রিত্ববাদের মত এমন কোন বিষয় যা বোঝানোর জন্য বিজ্ঞ বড় দার্শনিক দরকার। না, এমন নয়। এও হতে পারে, আপনাদের সঙ্গে আমার আর পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটবে না। তাই আপনাদের খেদমতে আমি এই কথাগুলো পেশ করছি। কারুর ওপর হামলা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল এজন্য কথাগুলো পেশ করছি যাতে গোটা বিষয়টা খোলাখুলি আপনাদের সামনে এসে যায়। একটা কথা, পূর্বসূরী বুযুর্গদের প্রতি সুধারণা রাখুন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। কুরআন শরীফে আছে ঃ

والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلاللذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم -

"আর (তাদের জন্যও) যারা ওদের (মুহাজির ও আনসারদের) পর এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও ঈমানী অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

[সূরা হাশর ঃ ১০ আয়াত]

আপনারা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করুন। এর ভেতর ঈমানের বড় হেফাযত রয়েছে। নইলে মানুষের জবান বড় বেয়াড়া ও লাগামহীন হয়ে যায়; যা খুশি বলে ফেলে। ভাইসব! তারা কি দ্বীন বোঝেনি যারা আমাদের থেকে আমলে, ইলমে ও নৈকট্যে কত বড় ছিলেন? তারাই যখন দ্বীন বোঝেন নি তখন আমরা কি করে বিশ্বাস করি, আশ্বস্ত হই যে আমরা বুঝে ফেলেছি?

সালাতের ইহতিমাম

আরেকটা কথা এই, এদেশে ঈমানের হেফাযতের সূরত হলো আপনাদের হাত থেকে নামায যেন ছুটে না যেতে পারে। সময় মত নামায আদায় করতে চেষ্টা করুন। হযরত ওমর (রা.) সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রেরিত একটি সরকারী

পত্রে লিখেছিলেন ঃ তোমাদের সকল কাজে ও যাবতীয় ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো নামায। যে এ ব্যাপারে যত্নবান হলো এবং একে হেফাযত করল সে সব কিছুই হেফাযত করবে। আর যে এ ব্যাপারে উদাসীন রইল এবং একে নষ্ট করল সে কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। অতএব, নামায আদায়ে যত্নবান হোন, চাই কি আপনি বাজারেই থাকুন অথবা অন্য কোথাও, ফরযটা আদায় করবেনই। বাকি সুন্নতগুলো যতদূর সম্ভব আদায় করতে চেষ্টা করুন। এই সুন্নত ও নফলগুলো ফরযগুলোকে হেফাযত করে।

শেষ কথা হলো এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির হাত থেকে, যা শীর্ষ বিন্দুতে গিয়ে উপনীত হয়েছে, নিজেদেরকে হেফাযত করুন। কিছু কিছু বিষয়ে আমি এখানে খুবই অলসতা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করেছি। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এখানে নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেলা খুবই বেড়ে গেছে। সাধ্যমত নারী-পুরুষের মিলিত সমাবেশ ও মজলিসগুলো থেকে বাঁচতে চেষ্টা করুন। এমন কোন মজলিস যেখানে মেয়েরাও অংশ নেবে এবং সেখানে আপনার অংশ গ্রহণও জরুরী সেক্ষেত্রে তাদের অধিবেশন পৃথক রাখুন, এমন কি তাদের গমনাগমনের পথও ভিন্ন রাখুন। এর ভেতর আপনার হেফাযত রয়েছে। মুসলিম সমাজ বিরাট হেকমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হাদীসে পাকে নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেশা ও নির্জনে অবস্থান সম্পর্কে খুবই কঠিন বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আমেরিকার সভ্যতার এই সব আসর আপনারা গ্রহণ করবেন না। যতটা পারেন ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইসলামী সমাজের হেফাযত করুন এবং এর উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো, এর ভাল দিকগুলো টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করুন।

পরিশেষে আমি আপনাদের খেদমতে আরয করব, আল্লাহ্ করুন, আমার আলোচনা থেকে আপনারা যেন ভুল না বোঝেন এবং এও যেন মনে করবেন না আমি কোন আক্রমণাত্মক ও নেতিবাচক (ণের্গেধশশ) কথা বলেছি। আমি যা কিছু বলেছি আপনাদের প্রতি সহানুভূতিবশত বলেছি এবং নিজের দায়িত্ব মনে করে বলেছি। আমার দিলে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে এবং ঔদার্যের ক্ষেত্রে আমার কিছুটা বদনামও রয়েছে। আল্লাহর ফযলে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে এবং আমি সকলকেই সম্মান করি। কিন্তু তারপরও আমি আমার নৈতিক দায়িত্ব মনে করে আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা বলেছি। ইনশাআল্লাহ্ শক্তি-সামর্থ্য মুতাবিক আমি আপনাদের জন্য দোয়া করতে থাকব আর আপনাদের কাছেও আমার একইরূপ প্রত্যাশা।

উলামায়ে কেরাম : মর্যাদা ও দায়িত্ব

[১৯৮২ সালে হায়দারাবাদে প্রদত্ত একটি ভাষণ। সেখানকার প্রখ্যাত আইনজীবী জামীলুদ্দীন সাহেবের বাসস্থানে আয়োজিত এক মাহফিলে বিপুল সংখ্যক উলামায়ে-কেরাম ও মাদ্রাসা পরিচালকদের উদ্দেশে প্রদত্ত এই ভাষণে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে উলামায়ে কিরামের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি।]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط -

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায় সাক্ষ্য দাও।' [সূরা মাইদাঃ ৮]

সম্মানিত উলামায়ে কেরামের এই মহতী মাহফিলে কোন কথা আরম্ভ করা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। বিজ্ঞজনদের একটি কথা আছে, 'যেমন পাত্র তেমন কথা।' সে হিসেবে আমিও চেষ্টা করব আজকের এই মওকা মাফিক-অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কিছু কথা উপস্থাপন করতে।

অনেকে তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেও অনেক বড় বড় ফলাফল বের করেন। দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি ঘটনা মন্থন করে আবিষ্কার করেন অনেক বড় বড় শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সাদী (র.)-এর কোন জুড়ি নেই। অবশ্য উপমা স্থাপন ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাওলানা রুমীকেও অদ্বিতীয় বলতে হবে। তাঁরা ছোট ছোট ঘটনা থেকে গভীরতম শিক্ষা সন্দেশ তুলে আনতেন। আমিও আমার অনুভব, অনুভূতি ও স্বীয় শিক্ষা থেকে একটি কথা বলতে চাই! আপনারা জানেন, আমি দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে এসেছি। আমি যে গাড়িতে করে এসেছি সে গাড়ি কত দিক মুখ করে চলেছে, চলার পথে কত এলাকা পার করে এসেছে তাতো কেবল আল্লাহ মালুম। কিন্তু 'কম্পাস' রীতিমতই আমাকে কিবলা বলে দিয়েছে। গাড়ির দিক পরিবর্তন, আবহাওয়ার বিবর্তন কোন অবস্থারই সে তোয়াক্কা করেনি। গাড়ির গতি বদল, দিকের পরিবর্তন আর পরিবেশের বৈচিত্র্য সর্বাবস্থায়ই সে আমাকে যথা কিবলা নির্দেশ করে গেছে। এসবের পরিবর্তন বিবর্তন দ্বারা সে মোটেই প্রভাবিত হয়নি।

আমি যখন ভাবলাম, বিষয়টি আমাকে খুব আলোড়িত করল। আমার খানিকটা লোভও হলো, একটি মানবনির্মিত জড় পদার্থ এতটা বিশস্ত নির্দেশক অথচ আমরা!

আমার মনে হলো, একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র অথচ অবস্থার শত উত্থান-পতনেও সে তার দায়িত্ব পালনে অবিচল। সে তার নীতি ও আদর্শে এতটা অনড় যে, গাড়ি কোন্ দিকে যাচ্ছে সেদিকে তার মোটেও লক্ষ্য নেই। এমনি মানুষ (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি) সেও এদিক মুখ ফেরাচ্ছে। কিন্তু 'কম্পাস' তার অবস্থানে অবিচল। সদা স্থির স্বীয় দায়িত্ব পালনে। সে এক মুহূর্তের জন্যে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। একটি বারের জন্যেও ভুল দিক নির্দেশনা দিচ্ছে না। আর তার নির্দেশনা মত আমরা নামায পড়ছি। একটি কম্পাসের এই স্থিরতা ও বিশ্বস্ততা আমার মর্যাদাবোধে দারুণভাবে আঘাত করেছে। আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। সাথে সাথে আমার ভেতরে এই শিক্ষাও জেগেছে, আচ্ছা, একটি কম্পাস! সেও তার পারিপার্শ্বিকতার পরোয়া করে না। সেও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায় না। সর্বদাই নিরলসভাবে কিবলা নির্দেশ করে যাচ্ছে। স্বীয় বাহককে দিক বাতলে যাচ্ছে। স্বীয় দায়িত্বে এক বিন্দু আগ-পর নেই; অবহেলা নেই। আর তখনই আমার মনে হলো, উলামায়ে কেরামকেও কম্পাসের মত হওয়া উচিত, তাদের হওয়া উচিত কম্পাসের মত অটল অবিচল দৃঢ়। অবস্থা যা-ই হোক, যুগের হাওয়া যে দিকেই চলুক, আলেমকে থাকতে হবে স্বীয় অবস্থানে অনড়-পাহাড়সম স্থির। যুগ ও সময় বাগে না আসলে, বাতাস কেবল উল্টো বইলে নিজেকে যুগের মত করে সাজাবার, নিজেকে বাতাসের সরল স্রোতে ভাসিয়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই বরং যুগ ও সময়কে বাগে আনতে চেষ্টা করতে হবে, প্রয়োজনে চলতে হবে বাতাসের উল্টো দিকে। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

ভোঁতা দৃষ্টিসম্পন্নরা বলে, চল যেদিক বাতাস চলে
অথচ তোমার কর্তব্য হলো, যুগের হাওয়াকে অনুগত করা!

মূলত উলামায়ে কেরামের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত। কারণ এই উম্মাতের মধ্যে উলামায়ে কেরামের একটি ভিন্ন মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলা একটি স্বতন্ত্র কিবলাও দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তাকে সেই কিবলামুখী থাকতে হয়। অধিকন্তু নামাযে যেভাবে তাকে এক সুনির্দিষ্ট কিবলা পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফমুখী থাকতে হয় তেমনিভাবে তার সকল প্রয়োজন প্রত্যাশা, সৎ কর্ম ও সততা সকল ক্ষেত্রেই নিবিষ্ট থাকতে হয় প্রকৃত কিবলা মনিব মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি।

সন্দেহ নেই আজকের মহতী মাহফিল আমার জন্যেও এক বিরাট সুযোগ। এটা আমার জন্যে এক গনীমত। এই গনীমতকে আমি নষ্ট হতে দিতে চাই না। তাই এই মহান সুযোগে আমি আপনাদের খেদমতে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

এক. আকীদা ও ইসলামের আদর্শগত সীমারেখা। এক্ষেত্রে হযরত উলামায়ে কেরামকে হতে হবে সম্পূর্ণ কম্পাসের মত। বিশ্বাস ও আদর্শের ক্ষেত্রে তাকে হতে হবে সদা অবিচল ও দৃঢ়চেতা এক বিশ্বস্ত রাহবর। এ ক্ষেত্রে যত বড় ব্যক্তিই তার সামনে আসুন তাকে তোয়াক্কা করার সুযোগ নেই। বোঝা-পড়া করার অবকাশ নেই। তাঁর কর্তব্য যথার্থ কিবলা বলে দেয়া। শাশ্বত সত্য, বিশ্বাস ও আদর্শের নির্দেশনাই তার অলংঘনীয় কর্তব্য। এক হলো হিকমত ও কৌশল, আরেক হলো ছাড়াছাড়ি ও আপোস-রফা। দু'টো এক নয়। একজন মানুষ কৌশলের সাথে সত্য কথা বলতে পারে। কিন্তু তাই বলে আপোস করার সত্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই আর হিকমতের কথাতো স্বয়ং আল্লাহ-ই বলেছেন ঃ

'ডাকো আল্লাহর পথে কৌশলপূর্ণ ও সুন্দরতম কথার মাধ্যমে।'

পক্ষান্তরে আপোস ও ছাড়াছাড়ির ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারি!

ودالوتدهن فيدهن -

"তারা চায়, আপনি যদি ছাড় দেন তাহলে তারাও ছাড় দেবে।" (কলম ঃ ৯) বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে পরিষ্কার আদেশ দিয়েছেন ঃ

"আপনাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে আপনি তার অকুণ্ঠ ঘোষণা দিন এবং মুশরিকদের প্রতি কানও দেবেন না।" অর্থাৎ এটা ইসলাম ও শির্কের সামান্ত বিষয়। এখানে আপোস-রফার কোন সুযোগ নেই। মুশরিকদের কথার প্রতি কর্ণপাত করার কোন অবকাশ নেই। নম্রতা, বিনয় আর উদারতা ভিন্ন বিষয়। তাওহীদ- আল্লাহ'র একত্ববাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ এবং ইসলামের স্পষ্ট আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে পরিষ্কার আদেশ হলো, শরীয়ত যা বলেছে তাই উচ্চারণ করে যেতে হবে নিঃশংক চিত্তে। এজন্যেই আয়াতের শেষাংশে আর 'মুশরিকদের প্রতি কানও দেবেন না' বলে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তোলাই আয়াতের লক্ষ্য। সুতরাং হকপন্থী উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হলো–তাওহীদ রিসালাত ইত্যাকার শরীয়ত নির্ধারিত বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার কথা বলা যেখানে কোন দ্বিধা থাকবে না, জড়তা থাকবে না। তবে বলতে হবে কৌশলের সাথে। কবি গালিবের ভাষায় যেন এমন না হয়– 'মন্দভাবে বলে ভাল।'

অর্থাৎ যা বলে তা ভাল বলে। কিন্তু বলার ধরন খুবই মন্দ-অসুন্দর। বর্ণনা ও উপস্থপনার এই অসুন্দর অনেক অনিষ্টতা বয়ে আনে। অনেক ক্ষেত্রে মহাবিবাদ খাড়া হয়ে যায়। তাই যাতে কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় সেজন্যে সংযত ভাষা-বিধৌত আচরণের মাধ্যমেই তাঁকে এগুতে হবে অত্যন্ত ধীর ও দৃঢ়ভাবে। উলামায়ে কেরামের কৌশলপূর্ণ এই গতি ও চিন্তার ফলাফল হিসেবেই অদ্যাবধি

আমরা ইসলামকে দিনের সূর্যের মত পরিষ্কার আলোকিত অবস্থায় পেয়েছি যেখানে আলো-আঁধারের মিশ্রণ নেই, দুধ ও পানির অস্পষ্টতা নেই।

যে ব্যক্তি ধ্বংস হতে চায় তার ধ্বংসে হবার সুযোগ বিপুল। পুরো উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে ধ্বংসের নোনা সাগরে। কিন্তু তাই বলে সে ইসলামের ধারক-বাহকদেরকে সেজন্যে দোষারোপ করতে পারবে না। মুসলিম উম্মাহর বিশাল ইতিহাসের প্রতি যদি গভীরভাবে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, তাদের ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসরে এমন একটি বছর নেই যাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর শিকার হয়েছে ; বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো বিচ্ছিন্ন-ই। এ মর্মে হযরত রাসূল (সা.) ও বলেছেন ঃ আমার উম্মাত একই সাথে কখনো ভ্রান্তির শিকার হবে না।

অথচ আমরা যদি ইহুদী জাতির প্রতি তাকাই তাহলে দেখব ইহুদী জাতি তার সূচনাকালেই বিকৃতির শিকার হয়েছে। আর খ্রীস্ট ধর্মতো তার শৈশবেই এক বিভ্রান্তির মোড়কে বাঁধা পড়ে। অতঃপর বছরের পর বছর ধরে সেভাবেই এগুতে থাকে। তাই পবিত্র কোরআনে তাদরকে 'দাল্লীন' উদ্‌ভ্রান্ত বলা হয়েছে।

কিন্তু ইসলামের বেলায় এমন কিছুই ঘটেনি। সব ধরনের ধাঁধা, বিপর্যয়, বিভ্রান্তি ও বিকৃতি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এই দ্বীন। আজ অবধি তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য, সুন্নত ও বিদআতের ব্যবধান, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য, ইসলামী সভ্যতা ও জীবনবোধ এবং অনৈসলামী সভ্যতা ও জীবনবোধের ভিন্নতা একেবারে স্পষ্ট। হ্যাঁ, কোন দেশ বা জাতি বিশেষ কোন সময় বিশেষ কোন কারণে যদি কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হয় সেটা ভিন্ন কথা। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও উলামায়ে কেরাম সতর্ক থাকেন এবং তার সংশোধনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সত্যের পতাকাবাহী হয়ে যাও।" 'আল্লাহর ফৌজ' কথাটা আমাদের ভাষায় একটি বিদ্রূপাত্মক শব্দ হলেও আয়াতে ব্যবহৃত (কাওয়ামিনা লিল্লাহ) বাক্যটির পরিভাষাগত অর্থ কিন্তু আল্লাহ্র ফৌজের মতই হয়। এখানে আল্লাহ্র ফৌজের সত্যের পতাকাবাহীদের বিশদ মর্যাদাই বিধৃত হয়েছে অর্থাৎ যারা আল্লাহর ফৌজ, যারা সত্যের পতাকাবাহী তারা সদা স্বীয় দায়িত্ব পালনে থাকে অতন্দ্র প্রহরীর মত জাগ্রত-সচেতন। কেউ জিজ্ঞেস করুক আর না-ই করুক, কেউ ডাকুক আর না-ই ডাকুক, তারা তাদের কর্তব্য আদায়ে কুণ্ঠিত হয় না, দ্বিধান্বিত হয় না। এখানে যদিও সমগ্র মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করেই কথাটি বলা হয়েছে, তবুও এখানে উলামায়ে কেরামের গুরুত্ব বেশী। কারণ তাঁরা উম্মতের বিশেষ শ্রেণী।

তাই যদি সাধারণ উম্মতকে পতাকাবাহী হিসেবে জবাবদিহি করতে হয় তাহলে উলামায়ে কেরামকে জবাবদিহি করতে হবে বিশ্বময় মুসলিম সমাজ সম্পর্কে। মুসলিম সমাজ কোথায় কিভাবে স্খলিত হচ্ছে, বিচ্যুত হচ্ছে, তার পূর্ণ খোঁজ খবর নেয়ার দায়িত্ব, তাদেরকে সতর্ক ও সংশোধন করার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের।

উলামায়ে কেরামের আরেকটি বড় দায়িত্ব হলো, মুসলমানদের জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখা। জনবিচ্ছিন্ন অবস্থা উলামায়ে কেরামের জন্য নয়। কারণ জনগণ যখন উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তখন তারা কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়বে। কল্পনা বিলাসিতার স্রোত তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দ্বীন থেকে অনেক দূরে। অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তখন বিক্ষিপ্ত-পতিত জীবন যাপনে। দ্বীনের আহ্বান তখন আর সাড়া জাগাতে পারবে না তাদের অন্তরে। দ্বীনী দাওয়াত ও সমাজ সংস্কার দায়িত্ব আদায় হয়ে পড়বে তখন অসম্ভব। শুধু তাই নয়, বরং তারা ইসলাম ও ইসলামী জীবনবোধের প্রতি হয়ে পড়বে বীতশ্রদ্ধ। তখন ইসলামের পতাকাবাহীদের জন্যে এই দেশে অবস্থান করা হয়ে পড়বে ভীষণ মুশকিল। স্বগৃহে নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য হবেন তখন সম্মানিত উলামায়ে কেরাম।

ইতিহাস তো আমাদেরকে এ কথাই বলে, যে দেশে উলামায়ে কেরাম সব কিছুই করেছেন, কিন্তু স্বীয় সম্প্রদায়কে তাদের জীবন চিন্তা সম্পর্কে সচেতন করেন নি, মুসলমানদেরকে তাদের আত্মপরিচয় ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলেন নি; আদর্শ উপমায় নাগরিক জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দেননি, নিজেদেরকে জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে সচেষ্ট হননি, সে দেশ ও জাতি তাদেরকে মূল্যায়ন করেনি, বুকে ধরে রাখেনি, বরং ভক্ষিত বমনীয় গ্রাসের মতোই উদ্গিরণ করে ফেলেছে। কারণ তারা নিজেরা নিজেদের আসন তৈরি করেন নি। আজ আপনারা আপনাদের চারপাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখুন। আজ আপনাদের দেশ ও জাতি বাস্তবমুখী বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের খুবই মুহতাজ।

আপনারা যদি আপনাদের দেশের সকল মুসলমানকে তাহাজ্জুদ আদায়কারী বানিয়ে ফেলেন, সকলকেই আল্লাহভীরু পরহেজগারে রূপান্তরিত করে ফেলেন আর তাদেরকে তাদের চারপাশ সম্পর্কে সচেতন না করেন, তারা যদি তাদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই না জানে, দেশ ডুবছে, অসভ্যতা, অপসংস্কৃতি দেশকে গ্রাস করে ফেলছে, দেশ জুড়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের তুফান বইছে, অথচ তারা কিছুই জানে না, তাহলে তাহাজ্জুদতো পরের কথা, তারা তো এক সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়তে পারবে না। কারণ ভয়ংকর

এই সমাজ ও পরিবেশে তাদের কোন স্থান নেই। কারণ আপনারা তাদেরকে তাদের অবস্থান সৃষ্টির কথা বলেন নি। তাদের বরফায়িত ধমনীতে চেতনার আগুন জ্বালতে পারেন নি।

সুতরাং আপনাদেরকে ভাবতেই হবে। সাধারণ মুসলমানদের জীবন ও ভবিষ্যত নির্মাণের কথা। তাদেরকে আদর্শ নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। কারণ তারাই তো দেশকে ভয়াল ভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে। প্রয়োজনে জীবন কুরবান করে দেবে। তারা যদি সচেতন না হয় তাহলে তো ইবাদত, বন্দেগী, দ্বীনী প্রতীকী কর্মকাণ্ড অনেক দূরের কথা, মসজিদ সংরক্ষণই তো হয়ে পড়বে ভারি মুশকিল। মুসলমানরা তো তখন স্বদেশে বিদেশী হয়ে পড়বে। স্বদেশী জীবন সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ, সমকালীন আন্দোলন ও রাজনীতি সম্পর্কে বে-খবর, রাষ্ট্রীয় আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে অন্ধ জাতি দ্বারা তো নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং এমন জাতি তাদের অস্তিত্বও ধরে রাখতে পারে না। নেতৃত্ব সেতো অনেক ওপরের কথা।

মিসর বিজেতা সাহাবী হযরত ইবনুল আস (রা.) যখন মিসর জয় করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলাই হয়তো তাঁর হৃদয়ে বিশ্বাসের এ কথার উদ্রেক করেছিলেন, মিসর শত বছর নয়, বরং হাজার হাজার বছর ইসলামকে বুকে ধরে রাখবে। মিসর ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিজাব থেকে খুব দূরে ছিল না। রোমীয় শাসনদণ্ডও তখন ভেঙ্গে গেছে। কিবতী খৃষ্টীয় শাসন ব্যবস্থাও বেদখল হয়ে পড়েছে। দেশ এখন কেবল মুসলমানদের–মুসলমান আরবদের, অথচ এই মুহূর্তে হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.) মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলছেন ঃ

মনে রেখ! তোমরা সর্বক্ষণই শত্রুর মুখোমুখী–সীমান্ত প্রহরীর মত। তাই তোমাদেরকে সর্বদাই অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ সচেতন থাকতে হবে। গাফলতি আর আলসেমির কোন সুযোগ নেই। অজ্ঞতা আর অজ্ঞতার ভান করারও কোন অবকাশ নেই।

আমাদের দেশের সার্বিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এখন। প্রতিবেশী দেশ ও পরিস্থিতি আমাদের দেশকে রীতিমত নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরাশক্তিকেও উপেক্ষা করার উপায় এদেশের নেই। দেশে অজস্র চিন্তা-দর্শন সক্রিয়। শত সংস্কৃতির বিপ্লব চলছে। সভ্যতা-বিধ্বংসী শত আন্দোলন চলছে। শিক্ষানীতির রীতিমত পরিবর্তন হচ্ছে। মাঝে মধ্যে তো আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল চিন্তার ওপরও আঘাত করছে। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান ও ভাষাও নতুন সমস্যা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রয়োজন আমাদের অবস্থার গভীর পর্যালোচনা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা করা উচিত এবং সেজন্য উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

মুসলমানদেরকে বলতে হবে, দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদেরকে অনেক কিছু করার আছে। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নমুনা পেশ করতে পার তাহলে ভবিষ্যতে তোমাদেরকে অনেক বড় দায়িত্বের অধিকারী করা হবে- প্রতিষ্ঠিত করা হবে নেতৃত্বের আসনে।

হযরত ইউসুফ (আ.) লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বীয় যোগ্যতা, মানবতার প্রতি অপরিসীম কল্যাণকামিতা, বন্ধুত্ব ও ইনসাফের স্বাক্ষর না রাখতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দ্বীনও প্রচার পাবে না, তাঁর ধর্ম- দর্শনও সে দেশে কোন মর্যাদার আসন পাবে না, বরং এর জন্যে প্রয়োজন স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর ও তাঁর প্রতি আল্লাহর বান্দাদের নিঃশর্ত আকর্ষণ। তবেই এ দেশে হবে আল্লাহর নাম নেয়া সম্ভব। তাঁর মহিমাময় নামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। অবশেষে হয়েছেও তাই। সুতরাং আজ আমরা যারা মুসলমান তাদেরকে স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে দেশ চলতে অক্ষম। আমাদের কাঁধে ভর না করে দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারবে না, বরং আমরা না থাকলে এই দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, আমরা যদি আমাদের চারপাশে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, উষ্ণ-শীতল কোন আবহাওয়াই যদি আমাদেরকে স্পর্শ না করে, বরং আমরা যদি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (ইধর-ডমভঢর্ধধমভ) ঘরে অবস্থান করতে থাকি যেখানে গরমের জ্বালা নেই, ঠাণ্ডার আগ্রাসন নেই, তাহলে সেটা হবে নিজেদের প্রতি চরম অবিচার। আর আমাদের ধর্মের প্রতিও হবে বিনাশী অত্যাচার। তাছাড়া রাষ্ট্রের একটা অংশ তো আর আরেকটা অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, বরং মিশে থাকতে হবে। তবে আমি অন্যের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা বলছি না। সেটা বলবই বা কেন? সব কিছুরই একটা সীমারেখা আছে। তাই উলামায়ে কেরামকে অন্যদের সাথে থাকতে হবে দাওয়াত ও যিকিরের সাথে। সর্বাবস্থায় স্বীয় পয়গাম তুলে ধরতে হবে জাতির সামনে। স্বীয় চাল-চলন, সব কিছুতেই থাকতে হবে নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির সবুজ আঁচড়। কোন অবস্থাতেই স্বীয় সভ্যতার স্বতন্ত্র বোধকে পরিহার করা যাবে না- জলাঞ্জলি দেয়া যাবে না।

আমার পরামর্শ হলো, আপনারা জীবনধারা থেকে আলাদা হবেন না। কারণ কেউ যদি স্বীয় সমাজ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে তাহলে সে সমাজ থেকে দূরে সরে

পড়ে। জীবন্ত মানবগোষ্ঠীতে তার আর কোন স্থান থাকে না। আর আমি ইসলামকে এতটা সংকীর্ণ মনে করি না, সমাজ জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও চাহিদার দিকে তাকাতে গেলে ইসলাম ছুটে যাবে, বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে, দুর্বল হয়ে পড়বে। আমাদের পূর্বসূরিগণতো রাজত্ব করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, অথচ তাঁদের তাহাজ্জুদ ছোটেনি। একটি সাধারণ সুন্নাহও হাতছাড়া হয়নি। আমাদের আদর্শ তো তাঁরাই।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইরাকের গভর্নর ছিলেন। মাদায়েনের রাজধানীতে থাকতেন। খানা খেতে বসেছেন। দস্তরখানা থেকে সামান্য একটু খাবার মাটিতে পড়ে গেছে। গভর্নর সালমান ফারসী (রাঃ) স্বহস্তে তুলে পরিষ্কার করে খেতে লাগলেন। উপস্থিত একজন বললঃ আপনি গভর্নর হয়ে এই কাজ করলেন? তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ আমি তোমাদের মত বেকুবদের কথায় আমার প্রিয়তম নবীজীর সুন্নত ছেড়ে দেব? এটা ঠিক নয়, আগুন আসলে পানি থাকবে না আর পানি আসলে আগুন থাকবে না। এটা ভুল ধারণা। আপনি ইচ্ছা করলে পূর্ণ সততা, নিষ্ঠা, আদর্শ, তাকওয়া ও দ্বীনদারী রক্ষা করেও একজন পরিপূর্ণ সফল নাগরিক হতে পারেন।

আজ বিশ্ব জুড়ে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর অবস্থাও অনুরূপ। আরব দেশগুলো পর্যন্ত এখন ইউরোপীয় তপ্ত বাষ্পে পুড়ছে। আমেরিকা থেকে উদ্ভূত-প্রসবিত নতুন নতুন ফিৎনা গ্রাস করে চলছে দেশের পর দেশ। ইসলাম ও কুফুরীর লড়াই সর্বত্র। সময়ের আধুনিক পাহাড় পাহাড় সমস্যা থেকে চোখ বুজে থাকার তো কোন উপায় নেই।

তাই উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হলো, শরীয়তের প্রত্যয়পূর্ণ আকীদা, বিশ্বাস, স্পষ্ট বিধানাবলী সম্পর্কে পাহাড়ের মত অবিচল আর লোহার মত কঠিন থাকা পক্ষান্তরে সমাজের আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধান ও যুগের সার্বিক চাহিদা পূরণে পূর্ণ বিচক্ষণতা, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসা। আমরা যদি এই দুটি দিক সমানে উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে আমরা ক্ষমতার মসনদে উঠে যাব এমনিট নয়, বরং আমি বলি, এই দুটি দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে সচেষ্ট হলে নেতৃত্ব নিজে ছুটে আসবে আমাদের কাছে।

মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও নাগরিক চেতনা সৃষ্টি করা একান্ত অপরিহার্য বিষয়। মুসলমানরা যে মহল্লায় থাকবে তাদের আচরণ চাল-চলন দেখেই যেন মনে হয় এটা মুসলমানদের মহল্লা। মুসলমানদের মধ্যে অবিনাশী চিরজাগ্রত

এই চেতনা সৃষ্টি উলামায়ে কেরামেরই দায়িত্ব। তাঁরা যদি তাঁদের এ দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে সচেষ্ট হন তাহলে সত্যিই তাঁরা এক আলোকিত ভবিষ্যত নির্মাণে সক্ষম হবেন- ইনশাআল্লাহ্!

আমার পরিচয়

আহ্নাফ ইবনে কায়েস একজন শীর্ষস্থানীয় আরব সরদার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তী রয়েছে, "আহ্নাফ গর্জে উঠলে এক লাখ তরবারি গর্জে ওঠে।" রাসূলুল্লাহর (সা.) সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে না পারলেও তাঁর সাক্ষাতধন্যদের সাক্ষাত লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন এবং তাঁদের সংস্রবে থেকেছেন, বিশেষ করে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন।

একদিন জনৈক ক্বারী তাঁর সামনে এই আয়াত পাঠ করল ঃ

لقد انزلنا اليكم كتبا فيه ذكركم ط افلاتعقلون -

"আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি এমন কিতাব যাতে তোমাদের আলোচনা বিবৃত হয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" [সূরা আম্বিয়া ঃ ১০]

আহ্নাফ ইবনে কায়েসের মাতৃভাষা ছিল আরবী। কাজেই আয়াত শুনে চমকে উঠলেন যেন নতুন কথা শুনলেন! বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে লাগলেন, আমাদের আলোচনা? কুরআনখানা নিয়ে এসো তো; দেখ আমার কি আলোচনা এতে বিবৃত হয়েছে এবং আমি কোন্ শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

পবিত্র কুরআন শরীফ তাঁর সম্মুখে আনীত হলো। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের আলোচনা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। একশ্রেণীর লোকের পরিচয় নিম্নোক্ত শব্দাবলীতে এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

كانوا قليلا من اليل ما يهجعون - وبالا سحارهم يستغفرون - وفى اموالهم حق للسايل والمحروم -

"তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ততা ও বঞ্চিতদের হক।" [সূরা যারিয়াত ঃ ১৭-১৮-১৯]

তারপর কিছু সংখ্যক লোকের আলোচনা আসল যাদের অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

تتجا فى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاو

طمعاو ممار زقنهم ينفقون ـ

"তাদের পার্শ্বশয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।" [সূরা সিজদা ঃ ১৬]

পুনরায় কিছু সংখ্যক লোকের আলোচনা।

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ـ

"তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।" [আল ফুরকান ঃ ৬৪]

আবার এক কাফেলা তার চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করল যাদের অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

الذين ينفقون فى السراء والضراء والكلظمين
الغيظ والعافين عن الناس ط والله يحب المحسنين ـ

"তারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং তারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎ কর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।"

[সূরা আল ইমরান ঃ ১৩৪]

এখনো তিনি অপলক নেত্রে অবলোকনই করছিলেন। একদল যুবক তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। যাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

والذين تبوؤ الدار والايمان من قبلهم يحبون من
هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما او توا
ويؤثرون على انفسهم ولو كانو بهم خصاصة ط ومن
يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ـ

"এবং তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদেরকে তাদের ওপর অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের সংকীর্ণতা ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" [সূরা হাশর ঃ ৯]

ক্রমাগত তিনি সামনেই এগুচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে ভিন্ন এক চিত্র তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল।

ياتوك بكل سحار عليم - فجمع السحرة لميقات يوم معلوم -

"যারা বড় বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে; যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" [সূরা শুরা ঃ ৩৭-৩৮]

হযরত আহ্নাফ নিজেকে ভাল করেই চিনতেন। বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমি বর্ণিত শ্রেণীগুলোর কোনটিতেই দেখছি না।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে অগ্রসর হলেন। এ পথে বিচিত্র ধরনের মানুষ তাঁর দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। এ দলের সাক্ষাত পেলেন যাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

انهم كانوا اذاقيل لهم لا اله الا الله لا يستكبرون لا ويقولون ائنا لتاركوا الهتن الشاعرمجنون -

"তাদের নিকট "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই" বলা হলে তারা অহংকার করত এবং বলত, আমরা কি উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে বর্জন করব?" [সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৩৫-৩৬]

সামান্য অগ্রসর হয়ে কিছু লোকের সন্ধান পেলেন–

واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة ج واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون -

"যখন কেবল আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় আর যখন আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাদের উল্লেখ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" [সূরা যুমার ঃ ৪৫]

কিছু হতভাগা লোকের অবস্থাও তাঁর চোখে পড়ল যাদেরকে বলা হবে,

ماسلككم فى سقر -

"তোমাদের কিসে দোযখে নিক্ষেপ করল?" [সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪২]

তারা প্রতিউত্তরে বলবে–

ولم نك نطعم المسكين ـ وكنا نخوض مع الخائضين ـ وكنا نكذب بيوم الدين ـ

"আমরা নামায পড়তাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না এবং আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন পর্যন্ত।"
[সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬]

আহ্নাফ বর্ণিত লোকদের চরিত্রাবলী দর্শন করে বিচলিত হয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্! এ সকল লোক থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তাদের থেকে বিমুখ, অধিকন্তু তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্কও নেই।

তিনি নিজের ব্যাপারে না ছিলেন প্রতারিত আর না নিজেকে মুশরিক ও খোদাদ্রোহীদের দলভুক্ত মনে করার ন্যায় কু-ধারণা পোষণ করতেন। তিনি জানতেন, আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁকে ঈমানের ন্যায় রত্ন দান করেছেন। তাঁর স্থান শীর্ষস্থানীয়দের পর্যায়ভুক্ত না হলেও মুসলমানদের মধ্যে আছে। তিনি চরিত্রের অন্বেষণে ছিলেন যাকে তিনি নিজের বলে দাবী করতে পারেন। স্বীয় ঈমানের প্রতি আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে এদিকে যেমন পরিজ্ঞাত, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার প্রতি আশান্বিত। নিজের আমলে না অহংকারী, না খোদার করুণা হতে নিরাশ। আহ্নাফ ইবনে কায়স এ ধরনের এক সমন্বিত চরিত্রের অনুসন্ধানে ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ চরিত্র কোরআনের ন্যায় বিবিধ জ্ঞানের ধারক, পূর্ণাঙ্গ, জীবন্ত প্রাণবন্তু কিতাবে অবশ্য মিলবে। ঈমানের ন্যায় মহারত্ন রেখেও স্বীয় পাপ ও ত্রুটির ওপর অনুতপ্ত আল্লাহর এমন বান্দা নেই কি? খোদার করুণা কি তাকে বঞ্চিত করবে? সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ যে কিতাব তাতে কি এমন ব্যক্তির চরিত্র ও আলোচনা পাওয়া যাবে না? তা হতে পারে না।

অনুসন্ধিৎসু আহ্নাফ স্বীয় অনুসন্ধানে কৃতকার্য হলেন। তিনি আল্লাহর পবিত্র মহাগ্রন্থে নিজেকে খুঁজে বের করলেন ঃ

واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ط عسى الله ان يتوب عليهم ط ان الله غفور رحيم ـ

"আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের কৃত অপরাধ স্বীকার করেছে;

তারা এক সৎ কর্মের সঙ্গে অন্য অসৎ কর্ম মিশ্রিত করেছে; শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

[সূরা তাওবা ঃ ১০২]

তিনি আনন্দে নেচে উঠলেন। বেশ! বেশ! আমি প্রাপ্ত হলাম। আমি নিজেকে পেয়ে গেলাম। আমি নিজের পাপসমূহ স্বীকার করি। খোদার তাওফীকে যৎসামান্য নেক আমল যা করতে পেরেছি তা অস্বীকার করি না। আমি আল্লাহ্র করুণা হতে নিরাশ নই।

قالو من يقنط من رحمة ربه الا الضالون -

"খোদার করুণা হতে কেবল সে-ই নিরাশ হতে পারে যে পথভ্রষ্ট।"

[সূরা হিজর ঃ ৫৬]

এ সবের সমন্বয়ে যে চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তা আমারই চরিত্র।

এ আয়তে আমি ও আমার ন্যায় লোকের অবস্থা বিবৃত হয়েছে এবং তার এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমি সেই মহান প্রতিপালকের প্রতি উৎসর্গীকৃত যিনি স্বীয় পাপী বান্দাদের ভুলে যাননি।

হযরত আহ্নাফের অনুসন্ধান কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। হযরত আহ্নাফ দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেছেন; স্বীয় স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। এ মহান গ্রন্থ কিন্তু রয়ে গেছে। আর তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্তরা যদি অন্বেষণ করে তবে এতে নিজেদের পরিচয় পাবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও দলভুক্তরা যদি স্বীয় চেহারা দেখতে চায় তবে এ দর্পণে দেখতে পারবে। আমি, আপনি, সকলেই যদি আপন পরিচয়ের তালাশে বের হই তবে ইনশাআল্লাহ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরব না। হযরত আহ্নাফ আমাদেরকে সত্য অনুসন্ধানের একটি নমুনা প্রদর্শন করেছেন। কুরআন পাঠ ও এতে গভীর অভিনিবেশের এক বিশুদ্ধ পন্থা শিখিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য এই আদর্শ ও শিক্ষানীতি দ্বারা উপকৃত হয়ে কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা।

বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতা অর্জন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

[১৯ শে মার্চ ১৯৮৪ ইং-তে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত সমাবেশে দেশের বুদ্ধিজীবী ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রদত্ত ভাষণ।]

উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত পুলকিত ও আবেগাপ্লুত। আল্লাহর দরবারে লাখো শোকর, আজকের এই মুবারক মজলিসের মাধ্যমে আমার দশ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফরের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটছে। সেই সাথে আজকের এই মজলিসে "খিদমতে খালক" প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

প্রথমে আমি উপস্থিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের খিদ্‌মতে অনুমতি হলে বলতে চাই, আমার সহকর্মী ও স্বগোত্রীয় বন্ধুদের খিদমতে একটি কথা আরয করতে চাই। সমগোত্রীয় এজন্য, আমিও আপনাদের মতো লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আপনাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন কিংবা একটি ধাঁধা তুলে ধরতে চাই। আপনারা অবশ্যই জানেন, হিজরী সাত শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন শক্তিরূপে তাতারীদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। বর্বর তাতারীরা মধ্যএশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করত। তাদের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ছিল খুবই সংকীর্ণ। হাজার বছর ধরে বদ্ধ জলাশয়ের মাছের মতো বিচ্ছিন্ন জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর এক সময় আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ঘটল। বর্বর তাতার জাতি তাদের সংকীর্ণ পরিবেষ্টন ভেঙ্গে-চুরে এক দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এল। তখনকার ইসলামী সালতানাত বা মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল সুদূর বিস্তৃত, বিশেষত তুর্কিস্তানের খাওয়ারিজম শাহের সালতানাত ছিল তৎকালীন আলমে ইসলামীর বিশালতম সালতানাত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তিমূলে পচন ধরে গিয়েছিল। সমাজের অধিকাংশ লোক হয়ে পড়েছিল অপরাধাসক্ত। সম্পদ, ক্ষমতা, বস্তুসভ্যতা ও সংস্কৃতির চোরা পথে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। পক্ষান্তরে সভ্যতার আলোবঞ্চিত তাতারীরা ছিল একটি প্রাণবন্ত জাতি। নবুয়তী পথ নির্দেশনা ও আসমানী শিক্ষার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না সত্য, তাতে তাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কোন

ব্যাধিও ছিল না যা তাদের জাতীয় শক্তি ও উদ্যমে অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অলস ও বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে। এমন একটি প্রাণবন্ত জাতি যখন খাওয়ারিজম সালতানাতের ওপর আপতিত হলো তখন খাওয়ারিজম শাহের সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনী সে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারল না। মোট কথা, তাতারীদের মুকাবিলা ছিল এক জরাগ্রস্ত সালতানাত ও অপরাধাসক্ত জাতির সাথে। ফল এই দাঁড়াল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমন্বয়ে যে সালতানাত আলমে ইসলামের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা দেখতে দেখতেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খাওয়ারিজম সালতানাতের পতনের পর আলমে ইসলামীতে এমন কোন শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না যারা তাতারীদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রুখে দাঁড়াতে পারে। মুসলিম উম্মাহ্ তখন এমন হীনবল ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাতারীদের মনে করা হতো আসমানী মুসিবত এবং প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো একথা ছড়িয়ে পড়েছিলঃ

اذا قيل لك ان التتر قد انهزموا فلا تصدقه -

সব কিছুই বিশ্বাস করতে পার, তবে কেউ যদি বলে, তাতারীরা মার খেয়েছে তবে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করো না। আকাশ ভেঙ্গে পড়া সম্ভব কিন্তু তাতারীদের পরাজিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। এই ছিল সমসাময়িক আলমে ইসলামীর বাস্তব চিত্র।

বন্ধুগণ! হয়ত কিছুটা বিরক্তি বোধ করছেন, আলেম ও বিজ্ঞজনদের এই ভাবগম্ভীর মজলিসে অসভ্য তাতারীদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কি প্রয়োজন ছিল? বন্ধুগণ! একটি বিশেষ প্রয়োজনেই তাতারীদের আমি এখানে টেনে এনেছি এবং মুসলমান বানিয়েই এনেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে একটুখানি সময় দিন।

ইতিহাসের এক বড় জিজ্ঞাসা এই, তাতারী জাতি এক সময়ে গোটা আলমে ইসলামীকে পিষে মেরেছিল, সুদীর্ঘ ছয় শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী হারুনুর রশীদের বাগদাদ যে তাতারীদের বর্বরতায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, দজলা নদীর পানি একবার মুসলমানদের রক্তে লাল আর একবার লক্ষ-লক্ষ গ্রন্থের কালিতে নীল হয়ে গিয়েছিল, সেই নিষ্ঠুর জাতি কোন্ আশ্চর্য উপায়ে অকস্মাৎ জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে বসল! এক সময় আলমে ইসলামীর জন্য যারা ছিল মূর্তিমান অভিশাপ, পরবর্তীকালে তারাই হলো ইসলামের মুহাফিজ রক্ষক। কিভাবে এটা সম্ভব হলো? কি কি কার্যকারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল? কোন ঊর্ধ্ব শক্তি ইসলামের সামনে

এমন একটি নিষ্ঠুর ও শক্তিমদমত্ত জাতির মাথা নত করে দিয়েছিল? ইতিহাসের এটা একটা প্রশ্ন যার বস্তুনিষ্ঠ উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

এ অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনের মূল কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত ইসলামী উম্মাহ্‌র অলী ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণ তাতার জাতির প্রতি তাদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। আল্লাহর দরবারে তাঁরা প্রার্থনার হাত তুললেন। শেষ রাতে ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারিতে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিলেন। হিকমত ও মহব্বত এবং প্রেম ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আহলুল্লাহ ও আল্লাহর ওলীদের উপরিউক্ত কর্ম তৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত জনৈক ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক তাঁর 'কদণ রেণটডদধভথ মত ত্রফটব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি আমার "তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা বিবৃত করেছি। অন্য একটি কার্যকারণও এর পেছনে সক্রিয় ছিল। সেই কার্যকারণও এর পেছনে সক্রিয় ছিল। সেই কার্যকারণটির সাথেই আজকের মজলিসের সম্পর্ক আর এজন্যই শুধু এ মজলিসে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

শক্তির সব কয়টি উপায়-উপকরণই তাতারীদের কাছে মজুদ ছিল। সামরিক শক্তি তথা মার্শাল স্পিরিটের কোন কমতি ছিল না। শৌর্য-বীর্য ও রণকৌশলেরও অভাব ছিল না। কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সহজ-সরল বিলাসহীন জীবনেও তারা অভ্যস্ত ছিল পুরা মাত্রায়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের দৈন্য ছিল চরম। কোন লিটারেচার বা সাহিত্য সম্ভার ছিল না তাদের কাছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও কোন-ধারণা ছিল না তাদের। ছিল না কোন উন্নত আইন ব্যবস্থা। যাযাবর জাতির মত গুটি কতেক উদ্ভট আইন-কানুন ছিল তাদের সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ, এমন কি যে ভাষায় তারা কথা বলত সে ভাষায় কোন হস্তাক্ষর পর্যন্ত ছিল না তাদের কাছে। এক কথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার উপহারে সমৃদ্ধ মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর যখন তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা একেবারেই শূন্যহস্ত ছিল। তাদের কাছে না ছিল ভাষা ও সাহিত্য, না ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি আর না ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যূনতম অনুশীলন। মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তারা তাদেরকে সাহিত্য দিলেন, কাব্য দিলেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করালেন আর শেখালেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এভাবে গোটা তাতার জাতির ভেতর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে ধীরে ধীরে গোটা জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয়

নিল অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইখলাস ও নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে তাতার জাতির হৃদয় জয় করলেন। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়ক- গণ তাদের মস্তিষ্ক জয় করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়াল, তলোয়ার কিংবা অস্ত্রের ধারই কোন জাতির ওপর, কোন জাতির জন্য বিজয় লাভের একমাত্র পথ নয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য লাভের মাধ্যমেও একটি জাতিকে অতি সহজেই গোলাম বানানো যেতে পারে। আর রাজনৈতিক গোলামীর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গোলামী কোন অংশেই কম নয়।

আমি আপনাদেরকে একথাই বলতে চাই, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে জাতি অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত সে জাতির অস্তিত্ব সর্বদাই বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে যারা নিজেদের চিন্তার খোরাক কিংবা সাহিত্যের মাল-মশল্লা সংগ্রহ করে, বৃদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দেওলিয়া জাতি কোনদিন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উপরিউক্ত জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধই তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মমতও গ্রহণ করে বসবে। মানব জাতির ইতিহাসে এমন উত্থান-পতনের ভূরি ভূরি নযীর রয়েছে।

আপনাদের খিদমতে আমি আরো আরয করতে চাই, আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন নি। নয়-দশদিনের এ সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভ্রমণকারী একজন সচেতন পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে এ জাতিকে আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে যে, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, সরলতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, প্রেম ও হৃদয়ের উষ্ণতার দিক থেকে এ জাতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতির চেয়ে পিছিয়ে নেই। এ জাতির মেধা ও বুদ্ধিমপনাদেরই স্বভাবী, যারা কোন প্রতিবেশী দেশে বাস করে তাদেরও বৃদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গোলামী করা উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর ও বেদনাময়। অতএব, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এ দেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর, বাইরের কোন সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হ্যাঁ, একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ওয়াহীর অবতপনাদেরই স্বভাবী, যারা কোন প্রতিবেশী দেশে বাস করে

তাদেরও বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গোলামী করা উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর ও বেদনাময়। অতএব, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এ দেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর, বাইরের কোন সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হ্যাঁ, একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ওয়াহীর অবতরণ ক্ষেত্র হারামাইন শরীফাইন থেকে ভাব, চিন্তা ও পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকেও চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পাথেয় ক্ষেত্রে যাদের সাথে মৌলিক বিরোধ রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণ, সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ খুবই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।

দু'টি পথে তাতারী জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমত আধ্যাত্মিক পথে, দ্বিতীয়ত বুদ্ধিবৃত্তিক পথে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানগণই ছিল তখন শীর্ষ জাতি। মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজকের ইউরোপ তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন। একাডেমিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব তখন এককভাবে ছিল মুসলমানদের হাতেই। সামরিক ও রাজনৈতিক বিচারে যদিও তারা ছিল বিজিত, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে তারাই ছিল বিজেতা আর তাতরীরা ছিল বিজিত। ফলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিজয়ী জাতিকে মাথা নত করতে হয়েছিল বিজিত জাতির কাছে। মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে আজ আমার সে আশঙ্কাই হচ্ছে। এক হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই ও কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে আপনাদের জন্য আমার পরামর্শ এই, নিজেদের সাহিত্য ও কাব্য নিজেরাই গড়ে তুলুন। সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতি গ্রহণ করুন এবং তার উৎকর্ষ সাধনে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত হোন! আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, জাতীয় কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকেই আপনাদের তুলে ধরা উচিত। নজরুলের কাব্য ও সাহিত্য কর্ম বিশ্ব-সাহিত্য সভায় তুলে ধরুন এবং নজরুলকে নিয়ে গর্ব করুন। আপনাদের নিজেদের ভেতরেও অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সে সব প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করুন। নিজেদের ভেতর থেকেই স্টাইলের জন্ম দিন। নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, এটা খুবই সংবেদনশীল ক্ষেত্র। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। সংস্কৃতির জগতে আপনাদেরকে পূর্ণ স্বাধীন ও

আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে বলছি, এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আর ইতিহাসের প্রতিশোধ বড় নির্মম।

যে কারণে আপনাদের দেশ থেকে আমি আনন্দ ও আশাবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি তা হচ্ছে ইসলামিক ফউন্ডেশনের উপস্থিতি। বস্তুতপক্ষে এটা হচ্ছে সঠিক সময়ে, সঠিক দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির জন্য নিজস্ব একাডেমী থাকা একান্তই অপরিহার্য। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস স্বদেশের মাটিতে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বাইরে থাকাটা স্বাধীন জাতির জন্য আদৌ মর্যাদাজনক ও কল্যাণকর নয়। হিন্দুস্থান ও মিশরের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ শুধু এই, তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উৎস ছিল ইউরোপ, কেম্ব্রিজে-অক্সফোর্ডে কিংবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। বাইরে থেকে আপনারা যা খুশি আমদানী করুন। খাদ্য আমদানী করুন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ , কলকব্জা ও কারিগরিবিদ্যা আমদানী করুন। কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শ আমদানী করা বন্ধ করুন। বাংলাদেশের মত স্বাধীনচেতা জাতির জন্য নিজস্ব স্টাইল থাকা উচিত।

সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতির প্রচলন হওয়া উচিত। কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ আপনাদের অনুসরণ করুক। আপনারা তাদের অনুকরণ করতে যাবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আপনারা ইমাম হোন! সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী কোন স্বাধীন জাতির জন্য মুকতাদী হওয়া গর্বের কথা নয়। আপনাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস। আপনাদের পক্ষে অন্য কোন জাতির দুয়ারে, আয়তন ও সংখ্যায় তারা যত বড়ই হোক, ধরনা দেয়া শোভনীয় নয়। প্রথম কাতারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান আপনাদের জন্য নয়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-কাব্য, এক কথায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যতদিন আপনারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন না করবেন, নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম না হবেন, ততদিন আশ্বস্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। যতদিন আমাদের কলেজ, বিদ্যালয় ও অন্য শিক্ষাঙ্গনগুলো আমাদের সামাজিক ও জাতীয় তথা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে না আসবে, সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন না করবে, ততদিন সেগুলোর ওপরও ভরসা

করার উপায় নেই। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

আরেকটি কারণেও আমার মনে যে, আজ আনন্দ ও আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে, তা এই, বিলম্বে হলেও খিদমতে খালক বা আর্ত মানবতার সেবার গুরুত্ব আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেজন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গতকাল সোনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার সেবা, কার্যক্রম ও যাবতীয় ব্যবস্থা অবলোকন করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্টাফ-সদস্য ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। গড়ে প্রতিদিন কতজন রোগী আসেন, কতজন রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়, কি পরিমাণ ওষুধ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সত্যি এটা আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী! এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রের দিকে বিলম্বে হলেও আপনারা মনোযোগ দিয়েছেন যা এতোদিন খৃস্টান মিশনারীদের একচেটিয়া ময়দান মনে করা হতো। বস্তুত আর্ত মানবতা সেবার ছদ্মাবরণেই তারা এদেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বত্র আজ এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, মিশনারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের তুলনায় অধিক উন্নত ও সেবাধর্মী। যেহেতু তাদের মধ্যে মিশনারী মনোভাব থাকে সেহেতু চিকিৎসাপ্রার্থীদের সাথে তারা অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। ফল এই দাড়াঁয়, মানুষ সেখানে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলেও তার আত্মা হয়ে পড়ে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত। অন্তত এ ধারণা নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়, আমাদের চেয়ে এরা অনেক ভালো লোক। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ আছে। আছে সহানুভূতিপূর্ণ কোমল হৃদয়। এটাও এক ধরনের রোগ। একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর আরেকটি রোগ নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি, এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আর্ত মানবতার সেবায় গোটা জাতির আত্মনিয়োগ করা। খিদমতে খালকের ইসলামী আদর্শ সমাজের বুকে পুনরুজ্জীবিত করা যাতে মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজত করে সহজ উপায়ে সঠিক চিকিৎসা কিংবা অন্তত পক্ষে সহৃদয় পরামর্শ লাভ করতে পারে। এই মহান প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি ও আমার সফরসঙ্গীরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

শুধু এ কথাই আমি আপনাদের বলব। প্রথমত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও

রেজামন্দি লাভই যেন হয় আপনাদের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন ও কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাস রাখবেন, আপনারা ইবাদাতে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বরং আমার ফতোয়া এই, আপনারা ইবাদতে ও সর্বোত্তম ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট লাঘব করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট লাঘব করে দেবেন।" আরো ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ্ পাক বান্দার সাহায্যরত থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে।" হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে, "কিয়ামতে আল্লাহ্পাক একদল লোককে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি অসুস্থ হয়ে ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসো নি।" তারা বলবে, "হে মহামহিম আল্লাহ্! আপনি কিভাবে অসুস্থ হতে পারেন? ইরশাদ হবেঃ আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকেও সেখানে দেখতে পেতে।" বলুন, এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে!

দ্বিতীয়ত সেবা ও চিকিৎসার সাথে প্রেম ও সহানুভূতিও যোগ করতে হবে। তবেই এ বিরাট পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে। এই দুর্বল মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ের কোমল মাটিতে ঈমান ও কল্যাণের বীজ বপন করে দিন। ইনশাআল্লাহ্ কোন একদিন তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অন্ততপক্ষে এ বিশ্বাস তাদের অন্তরের বদ্ধমূল করে দিতে হবে, আল্লাহই হচ্ছেন শেফাদানকারী। ওষুধ ও চিকিৎসক উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহর নির্দেশই ওষুধ তার ক্রিয়া করে। ওষুদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এর পর যখন রোগী শেফা লাভ করবে তখন তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। তার বিশ্বাসের ভিত মযবুত হবে।

আপনাদের সকলকে, বিশেষ করে সভাপতি সাহেব ও ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাদেরকে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। একটি সঠিক ও নির্ভুল ক্ষেত্র আপনারা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছেন। আপনাদের এ দূরদর্শিতা দেশ ও জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। এটা শুধু দেশের খিদমত নয়, দ্বীনেরও বিরাট খিদমত। আল্লাহ্ পাক এ প্রকল্পটিকে স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা দান করুন!

সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে একথাও বলব, অমুসলিম ভাইদের সাথেও সমান আচরণ করুন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, এরা আল্লাহর বান্দাহ্, আল্লাহই এদের সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনরূপ কষ্ট লাঘব করতে পারলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং আমরা উত্তম বিনিময় লাভ করব।

সেবার ক্ষেত্রে মুসলমান অমুসলমানের পার্থক্য করা উচিত হবে না, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট কথা, আপনার চিকিৎসা সহায়তা নিতে এসে সে যেন কোন রকম দ্বৈত আচরণ অনুভব করতে না পারে। আমাদের বোনেরাও সেবার ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের হৃদয়ের স্বভাবকোমলতা এক মূল্যবান সম্পদ। এমন কিছু তারা করতে পারেন যা পুরুষদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের হিন্দুস্থানে ও এখানেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার বোনেরাও পর্দার পেছনে থেকে আমার কথাগুলো শুনছেন জানতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্পাক তাদেরকে সমাজ সেবায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন!

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ! আরেকটি বিষয় আরয করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আপনাদেরকে মিশরবিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবন আস (রা.)-এর একটি ঐতিহাসিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখনকার দুনিয়ায় মিশরের অবস্থান ছিল তাহযীব, তামাদ্দুন ও সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে। নীল নদী বিধৌত মিশর ভূখণ্ড ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। এমন একটি সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ জয় করার পরও কেন জানি হযরত আমর ইবন আস (রা.) কোন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। একজন বিজয়ী সেনাপতির মনে যে স্বাভাবিক পুলক অনুভূত হয় তার লেশ মাত্রও ছিল না তাঁর অন্তরে। কেননা তিনি ছিলেন নবীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এক সাহাবী। কুরআনের শিক্ষা ও নবুয়তের দীক্ষায় তাঁর অন্তর ছিল আলোকউদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন যুগপৎ ঈমানী প্রজ্ঞা ও সাহাবীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সুদূর ভবিষ্যত পানে। বিজয়ী আরব মুসলমানদের ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাণী যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। আরব বিজয়ীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ انتم فى رباط دائم দেখো! মনে রেখো মিশরের সবুজ শ্যামল উর্বর মাটি, মিশরের সম্পদ, ভাণ্ডার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দেশের তাহযীব-তামাদ্দুন তোমাদের মনে যেন কোন মোহ সৃষ্টি করতে না পারে। এদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও জৌলুসে তোমরা যেন আত্মবিমোহিত হয়ে পড়ো না। এখানে তোমাদের সঠিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থেকো। মনে রেখ, তোমরা এখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ–এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তোমরা অবস্থান করেছ। এ কথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লোভ করো না, তোমরা কিবতীদের ওপর বিজয় লাভ করেছ কিংবা রোম সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার দখল করে নিয়েছ। একথাও মনে করো না, আরব উপদ্বীপ খুব নিকটে। কোন অবস্থাতেই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়ো না। " انتم

فى رباط دائم এমন এক নাযুক জায়গায় তোমরা আছ যে, মুহূর্তের অসাবধানতায় তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। এক ঐশী বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমরা এদেশে এসেছ। এক মহত্তম চরিত্রের আহ্বান নিয়ে তোমরা এখানে পদার্পণ করেছ। মুহূর্তের গাফিলতি ও দায়িত্ব হতে বিচ্যুতি তোমাদের এ বিজয়কে ধূলি লুণ্ঠিত করে দিতে পারে। সেই জীবন দর্শন থেকে চুল পরিমাণও যদি বিচ্যুত হও, যা তোমরা মদীনার পুণ্য মাটিতে নবুয়তের পবিত্র সাহচর্য লাভ করেছ, তবে তোমাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে এবং মিশরে যারা আজ তোমাদের এ বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে তারাই সেদিন তোমাদের বুক লক্ষ্য করে তরবারি উঁচিয়ে ধরবে। যদি মনে করে থাকো, সম্পদ উপার্জন, বিলাসী জীবন যাপন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতেই তোমরা স্বদেশ ভূমি ছেড়ে মিশরে এসেছ, তবে এদেশবাসী তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা করবে না। একটি প্রাণীও সহীহসালামতে ফিরে যেতে পারবে না।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে এক আরব সৈনিক যিনি কোন ইউনিভার্সিটির স্কলার ছিলেন না, বিজয়ী, আরবদের লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন তা আজ এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বের, বিশেষত আপনাদের এ দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

বন্ধুগণ! তোমাদের মনে রাখতে হবে, انتم فى رباط دائم। তোমরা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ। মুহূর্তের অসাবধানতা তোমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিতে পারে।

আল-কোরআনের আলোকে সমকালীন বিশ্ব

[বক্ষ্যমাণ আলোচনাটি আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এটি তিনি ১৩৭২ হিজরী মুতাবিক ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ২৪ মার্চ ভারতের বান্দাহ জামে মসজিদে পেশ করছিলেন।]

দাজ্জাল থেকে হুশিয়ার

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

نحن نقص عليك نبأهم بالحق ط انهم فتية امنوا بربهم وزدنهم هدى ج وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموت والارض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ـ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة ط لو لا يأتون عليهم بسلطن م بين ط فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ـ

"আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বললঃ আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না, যদি করি তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে?" [সূরা কাহাফ ঃ ১৩-১৫]

সম্মানিত সুধীবৃন্দ! আমি আপনাদের সামনে সূরা কাহাফের প্রথম দিকের তিনখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। জুমার দিনে সূরা কাহাফ তেলাওয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত (কোন কোন হাদীসে শেষের দশ আয়াত। আর কোন কোন হাদীসের যে কোন দশ আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে) তেলাওয়াত করবেন আল্লাহপাক তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হিফাযত করবেন।

দাজ্জাল হলো কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের তথা শেষ যামানার সবচে' বড় ভেল্কিবাজ। নবী করীম (সা.) সর্বদা এর অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাইতেন আল্লাহর কাছে এবং স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করতেন। আজও জুমার দিন। সে হিসেবে এখন এ আয়াতগুলো পড়া এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা অত্যন্ত উপযোগী ও উপকারী মনে করছি। সুতরাং আসুন, আমরা কিছুক্ষণ সময় পঠিত আয়াতগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করি, লক্ষ্য করি সূরার বিষয়বস্তু আর দাজ্জালের ফিতনার মধ্যে কী সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র রয়েছে এবং এই ফিতনা থেকে হিফাযত থাকারই বা কী রহস্য রয়েছে।

দাজ্জালের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে এক. সে নিজকে সমকালীন বিশ্বে শক্তি ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে সবচে' প্রভাবশালী বলে দাবী করবে এবং সে এর আলামত (ওহবঠমফ) হয়ে যাবে। দুই. সে যাবতীয় বস্তুকে এমনভাবে দেখাবে যা দেখতে এক রকম আর বাস্তবে থাকবে অন্যরকম। বস্তুর দৃশ্যমানতা ও বাস্তবতার মাঝে থাকবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

দাজ্জাল ও তাদজীল শব্দ দুটি আরবী যার অর্থ ধোঁকাবাজি, কৃত্রিমতা, প্রতারণা। দস্তাকে নকল করে দেয়া হলে দেখাবে রৌপ্যের ন্যায় তামাকে সোনার পানিতে ধুয়ে দেয়া হলে দেখাবে স্বর্ণের ন্যায়। আর এটাই হলো তাদজীল।

সূরা কাহাফের এক ঘটনায় ঐ সকল যুবকের কথা বলা হয়েছে, যারা সে যুগের কৌলিন্য, ধন-সম্পদ ও শান-শওকত এবং ক্ষমতা ও মর্যাদার কাছে মাথা নত তো করেই নি, পরন্তু মৌলনীতিকে স্বার্থের ঊর্ধ্বে হৃদয়ের আওয়াজকে পরিবেশের দাওয়াতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। দমন করেছিলেন নফসের চাহিদাকে। প্রাণ রক্ষার চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন ঈমান রক্ষাকে। এভাবে জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের স্বকীয় বোধ ও বিশ্বাসে অবিচল ও দৃঢ়পদ ছিলেন। আর এটাই হলো আসহাবে কাহাফের ঘটনা। অপর আরেকটি ঘটনা আছে, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) সম্পর্কিত যেখানে বস্তুর জাহের ও বাতেন এবং ঘটনার সূচনা ও পরিসমাপ্তির মধ্যে রয়েছে আসমান-যমীনে ফারাক। বাহ্যিক কর্তব্য ছিল এ রকম আর অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্ত হতো অন্যরকম। ঘটনার শুরু হতো একভাবে, আবার শেষ হতো অন্যভাবে। এভাবেই এই সূরা তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ও ঈমানদীপ্ত ঘটনার মাধ্যমে যাবতীয় তাগুতের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানে।

আসুন, আজকের এই সময়ে আমরা আসহাবে কাহাফের ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি এবং এর থেকে এ যুগে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি তা দেখি।

রোমকদের একটা সুদীর্ঘ শাসনকাল ছিল। তাদের সাম্রাজ্য ছিল ইটালী থেকে নিয়ে এশিয়া মাইনর ও শামের শেষ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্ধ পৃথিবী ব্যাপ্তি বিশাল এ সাম্রাজ্য যার ডংকা বাজত ইউরোপ থেকে এশিয়া অবধি। সে সাম্রাজ্যে মূর্তিপূজা ও মুশরিকী আক্বীদা ও ধ্যান-ধারণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল। জীবন সভ্যতার কোন স্তরই এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। সমগ্র জীবন ব্যবস্থা মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল। তাহযীব-তামাদ্দুন, দর্শন-ফিলোসফি, সাহিত্য- সংস্কৃতি সব কিছুতেই এর গভীর ছাপ ছিল। ইতিহাসের প্রতি যাদের দৃষ্টি আছে তারা জানেন, সে যুগে মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণের কারুকার্যে অনেক উৎকর্ষ সাধন করেছিল এবং এক্ষেত্রে রোমকরা বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল। রোমকদের মত মূর্তিনির্মাতা ও ভাস্কর্য শিল্পী দুনিয়াতে কমই জন্ম নিয়েছে। তারা এমন এমন মূর্তি নির্মাণ করত যা দেখে অনেকেই এগুলোকে জীবন্ত মানুষ বলে ধোঁকা খেত। মনে হতো এগুলো এই বুঝি কথা বলবে। যারা রোম ভ্রমণ করেন তারা এ সকল ভাস্কর্যের সামনে অবাক বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকেন। সেখানে এগুলোর আধিপত্য এত যে, একজন সুস্থ রুচিবোধের মানুষের বমি এসে যাবে। এরূপ অবস্থাই আমার হয়েছিল ইউরোপের ঐ সকল ঐতিহাসিক নগরী ভ্রমণে যেগুলোকে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাজার হাজার বছর পূর্বেকার বলা হয়। মাটি খননের মাধ্যমে এসব নগরী আবিষ্কৃত হয় এবং ওখানেও গৌতম বুদ্ধের অসংখ্য মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে বর্তমানে যেখানে তুরস্ক অবস্থিত, আফীস (ঋষদণ্ড্র) নামে এক শহর ছিল। ডিয়ানা দেবীর মন্দিরের জন্য শহরটি ছিল সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত। মন্দিরটিকে বর্তমানেও পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যজনক বস্তু-হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই শহরে মূর্তিপূজা, যৌনপূজা ও আত্মপূজা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। একদিকে নগ্নভাবে চলছিল মূর্তিপূজা, অন্যদিকে নির্বিঘ্নে চলছিল আত্মপূজা ও যৌন পূজা। ইতিহাস বলে, এ দুটোই সমানভাবে চলছিল তখন। অধিকাংশ আত্মপূজা ও যৌনপূজার উন্নতি ঘটেছে মূর্তিপূজার ছায়ায়। কারণ মূর্তিপূজা দর্শন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে নির্ধারিত সময়ে নিজের দাসত্বের চেতনা ও অসহায়ত্ব প্রকাশের পর সব রকম নিয়মনীতি থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়। এ দর্শনে আল্লাহর হাজির-নাযির হওয়া সংক্রান্ত কোন আক্বীদা-বিশ্বাসের ধারণা নেই। এটি স্বাধীন আত্মপূজা ও লাগামহীন নির্বিঘ্ন জীবন অতিবাহিত করার জন্য অত্যন্ত যুৎসই প্রমাণিত হয়েছে। এই চিত্র আমরা প্রাচীন হিন্দুস্থানে ও এ দর্শনের লালনভূমি গ্রীসে দেখতে পাই।

ঈমানী দীপ্ত সাত যুবক

সেই যুগেই রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শামে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ঈসা মসীহ (আ.)। তিনি মানব সম্প্রদায়কে সঠিক নির্ভেজাল তাওহীদ ও সত্য আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াত জাদুর মত কাজ করেছিল। এই প্রভাব তাঁর হাওয়ারী ঈসা (আ.)-এর সাহাবা, যাদের সংখ্যা ১২ ছিল এবং মুবাল্লিগদের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল। তারা শাম থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের কথা যারাই শুনত তারা তাদের কালেমা ও ধর্ম বিশ্বাসের ওপর ঈমান আনয়ন করত। তাদের হৃদয় জগতে বিপ্লব সংঘটিত হতো।

আফীস নগরীর সাতজন তরুণও তাদের দাওয়াত কবুল করেছিল। তারা ছিল রাজ্যের আমীর-অমাত্যদের সন্তান। খুবই সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যমণি। তারা মূর্তিপূজা ও আত্মপূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের পথ অনুসরণ করল এবং অন্যরকম ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে গেল। এখন তাদের কাছে মূর্তিপূজা ও আত্মপূজা এতটাই জঘন্য কাজ মনে হতে লাগল, এর প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মাতে শুরু করল। পবিত্র কুরআন বিষয়টি এভাবে বলেছে ঃ

انهم فتية امنو بو بهم وزدناهم هدى وربطنامل
قلو بهم -

"তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের মন দৃঢ় করে দিয়েছিলাম।"

এটাই হলো আল্লাহর সুন্নত বা নিয়ম, প্রথমে ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তে কাজ শুরু করবে, তারপর আল্লাহর সাহায্য আসবে। প্রথম পদক্ষেপ ব্যক্তিকেই নিতে হবে আর এ পদক্ষেপ অধিকাংশ সময়ই নিজের জীবন বাজি রেখে নিতে হয়। এটা হিম্মত ও সাহস, নির্ভীকতা ও উদ্যমের পরীক্ষা। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সফল হবে তার জন্য পরবর্তী সকল পরীক্ষা সহজ হয়ে যাবে। তারপর যুবকরা ঐ পরীক্ষার সম্মুখীন হলো যে পরীক্ষা ঈমানের দাওয়াত কবুলকারীদের সামনের সব সময় এসে থাকে। তাদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মুরুব্বীরা উপদেশ দিতে শুরু করল। কালের উত্থান-পতন সম্পর্কে বোঝাল। সতর্ক করল সম্ভাব্য বিপদের। তারা তাদেরকে হৃদয়োত্তাপ মিশ্রিত অত্যন্ত সহমর্মিতাসুলভ নসীহত করল। দুনিয়ার অন্য সকল জ্ঞান-গুণী ও বুদ্ধিজীবীর ন্যায় নম্রতা-কঠোরতা-লোভ-ভয়–সব রকম আচরণই করল। তারা বলল, তোমরা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছ। তোমরা হলে সম্ভাবনাময় যুবক।

তোমাদেরকে নিয়ে তোমাদের খান্দানের, তোমাদের ভাই-বোনদের অনেক স্বপ্ন, তোমরা বংশের সুনাম বৃদ্ধি করবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তোমরা উচ্চ পদাধিকারী হবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান তোমাদের পথ চেয়ে আছে, অথচ তোমরা কিনা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছ! যে বৃক্ষে তোমাদের নীড় সে বৃক্ষই কর্তন করছ।

প্রিয় বৎসগণ! তোমরা কেন নিজেদের আলোকিত ভবিষ্যতকে তিমিরে ঢেকে দিচ্ছ। নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্যে মহর লাগিয়ে দিচ্ছ।

প্রিয় উপস্থিত বন্ধুরা! এই মুহূর্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় ছামুদের কাহিনী মনে পড়ে গেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সব সময়ই একটা সম্বন্ধ থাকে। মানুষের ফিতরাত সর্বযুগেই প্রায় এক রকম ছিল। হযরত সালেহ (আ.) যখন তাওহীদ ঈমান ও আমলে সালেহের দাওয়াত শুরু করেছিলেন তখন তার সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও এই রকম হৃদয়োত্তাপ মিশ্রিত সহমর্মিতাসুলভ আচরণ দেখিয়েছিলেন তাঁর সাথে। তারা কত আশাহত ও ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলেছিল, সূরা হুদে এরশাদ হয়েছে ঃ

قالوا يصلح قد كنت فينامرجوا قبل هذ التنهاان نعبد مايعبد اباؤناو اننالغ شك مماتد عونا اليه مريب -

"তারা বলল, হে সালেহ! তুমি তো অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ছিলে। তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা-ভরসা ছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তোমার মাধ্যমে তোমাদের খান্দানের সোনালী দিন ফিরে আসবে। তাদের সম্মান সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাবে, অথচ তুমি এ কোন কাহিনী নিয়ে বসেছ, কি আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছ ওটা মন্দ, এটা হারাম, ওটা হালাল, এটা জায়েয, ওটা নাজায়েয। তোমাদের কাছে আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল সম্পর্কে কী ধারণা, তুমি কি আমাদেরকে ঐ সকল মাবুদের ইবাদত থেকে নিষেধ করছ, যাদের উপাসনা আমাদের বাপ-দাদাদের থেকে চলে আসছে। আমরা তো তোমাদের দাওয়াতের ব্যাপারে অত্যন্ত সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে আছি।" [সূরা হুদ ঃ ৬২]

যখন তাওহীদবাদী তরুণদের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনানুসারে যাদের সংখ্যা ছিল সাত, সে কালের বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানগর্ভ বিজ্ঞতাজনিত কথা কোনই কাজে আসল না, তখন ঐ বিজ্ঞজনেরা ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করল এবং বললঃ এখন তোমাদর সামনে কেবল দুটি পথই খোলা আছে। যদি নিজেদের বর্তমান ধর্ম

বিশ্বাসে দৃঢ় থাক তবে বেঁচে থাকার আশা পরিত্যাগ কর। আর যদি জীবনকে ভালোবাস তবে এই বিশ্বাস থেকে ফিরে এস।

যুবকরা বললঃ আমরা বেঁচে থাকার আশা হাজারো বার পরিত্যাগ করতে পারি। কিন্তু একবারের জন্যও বর্তমান ধর্ম বিশ্বাস থেকে ফিরে আসতে পারব না। তারা এ নাজুক মুহূর্তে যে শব্দ প্রয়োগ করেছিল তা ছিল অত্যন্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সে সময়কার সে নগরীর বুদ্ধিজীবীরা প্রতি কথায়ই তাদেরকে জীবনের প্রয়োজনে ভবিষ্যত সফলতার সম্ভাবনা; জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ, পদ-পদবী ও রুজি-রোজগারের উন্নতি দিত। বলত, বর্তমান আক্বীদা যদি পরিত্যাগ না কর এবং চলমান স্রোতের সাথে যদি একাকার না হও, তাহলে না পাবে চাকরি, না পদ-পদবী। চাকরি না পেলে খাবে কি? আর না খেতে পেলে বাঁচবে কি করে? কেমন যেন বেঁচে থাকার আর জীবিকা নির্বাহ করাই সব সমস্যা। জীবিকা কোত্থেকে আসবে? প্রতিপালন ও রিজিক দান কে করবে? তাওহীদপ্রিয় তরুণরা এ সমস্যার সমাধান দিল এই ঘোষণায় ঃ

اذقاموا فقالوا ربنارب السموات والارض -

"যখন তারা দাঁড়াল। অতঃপর ঘোষণা করল, আমাদের প্রতিপালক তো তিনিই যিনি এ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক।"

কেমন যেন তারা একথার ঘোষণা দিল ঃ আমরা আমাদের প্রতিপালককে চিনেছি এবং পেয়েছি। সুতরাং এখন জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ নিয়ে ও বেঁচে থাকার কোন ভাবনা নেই। কারণ আমরা যাকে প্রতিপালক হিসেবে মান্য করেছি তিনি এ আকাশ ও যমীনের প্রতিপালক। আর আকাশ-যমীন এ দুটোর সাথেই হলো জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণের সংশ্লিষ্টতা। অতএব, যার কুদরতী কর্তৃত্বে এ দুটো জিনিস তাঁর কাছে প্রতিপালনীয় উপকরণের কি কোন কমতি আছে? যিনি এ সাত আকাশ ও সাত যমীনকে স্থির রেখেছেন এবং এগুলোর প্রতিপালন করেছেন তিনি কি সাতজন যুবকের প্রতিপালনে অপারগ?

সম্মানিত উপস্থিত সুধিগণ!

সব বিতর্ক রুবুবিয়্যাতের ব্যাপারে, উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে নয়। আল্লাহ্ পাকের উলুহ্যিাত সর্বনিকৃষ্ট কাফের মুশরিকরাও স্বীকার করে।

ولئن سالهم من خلق السموات والارض ليقولن الله -

আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা কে? তবে তারা বলবে নিশ্চয় আল্লাহ্।

সব রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ঝগড়া-ফাসাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রাধান্য ও গ্রহণের পরীক্ষা রুবুবিয়্যাতের ব্যাপারেই। জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে এরই সম্পর্ক সংশ্লিষ্টতা। যিনি এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন এবং একবার নিজের পরওয়ারদেগারকে চিনতে পেরেছেন তার জন্য আর কোন ভাবনা নেই, পরীক্ষা কিংবা মুসিবত নেই। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون -

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে ঃ তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।"

[সূরা হা-মীম সেজদাহ, ঃ ৩০]

পারতপক্ষে এজন্যই পবিত্র কুরআনে ঐ সাত তরুণের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তাদের রুবুবিয়্যাতের ওপর ঈমান আনয়নের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, (তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তা তথা রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।) [তাদের ইলাহ্ তথা উপাস্যের প্রতি ঈমান এনেছিল] বলা হয়নি।

যা হোক, সহমর্মীদের এই পদ্ধতি যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করল। তারা বললঃ কোন বিষয়ে সত্যতার জন্য কোন না কোন মাপকাঠির প্রয়োজন রয়েছে। সবচে' বড় মাপকাঠি হলো, যিনি রাষ্ট্রের বা সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন যার নির্দেশে রাজ্য পরিচালিত হয়। আর তিনি এতটাই সৌভাগ্যশীল ও ভাগ্যবান যে, তার হাতের পরশে মৃত্তিকা স্বর্ণে পরিণত হয়। যে তার আঁচল ধরে তার ভাগ্য জেগে ওঠে।

সুতরাং এখন দেখ, রোম সাম্রাজ্যের শাহানশাহে আজম, তার উজীর-নাজির-আমীর-অমাত্য-নায়েবরা এবং যারা এ নগরীর শাসনকর্তা তাদের ধর্মবিশ্বাস ও মাযহাব কি? আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা পূজা-অর্চনা করে ঐ সকল দেবদেবী অবতারের যাদেরকে তোমরা অস্বীকার কর।

এখন আমরা কি ঐ সকল সফল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির মাযহাব ও ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করব, না কি তোমাদের মত নগণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন কম বয়সী মান-সম্মান ও শক্তিহীন আবেগতাড়িত যুবকদের মাযহাব গ্রহণ করব। এটা ঐ প্রাচীন বচন যা অতীতের প্রতিটি জাতিই তাদের নবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতি বলেছিল ঃ

قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون -

"তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতর জনেরা?" [সূরা আশ শোআরা ঃ ১১১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

ومانرىك اتبعك الاالذين هم اراذلنابادى الراى -

আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না।" [সূরা হুদ ঃ ২৭]

ঐ সকল বুদ্ধিজীবীর একটা দর্শন এটাও ছিল, বস্তুর ভাল হওয়ার মাপকাঠি হলো, বস্তুটি নগরীর সম্ভ্রান্ত লোক ও নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে প্রথম গোচরীভূত হয়। তারা বলল ঃ

وقال الذين كفروا للذين امنوالوكان خيراما سبقونا اليه ط واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم -

"আর কাফেররা মুমিনদের বলতে লাগল, যদি এ দ্বীন ভাল হতো, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এতো এক পুরানো মিথ্যা।"

[সূরা আল- আহকাফ ঃ ১১]

তাদের বক্তব্য ছিল, মৌসুমের প্রথম ফল, বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট ফল, কাপড়ের মধ্যে সবচে' ভাল নকশার পরিধেয় নব আবিষ্কৃত বস্তু ও জিনিসের মধ্যে সবচে' ভাল মডেলটি সর্বপ্রথম এ শ্রেণীর লোকদের কাছেই আসে। তারা তাদের বিস্ময় তা কখনো এভাবে প্রকাশ করেছে ঃ

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشكرين -

"আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি–যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্যে থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন।" [সূরা আনআম ঃ ৫৩]

ঈমান দীপ্ত ঘোষণা

আফীস নগরীর ও তাওহীদবাদী ঐ সাত তরুণ তাদের এ যুক্তিরও সিদ্ধতা ও সত্যতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, আমরা ঐ রাষ্ট্রপ্রধান আমীরদেরকে মাপকাঠি মানতে রাজী, কিন্তু কিসের মধ্যে? ভোজনের তৃপ্তিতে, পোশাক-পরিচ্ছেদের ফিটফাট সৌন্দর্যে, নির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে তাদের সুস্থ সুন্দর রুচিবোধ গ্রহণ করব। এসব ব্যাপারে তারা যেটাকে ভাল বলবে ভাল বলব, যেটাকে অপছন্দ করবে, অপছন্দ করব আমরাও। কিন্তু আক্বীদা-বিশ্বাস ও মাযহাবের ক্ষেত্রে তাদেরকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত নই। নৈতিকতা-অনৈতিকতা-মূলনীতি-কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে কারো অনুসরণ করার মানে হলো সেগুলোকে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া, অথচ আমরা তাদেরকে নৈতিকতা ও মানবতাবোধের ক্ষেত্রে অনেক হেয়, হীন ও নীচ দেখতে পেয়েছি। তারা নিজেদের জন্য জনপদের পর জনপদ বিলীন করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় নগর পর নগর। একজন বিধবার দোপাট্টা, একজন রিক্ত নিঃস্বের মুখের খাবার, একজন এতীমের হাতের রুটি ছিনিয়ে নেয়ার মধ্যে এতটুকু লজ্জাবোধ করে না ওরা।

তবে আপনারা যদি আমাদেরকে হুকুমতের ভয় দেখান কিংবা বারবার রাষ্ট্রীয় চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করেন তাহলে আমরা বলবঃ রাজ্যের অস্থায়িত্বের ও অবিশ্বস্ততার তামাশা আমরা অনেক দেখেছি। এ রকম ধ্বংসশীল জিনিসকে সর্বজনীন বিশ্বস্ততার, যার কোন ক্ষয় নেই, মাপকাঠি মানা যায় না। যে আল্লাহ্ রাজত্ব দিতে পারেন সে আল্লাহ যখন ইচ্ছে তখন তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। মুরুব্বীরা যদি কোন বাচ্চাকে খেলনা দেয় তবে সে খেলনা ফিরিয়ে আনার শক্তিও তিনি রাখেন। বাচ্চার জন্য এ আত্মম্ভরিতা করা উচিত হবে না, এই খেলনা সর্বদা তার হাতেই থাকবে, অন্য কেউ তার থেকে নিতে পারবে না। এ ব্যাপারে পবিত্র

কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

قل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ط بيدك الخير - انك على كل شئ قدير -

"বলুন, ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।" [আল-ইমরান ঃ ২৬]

সর্বশেষ ঐ বুদ্ধিজীবীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। তাওহীদবাদী তরুণরা নিজেদের মতে ও আক্বীদায় দৃঢ় ও অটল থাকল। সে যুগে চতুর্দিকে শাহানশাহে রোমের জয়জয়কার ছিল। সে জানতে পারল, অমুক নগরীতে সাতজন তরুণ যারা আমারই খেয়ে দেয়ে বড় হওয়া দরবারীদের চোখের আলো তারা তাদের মরুব্বীদের কথাবার্তা পর্যন্ত মানছে না। তখন সে নির্দেশ জারী করল, ঐ যুবকদেরকে অমুক মন্দিরে নিয়ে যাও এবং যেতে বাধ্য কর। যদি তারা মূর্তিকে গ্রহণ না করে তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর। যুবকরা মূর্তিপূজা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং নিকটবর্তী পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিল নিজেদের ঈমান সংরক্ষণের তাগিদেই। সম্রাট যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন তিনি গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, যেন যুবকরা গুহার ভেতর তিলেতিলে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহপাক তার অপার করুণায় তাদের চোখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিলেন এবং সুদীর্ঘ ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে রাখলেন।

এ দীর্ঘ কালের পরিক্রমায় রোম সাম্রাজ্যে বিরাট পরিবর্তন এল। রোমের সম্রাট খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং এ ধর্মের জন্য একজন আত্মোৎসর্গীকৃত মুবাল্লিগ ও দাঈর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে যুবকদেরকে জাগ্রত করলেন। তাদের একজন নগরীতে এল। এসে দেখল, দুনিয়ার অবস্থা পাল্টে গেছে, খৃস্ট ধর্ম এখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এক সময়ে যে কাজের জন্য মুণ্ডপাত করা হতো আজ সে কাজই অত্যন্ত সম্মানের ও গৌরবের। কাল যে ছিল ক্রুদ্ধ আজ সে মাহবুব। আর এভাবে যুবকদের দূরদর্শিতা, সত্যতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হলো এবং ঐ বুদ্ধিজীবীদের মূর্তি বিষয়ক ধ্যান-ধারণা ব্যর্থ ও অকৃতকার্য প্রমাণিত হলো।

সুধি! পবিত্র কুরআন শরীফে এ ঘটনাটি শুধু একটি ঐতিহাসিক ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনা হিসেবে বিবৃত হয়নি, বরং এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে এজন্য স্থান পেয়েছে, এ রকম ঘটনা ইতিহাসে বারবার ঘটেছে, সব সময় সব জায়গায় ঘটেছে, গোচরীভূক্ত হয়েছে। মক্কার মুসলমানরাও এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। দুনিয়ার অন্যান্য প্রান্তের মুসলিমরাও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, শর্ত হলো, ঈমান-একীন-ধৈয-দৃঢ়তা-স্থিরতা ও সহনশীলতা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর।

انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع اجرالمحسنين -

নিশ্চয় "যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎ কর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৯০]

আল-কুরআন চিরন্তন ও দিগ্বিজয়ী একটি কিতাব। এতে সব যুগের সব জাতির সব সময়ের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। মানবিক চরিত্র ও মানবিক সত্তার একটি চিত্র হলো এই যা ওপরে বিবৃত হয়েছে। এখন আরেকটি চিত্র এই কুরআনেই দেখুন, যা পূর্ব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র। কুরআনের ভাষায়–

ومن الناس من يعبد الله على حرف ج فان اصابه خير اطمان ه ج وان اصلته فتنة انقلب على وجهه ج خسر الدنيا والاخرة ط ذلك هوالخسران المبين -

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে তাহলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।" [সূরা হজ ঃ ১১]

এটা পবিত্র কুরআনের মুজিয়া ও চিত্র উপস্থাপনের সর্বোচ্চ নমুনা। এ আয়াতখানা কি? এটি একটি স্বতন্ত্র মুজিয়া। এটি একক ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি, গোষ্ঠীরও প্রতিচ্ছবি। জাতি ও উম্মাহরও প্রতিচ্ছবি। আরবী 'মান'-এর প্রয়োগ একক ও একাধিক উভয়টির ওপর প্রযোজ্য। মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বিলকুল ঈমানের কিনারায় দণ্ডায়মান হয়ে তথা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে ইবাদত করে। ইবাদত বলতে কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা শুধু নামায পড়ে, বরং এর

মাফহুমে এটাও অন্তর্ভুক্ত, ইসলাম ও জাহিলিয়াত, ঈমান ও কুফুরের মাঝে সে সীমানা টানা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলামী আহকামের অনুকরণের ক্ষেত্রে তারা সে সীমানায় একেবারে শেষ রেখায় দণ্ডায়মান থাকে।'

আলা হারফিন'-এর বাগবৈদগ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। মানুষের চরিত্রের ও চিত্রটি আয়াতের বচনে যেভাবে ফুটে উঠেছে সেটি যদি কোন ক্যামেরা দিয়ে ধারণ করা হয় এবং তা কোন বিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান ও চিত্রশিল্পী চিত্রায়িত করে, তবুও সেভাবে এটি প্রতিভাত হবে না। ঐ সমস্ত লোকের বিচক্ষণতা ও সাবধানতার সুন্দর চিত্র এই ছোট বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে, তারা এমন স্থানে দাঁড়ায় যেখান থেকে অন্য স্থানে কিংবা অন্য বৃত্তে চলে যাওয়া এতটুকু বিলম্ব ছাড়াই তাদের জন্য সব সময়ই সম্ভব। পা ওঠাতে দেরী হবে এই ভয়ে এরা ঐ রেখায় দৃঢ়ভাবে কদমও রাখে না। এরা কদম রাখে পুষ্পের ন্যায় দুর্বলভাবে যা বাতাসের এতটুকু স্পর্শে বা অবস্থার সামান্যতম হেরফেরের সাথে সাথে অন্য জায়গায় গোচরীভূত হয়। ঐ সমস্ত লোকের হাত থাকে যুগের শিরা-উপশিরায় তাদের দূরবীন সর্বক্ষণ রাষ্ট্র, সোসাইটি ও ক্ষমতাধরদের চোখের পলক ও ইশারা পর্যবেক্ষণ করে। তাদের মস্তিষ্ক লাভ-ক্ষতি ফায়দা-বেফায়দা যাচাই করার ক্ষেত্রে এতটুকু গাফেল থাকে না। যদি যুগের প্রচলন তাদের চিন্তা-চেতনার মত-অভিমতের ও অবস্থানের অনুপন্থি হয় তবে এক্ষেত্রে তাদের থেকে অধিক একাগ্রতা অন্য কারো মাঝে দেখা যায় না। তারা পূর্ণ স্থির মনে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এ কাজ করতে থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে।

আর যদি দেখে রাষ্ট্র, সোসাইটি ও সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে সাথে সাথে এরাও নিজেদের চিন্তা-চেতনা পাল্টে ফেলে এবং পূর্বেকার ধ্যান-ধারণায় তহমত থেকেও রক্ষা করে নিজেদেরকে। তারা নিজেদের চেহারা-সুরত, আক্বীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, তাহযীব-তামাদ্দুন, ভাষা ও সংস্কৃতি এমন কি নিজেদের জাতীয়তাবোধকেও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামান্যতম সময়ের প্রয়োজন অনুভব করে না। এই স্বার্থপর সুযোগ সন্ধানীদেরকে দেখে এই আয়াত যেভাবে উপলব্ধিতে আসে এবং এর ভাষা শৈলী ও বাগ্মিতা যেভাবে প্রতীয়মান হয় তা বৃহৎ কোন তাফসীর থেকেও প্রতীয়মান হয় না।

ভয়-ভীতি-সংশয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই স্বার্থপর শ্রেণীর ব্যবস্থাপনা ও সাবধানতা সম্পর্কে জানার প্রয়োজন রয়েছে। (এদের পরিচয় হলো,) যদি ইসলামী

বিধি-বিধান পালন দ্বারা পার্থিব কোন ফায়দা অর্জিত হয় কিংবা ধন-সম্পদ লাভ হয় অথবা এগুলো ব্যতীত যদি হুকুমত ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে এদের চে' অধিক শরীয়ত প্রীতি ও শরীয়তের প্রতি দায়িত্ববান আর কাউকে পাওয়া যায় না। আর যদি এগুলো পালন দ্বারা সামান্যতম ক্ষতি ও ত্যাগের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে এরা এ সকল বিধি-বিধান তো বটেই, পরন্তু মৌলিক আক্বীদাসমূহ পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن الناس من يقول امنابالله فاذا اوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ط ولن جاء نصرمن ربك ليقولن انا كنامعكم ط اوليس الله باعلم بمافى صور العلمين ـ

"কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন?" [আনকাবুত ঃ ১০]

যদি ঐ সম্বন্ধ সম্মানের কারণ হয় তাহলে এরা নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস, পূর্বপুরুষ ও দূর অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে এবং কোথাও না কোথাও নিজেদের সম্পৃক্ততা ও সংশ্লিষ্টতা বের করে নেয়।

সাধারণত এ ধরনের স্বার্থপরদের পরিণাম শুভ হয় না এবং কোন শ্রেণীর কাছে তারা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না।

বলা হয়েছে ঃ

সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

কবি হয়ত এজন্যই বলেছিলেন ঃ

না আল্লাহকে পেল, না প্রতিমার সান্নিধ্য,

না এ কূল রইল, না ও কূল।

আমার মনে আছে, ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার সময় কত মুসলমান যে শুধু এজন্যই স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, তাদেরকে মুসলমান মনে করে হত্যা করা হবে, অথচ এর বিপরীতে ঈমানী পরীক্ষার একটি প্রাচীন কাহিনী শুনুন।

নাসির খান বেলুচী ও পাঞ্জাবের শিখ হুকুমতের মধ্যে একবার যুদ্ধ হয়েছিল। ঐ যুদ্ধের এক পর্যায়ের নাসির খান বেলুচী আহত হয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন। দু'জন শিখ সেনা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। একজন বলল, তাকে শেষ করে দেবে। উল্লেখ্য, তখনকার বেলুচীদের চুল ছিল লম্বা লম্বা। সে হিসেবে নাসির খানের চুলে খোঁপা বাঁধা ছিল। আর এই খোঁপা দেখে অন্য সিপাই বলল, না না, ওতো দেখছি আমাদেরই ভাই। তাকে মেরো না। অতঃপর যুদ্ধ যখন শেষ হলো এবং নাসির খান বেলুচী তাঁর রাজ্যে ফিরে এলেন তখন তিনি নিজের চুল ছোট করে ফেললেন এবং পুরো জাতির চুল ছেঁটে ফেলার নির্দেশ জারি করলেন। তিনি বললেন, এই অমঙ্গলময় হতভাগা চুলের জন্য আমার মুসলমানিত্ব নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে আমি শাহাদাতের সুধা পান করা থেকে বঞ্চিত হলাম। দেখুন, দু'টো চিন্তার মধ্যে কত ফারাক! কত পার্থক্য!

বিশ্বাসের বিজয়

সুধি! যখন অবস্থা ভাল থাকে, পরিবেশ অনুকূল থাকে, কোন মতবাদে টিকে থাকার মাধ্যমে ইনাম মিলে, পুষ্পবর্ষণ হয়, ঐ মতবাদে শামিল হওয়ার মধ্যে সম্মান ও খ্যাতি নিহিত থাকে, ঐ মতবাদে বিশ্বাসী জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে, সে সময়ে ঐ মতবাদে দৃঢ় থাকার মধ্যে এবং ঐ আক্বীদা-বিশ্বাসে গর্বভরে প্রকাশ করার মধ্যে কৃতিত্ব ও বীরত্বের কিছু নেই। কিন্তু অবস্থা যখন অযুৎসই ও অপ্রতিকূল থাকে, বড় বড় বীরের পদক্ষেপে থাকে অসভ্যতা ও পাশবিকতা, কোন আক্বীদা-বিশ্বাস বা মতবাদকে গ্রহণ করার মানে মৃত্যুকে দাওয়াত দেওয়ার নামান্তর, ঐ মতবাদে বিশ্বাসী জাতির পতন নেমে আসে, ভাগ্য তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কালের দৃষ্টি সরে যায় তাদের থেকে, ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে ঐ মতবাদে দৃঢ় থাকা এবং ঐ জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা, জড়িত থাকা অত্যন্ত বীরত্ব, আনুগত্য ও কৃতিত্বের ব্যাপার। প্রতিটি সরকার ও রাষ্ট্রের কাছে ঐ সিপাহীরাই বেশী সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ, যারা যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের পাশবিকতার মুখেও দৃঢ় থাকে। প্রত্যেক সর্দার ও আমীর ঐ লোকদেরকেই বেশি সম্মান করেন যারা ক্রান্তিলগ্নেও তাদের সঙ্গ দেয়।

একজন প্রাচীন সর্দার তার এক লোকের প্রতি খুবই খেয়াল রাখত। সে লোকটিকে নিজের অন্যান্য সঙ্গী সাথী জী হুজুরের ভূমিকা পালনকারীদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিত। একজন তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সর্দার বললেন, আমাদের এলাকা যখন বিরান হয়ে গিয়েছিল, সেই একমাত্র ব্যক্তি যে নাকি তখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। প্রকৃত অর্থে ভালোবাসা ও আনুগত্যের পরীক্ষা উত্থান ও উৎকর্ষের যুগের হয় না, হয় পতন দুর্ভোগ ও দুর্যোগের কালে। নৈকট্যের কারণে আনুগত্য প্রকাশ করার মধ্যে প্রকৃত আনুগত্যের প্রমাণ মিলে না; প্রকৃত আনুগত্যের প্রমাণ তখনই মেলে যখন অসৌজন্য ও অকাম্য আচরণের পরও আনুগত্য বহাল থাকে। এখানেই হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.)-এর সত্য সুন্দর সঠিক নববী প্রেমের প্রকাশ পায়। রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক ও অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকার পরও নবীজী (সা.) মদীনার সমস্ত মুসলমানকে তার সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কেউ তার কথার উত্তর দিতেও প্রস্তুত ছিল না, এমন কি তার জীবনসঙ্গিনীকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন তার থেকে পৃথক থাকতে। তার চোখে নেমে এসেছিল রাজ্যের অন্ধকার। শহরকে আর শহর বোধ হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কবরস্থান। কুরআনের ভাষায় দুনিয়া এত প্রশস্ত হওয়ার পরও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। বন্ধ হয়ে আসছিল তার দম। সেই সময়ে গুচ্ছানের বাঁদশাহর (যার দানশীলতার সম্মান ও সুখ্যাতি তৎকালীন আরবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল) আমন্ত্রনপত্র এল হযরত কাব (রা.)-এর কাছে, তোমাকে এমন অকাম্য কঠোর অসৌজন্যের মধ্যে থাকার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার এখানে চলে এসো, আমি তোমাকে সুখী করে দেব। হযরত কাব (রা.) তখনই সময়টিকে গনীমত মনে করা এবং চিঠিটা গ্রহণ করার পরিবর্তে বাহকের সামনেই এটি আগুনের চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেললেন এবং তার প্রিয়ের দেয়া পরীক্ষা সহ্য করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তার থেকে মুসীবতের ঘনঘটা শেষ হলো আর এভাবে সংশোধানের ও পরিণতি ভোগের সময় সীমা উত্তীর্ণ হলো।

এমনিভাবে শাওয়ালের ৫ তারিখ কুরাইশরা মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল, ঘিরে ফেলেছিল চারদিকে থেকে মদীনাকে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন মদীনার মুসলমানরা। তাদের না খাবার ছিল, না কোথাও থেকে রসদ আসার উম্মিদ ছিল। ক্ষুধা, ঠান্ডা, ভয়-ভীতি ও সব রকমের অসুবিধা বিরাজ করছিল।

স্বয়ং কুরআনেই সর্বাধিক সুন্দরভাবে এ চিত্র উপস্থাপন করেছেন ঃ

اذ جاء وكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت

الابصـــارو بلغت القلوب الحناجـــر وتظنون بالله الظنونا ـ

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে।" [আহযাব ঃ ১০]

অন্যত্র বলেছেন ঃ

"যখন দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়েও ঐ সকল লোক যাদের আল্লাহপাক ঈমানের দৌলত দান করেছিলেন, আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে যাদের একীন ছিল, তাদের ঈমানী শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা এ অবস্থায়ও সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফল বের করেছিলেন। তারা তাদের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বকে কেবল পরাজিতই করলেন না, বরং এটিকে বিজয় ও সফলতার দলীলে পরিণত করেছিলেন। যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল তারা বলল ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।

সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন ছিল অসাধারণ। পরিবেশই অসাধারণ ঘটনার জন্ম দেয়। রাতের আঁধার চিরেই সূর্য তার নেকাব খোলে। যখন যমীন তৃষ্ণার্ত হয় রহমতের বারিধারা তখনই হয় বর্ষিত।

হুবহু এই দর্শন থেকেই সান্ত্বনা পেয়েছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ.)-যখন তাঁর তনয় ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قال بل سولت لكم انفسكم امرا ط فصبر جميل ط عسى الله ان ياتينى بهم جميعا ط انه هوالعلم الحكيم ـ

"তিনি বলেন ঃ কিছুই না তোমরা মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের সবাইকে এক সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি সুবিজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৮৩]

তিনি আরো বলেছিলেন,

ولاتايســوا مـن روح اللـه ط انـه لايـايـس مـن روح اللـه الاالقوم الكفرون -

"বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রমহত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭]

সম্মানিত সুধি! ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, এর সাথে সম্পর্ক গড়া এবং দিবালোকে তথা প্রকাশ্যে এর হুকুম-আহকাম মানা চারদিকে যখন প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করে, মুসলমানদের সফলতা ও দুনিয়ায় ইসলামের জয় জয়কারের যুগ থাকে, তখনও ফখর, গৌরব ও আনন্দের বিষয়, কিন্তু পরীক্ষা ও মুসিবতের সময় আনুগত্য ও মানার মধ্যে যে তৃপ্তি, স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হয় তা অন্য কোন উপায়ে হয় না, আর এটা তখনই হয় যখন সত্যের ওপর অটল থাকা লোকেরা সত্য ন্যায়ের তাবলীগকারিগণ এবং নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাসের স্বার্থে পার্থিব লাভ ও সম্মান বিসর্জনকারিগণ এই দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বাদ অনুভব করেন। তাদের শরীরের পরতে পরতে আল্লাহর হামদ ও শোকর প্রতিধ্বনিত হয়। আল্লামা ইকবাল হয়ত এজন্য বলেছিলেন ঃ

নেককারদের জন্য উচ্চ হিম্মতই হলো বেহেশ্‌ত। উপমহাদেশের মুসলমানদের জানিয়ে দাও, তোমরা সুখী হও; কেননা দ্বীনের পথে অটল থাকার মধ্যে বেহেশ্‌তের আনন্দ রয়েছে।

সমাপ্ত